

নীহাররঞ্জন শুল্প

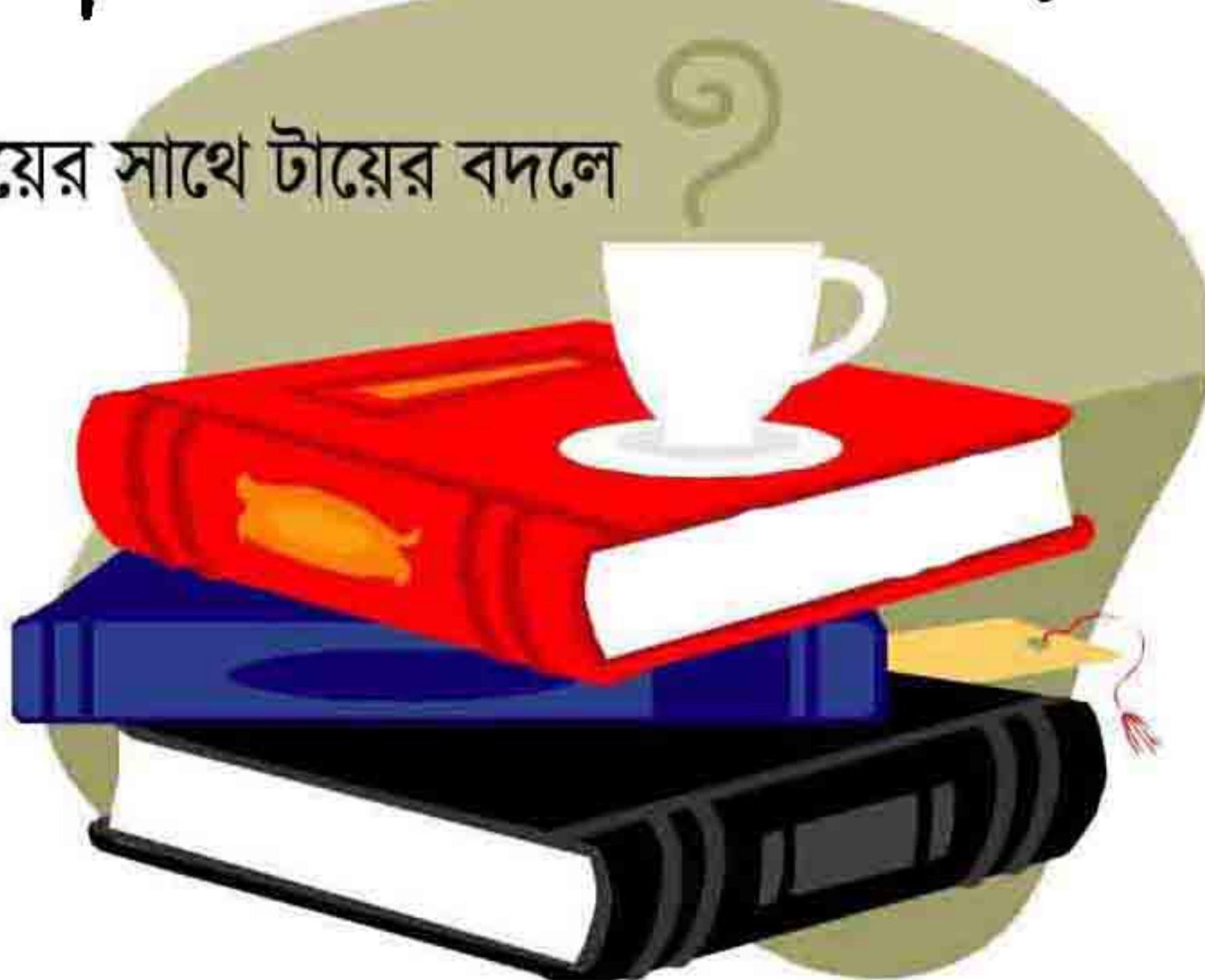
কবিতা
অমনিবাস



Scanned by
Abhishek
Prepared by
shrubu

PATHAGAR.NET

চায়ের সাথে টায়ের বদলে



PATHAGAR.NET

বইটি পরে যদি ভালো লাগে তাহলে **pathagar.net** এর chat box যে এসে

ধন্যবাদ দিতে ভুলবেন না।

কিরীটী অমনিবাস

নীহারঞ্জন গুপ্ত

ত্রয়োদশ খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থ্রি:লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

ভূমিকা	সুবোধকুমার মজুমদার	[১]
আলোকে আঁধারে		১
নগরনটি		৯৯
রক্তের দাগ		১৭৭
বু-প্রিন্ট		২১৯
রেশমী ফাস		২৫৫
পদ্মদহের পিশাচ		২৭১
পথওমুখী হীরা		২৮২

আলোকে আঁধারে

॥ এক ॥

প্রস্তাবটা তুলেছিল সজলই প্রথমে যে, একটা দিন সকলে মিলে বটানিকসে গিয়ে হৈ চৈ
করে কাঠানো যাক।

এবং প্রস্তাবটা তুলেছিল সে মিত্রানীর কাছে এসে তার বাড়িতে এক সকালে।
বেলা তখন নয়টা সোয়া নয়টা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই সেই আনন্দ উৎসবে যোগ
দেওয়া হয়ে ওঠেনি। ছুটি না শেষ হতেই তাকে চলে যেতে হয়েছিল। বৎসর তিনেক হবে
প্রায় সজল কলকাতায় ছিল না। সেকেন্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাস, তারপর
বি. কম.-এ কোনমতে পাস করে যখন সে নিজেও স্থির করতে পারছে না অতঃ কিম, কোন্
লাইনে, কোন্ পথে পা বাঢ়াবে, আঘায় বঙ্গ-বান্ধব নানা জনে নানা পরামর্শ দিচ্ছে, সজল
সকলের অজ্ঞাতেই এবং নেহাতেই একটা খেয়ালের বশে কমপিটিউট পরীক্ষায় বসে
গিয়েছিল—পাস সে করবেই না জানত।

সাধারণ মিডিওকার ছাত্র সে—কিন্তু রেজার্ট বেরলে আশ্চর্য, দেখা গেল
প্রতিযোগিতার পরীক্ষাতে প্লেস একটা সে নীচের দিক হলেও পেয়ে গিয়েছে। এবং তারই
জোরে একটা চাকরি তার আজকালকার দিনে লোভনীয়ই বলতে হবে পেয়ে গেল। বঙ্গ-
বান্ধবেরা তো বটেই, আঘায় ও পরিচিতজনেরা ওর এই হঠাত সাকসেসে বেশ একটু যেন
আশ্চর্যই হয়েছিল। প্রথমে দল্লীতে ট্রেনিং, তারপর বৎসরখানেক এদিক ওদিক
হাতেকলমে ট্রেনিং শেষ করে একদিন সে নথ বেঙ্গলে পোস্টেড হলো বোধ হয় কিছুদিনের
জন্যই। এবং ঐ পোস্টিংয়ের খবরটা তার পরিচিত বঙ্গমহলে সকলেই পেয়েছিল।

মিত্রানী সেদিন সকালে কলেজে বেরংবে বলে উঠি-উঠি করছে—হঠাত সজল এসে
ঘরে ঢুকল। পরনে দামী সুট, বড়লোক বা অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে না হলেও পোশাকে—
আশাকে বরাবরই সে কিছুটা শৌখীন ও ফিটফাট ছিল। কিন্তু আজকের বেশভূয়া ও
শৌখীনতার মধ্যে একটু বিশেষত্বই ছিল বুঝি সজলের। দেখতে সজল কালোর উপর
মোটামুটি মন্দ নয়, সুগঠিত পৌরুষোচিত দেহ। বেশ লম্বা।

হালো মিত্রানী—

আরে আরে কী আশ্চর্য, সজল তুমি। উচ্ছল আনন্দে মিত্রানী বলে ওঠে।

হাসতে হাসতে আরো দু'পা এগিয়ে এসে সজল বললে, হাঁ, সজলের প্রেত
নয়—সজল চক্রবর্তী—

হাসতে হাসতেই মিত্রানী জবাব দেয়, সে তো দেখতেই পাচ্ছি—শুনেছিলাম নথ
বেঙ্গলের কোথায় কি একটা একজিকিউটিভ পোস্ট নিয়ে গিয়েছো—।

সজল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলে, আর বলো না—ঐ নামেই বড়
পোস্ট—দিবারাত্র এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। তোমরা তো ভাবো কি জানি কি একটা হয়ে
গিয়েছি, কিন্তু আসলে—

বোসো সজল, চা করে আনি। কতকটা যেন সজলকে থামিয়ে দিয়েই কথাটা বললে

মিত্রানী। কারণ মিত্রানী জানত, একবার শুরু করলে সজল থামবে না।

না না—সজল বললে।

সে কি—যথন-তখন আগের মত চা খাও না বুঝি আজকাল আর!
না।

তাহলে তোমার সেই খিওরি, সব সময়ই টি'র সময়—

জান না তো, সর্বক্ষণ কাজ নিয়ে কি ব্যস্ত থাকতে হয় আমায়—তাছাড়া বানিয়ে দেবে
কে?

কেন, বানাবার কেউ নেই!

শ্রীমান বাহাদুর আছে বটে, তবে সে যা চা বা কফি বানায়—

তা এবার জীবনে যখন থিভু হয়ে বসেছো—তোমার কথায় চা-কফি বানাবার জন্য
কাউকে একজনকে ঘরে নিয়ে এসো না। হাসতে হাসতে বললে মিত্রানী।

তার মানে বিয়ে তো! সজল বললে।

হ্যাঁ—তা ছাড়া আর কি?

কি জান, বিয়ে তখনি করা যায় মিত্রানী, যখন মনের মত কাউকে পাওয়া যায়।
তাছাড়া তুমি তো জানো মিত্রানী, ওয়াইফ এবং কম্প্যানিয়ন আমি একই সঙ্গে চাই।

ওয়াইফই একদিন কম্প্যানিয়ন হয়ে ওঠে সজল। মিত্রানী হাসতে হাসতে বললে।

না। ওটা তোমার ভুল। সব সময় ঠিক তা হয় না। আর তখন নিজের হাত নিজে
কামড়ানো ছাড়া আর উপায় থাকে না।

তা বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব আছে নাকি! খুঁজলে তুমি যেমনটি চাইছো
তেমনি—

অত সময় বা ধৈর্য কোনটাই আমার নেই।

ঘড়িতে ঐ সময় নয়টা বাজতেই মিত্রানী চমকে ওঠে, উঃ বাবা, নটা—তুমি বোসো
সজল, আমি চট্ট করে স্নান করে তৈরী হয়ে নিই—

কেন? এত তাড়াছড়ো কিসের?

আমি যে একটা কলেজে প্রফেসরী করছি কিছুদিন হলো—

সত্যি?

হ্যাঁ—এম. এ. পাস করে ডেক্টরেটের জন্য তৈরী হতে হতে একটা পেয়ে গেলাম—তবে
মাইনে সামান্যই—

আজকাল আর সে কথা বলো না মিত্রা, আজকাল শিক্ষক, অধ্যাপকদের মাইনে তো
ভালই দেয় শুনেছি আমাদের দেশে—

তা অবিশ্য দেয় তবে সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার মানটাও মার্কারি কলমের মতো প্রত্যহ
উর্ধ্বর্গতির দিকেই চলেছে—বোসো আমি আসছি—

না, না—আজকের দিনটা ড্রপ কর—নাই বা কলেজে গেলে আজ অধ্যাপিকা।

তা কি হয়, মেয়েরা ক্লাসে আমার জন্য হা-পিতোশ করে বসে থাকবে—

একটা দিন না হয় বসেই রইলো, ডুব মেরে দাও আজকের দিনটা—কতদিন পরে
এলাম! কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো বল তো, আমার অনারেই আজ না হয়

কাজে ডুব দিলে—

তা হয় না সজল।

অথচ আমি শুধু তোমারই জন্য—

আমারই জন্য?

তাই, তোমারই জন্য এসেছি।

সত্ত্ব বলছো?

বিশ্বাস তুমি যে করবে না তা আমি জানি মিত্রা, নচেৎ এতগুলো চিঠি লিখেছি অথচ একটারও জবাব দাওনি—

ডোক্ট টেল লাই সজল, তোমার প্রত্যেকটা চিঠিরই জবাব আমি দিয়েছি।

হ্যাঁ দিয়েছো, তবে আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। যে জবাবটি পাওয়ার জন্য প্রতিদিন তোমার চিঠির প্রত্যাশায় থেকেছি—

মিত্রানী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

আচ্ছা, তুমি কি সত্ত্বেই আমার চিঠির অর্থ বুঝতে পারোনি?

পারবো না কেন! মিত্রানী মৃদু মৃদু হাসে মুখের দিকে চেয়ে।

তবে?

কি তবে?

জবাব দিলে না কেন আমার প্রশ্নের?

ওসব কথা থাক সজল।

না। মুখোমুখি প্রশ্নটা যখন উঠলোই—জবাব আমি চাই—

নাই বা দিলাম জবাব!

না, বল—

আচ্ছা সজল, আমরা কি পরম্পর পরম্পরের কাছে বরাবর বন্ধুর মতই থাকতে পারি না, যেমন আমরা অনেকেই অনেকের সঙ্গে আছি আজো—

আচ্ছা মিত্রা!

বল?

তুমি অন্য কাউকে—মানে অন্য কারোর বাগদন্তা?

না—সে রকম কিছু নয়, তবে—মানে ঐ পর্যায়ে এখনো পৌছায়নি ব্যাপারটা—
অর্থাৎ?

অর্থাৎ মন জানাজানির পালা এখনো চলছে। যাক গে ওসব কথা। তুমি একটু বোসো লক্ষ্মীটি, আমি স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিই চট্ট করে—

মিত্রানী লঘুপদে ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সজল একাকী ঘরের মধ্যে চেয়ারটার উপর বসে রইলো। মিত্রানীর শেষের কথাগুলো যেন অকস্মাৎ একটা ফুৎকারের মত ঘরের একটি মাত্র আলো নিভিয়ে দিয়ে গেল।

সব কিছুই যেন সজলের অকস্মাৎ শূন্য মিথ্যা মনে হয়, মিত্রানী ঘর থেকে বাথরুমে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। যে সন্দেহটা গত তিন বৎসর ধরে একটা ধোঁয়ার মতই তার মনের মধ্যে জমা হচ্ছিল, সেটা যেন গাঢ় কালো একটা মেঘের মত তার সমস্ত মনের মধ্যে

ছড়িয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে।

সমস্ত সংশয় ও সন্দেহের যেন শেষ নিষ্পত্তি করে দিয়ে গেল মিত্রানী আর কত সহজেই না সেটা করে দিয়ে গেল।

আর কোন প্রশ্নেরই অবকাশ রইলো না কোথাও।

এত বছর ধরে যে আশাটা মনের মধ্যে স্থানে স্থানে লালন করেছে, নিজের মনে নিজেই স্বপ্ন দেখেছে, সব কিছুর উপর যেন একটা পূর্ণচেহদ টেনে দিয়ে গেল মিত্রানী সেই মুহূর্তে।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে স্নান করেছে মিত্রানী, শাওয়ারের ঝিরঝির বারিপতনের সঙ্গে সঙ্গে একটা গানের সুর মিশে যাচ্ছে।

বহু পরিচিত গানটা সজলের। বহুবার সজল গানটা শুনেছে মিত্রানীর কঠে। প্রথম শুনেছিল তাদের কলেজেরই একটা ফাংশনে। মিত্রানী যে গান গাইতে জানে জানা ছিল না কথাটা সজলের। সেই প্রথম ফাংশনে শুনেছিল তার গান।

একা মোর গানের তরী

ভাসিয়েছিলাম নয়নজলে,

সহসা কে এলো গো

এ তরী বাইবে বলে।

ঐ গানের মধ্যে দিয়ে যেন সেদিন সজলের মিত্রানীর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটে। তারপর কতবার অন্যরোধ করে মিত্রানীকে দিয়ে গানটা ও গাইয়েছে।

কেন মোর প্রভাত বেলায়

এলে না গানের ভেঙায়,

হলে না সুখের সাথী

এ জীবনের প্রথম খেলায়।

সজল বসেই থাকে। শাওয়ারের বারিপতনের ঝিরঝির শব্দ—তার সঙ্গে সুরের গুঞ্জন। যা জানবার ছিল—যা জানবার জন্য এত বছর ধরে সে প্রতীক্ষা করেছে তা তো তার জানা হয়ে গিয়েছে, তবে কেন এখনো সে বসে আছে!

কেন মিত্রানীর ঘরের দরজার সামনে ভিস্কুকের মত হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে এখনো, অপেক্ষায়—

কিসের অপেক্ষা! আর কেনই বা এ অপেক্ষা!

এবারে তো তার চলে যাওয়াই উচিত।

মনে মনে চলে যাবার কথ ভাবলেও, কেন জানি সজল উঠতে পারল না।

ঐ সময় স্নান সেরে ভিড়ে চুলের রাশ পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে মিত্রানী বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো।

প্রসন্ন নিষ্ক-মানের পর মিত্রানীর দিক থেকে যেন চোখ ফেরাতে পারে না সজল, চেয়েই থাকে।

মিত্রানী মৃদু হেসে বলালে, কি দেখছো সজল অমন করে আমার দিকে চেয়ে! মনে হচ্ছে যেন কখনো এর আগে তুমি আমাকে দেখনি—বলতে বলতে মৃদু হাসে মিত্রানী।

তেরচাভাবে টুলটার উপরে বসে মিত্রানী—সামনের ড্রেসিং টেবিলটার আয়নার দিকে

তাকিয়ে চুলে চিরনি চালাচ্ছে মিত্রানী।

মিত্রানীর গলাটা কি সুন্দর মনে হয় সজলের! কখনো ঐ গ্রীবা মিত্রানীর স্পর্শ করেনি
বটে সজল কিন্তু মনে হচ্ছে পাখীর গ্রীবার মতই যেন নরম তুলতুলে ও কোমল।

তারপর চিরনি চালাতে চালাতেই প্রশ্ন করল মিত্রানী, ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছো
সজল?

এসেছিলাম তো দিন কুড়ি ছুটি নিয়ে—তবে ভাবছি দু'চার দিনের মধ্যে ফিরে যাবো।

কেন? সে কি—এত তাড়াতাড়ি ছুটি না শেষ করেই ফিরে যাবে কেন? না, না,
এসেছো যখন, আমরা পুরানো বন্ধু-বন্ধবরা মিলে বেশ ক'টা দিন হৈ হৈ করে কাটানো
যাবে। তা অন্যান্য সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ক্ষিতীশ অমিয় মণি বিদ্যুৎ সুহাস সতীন্দ্র
পাপিয়া কাজল—

না—

দেখা হয়নি কারো সঙ্গে? কারো সঙ্গে দেখা করোনি?

না—আচ্ছা মিত্রানী, আমি উঠি আজ—

আরে বোসো বোসো—একসঙ্গেই যাবো—তুমি যাবে শ্যামবাজারের দিকে—
আমারও তো কলেজ এলিকেই—

না—আমার একটু কাজ আছে সেক্ষেত্রারিয়েটে। আচ্ছা চলি, বলেই উঠে দাঁড়াল
সজল এবং মিত্রানীকে আর কোন কথার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঐ দশজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—সেই কলেজ-
জীবনের ফাস্ট ইয়ার থেকেই। ডিগ্রী কোর্সে সকলে এসে একসঙ্গে একই কলেজে ভর্তি
হয়েছিল। এবং কলেজ-জীবনের দীর্ঘ তিনি বৎসরের পরিচয়ে ও ঘনিষ্ঠতায় ওদের
পরস্পরের মধ্যে একটা মধুর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল স্বভাবতই।

সজল কিছুদিন ওদের সঙ্গে আর্টস পড়েছিল, তারপর হঠাৎ আর্টস ছেড়ে দিয়ে কর্মার্স
নিয়েছিল। তার ক্লাস হতো সন্ধ্যার দিকে, কিন্তু তাতে করে মেলামেশার কোন অসুবিধা
হয়নি। ওদের মধ্যে বিদ্যুতের বাবার অবস্থাই ছিল সবচাইতে ভাল। বনেদী ধনী বংশের
ছেলে তো ছিলেনই—নিজেও ওকালতী করে সমরবাবু—বিদ্যুতের বাবা—প্রচুর উপার্জন
করতেন।

শ্যামবাজার অঞ্চলে বিরাট সেকলে বাড়ি। তিন-চার শরিক—এক এক শরিকের
এক এক মহল—একতলায় একটা বিরাট হলঘর ছিল—প্রতি রবিবার সন্ধ্যার দিকে ঐ
দশজন বিদ্যুৎদের ঐ হলঘরে জমায়েত হয়ে আড়া জমাতো। প্রতি রবিবারের সেটা ছিল
ওদের একটা বাঁধা ঝুঁটিন।

শুধু আড়াই নয়—গান-আবৃত্তি চলতো মধ্যে মধ্যে। বিদ্যুতের মা শৈলবালা প্রচুর
জলযোগের ব্যবস্থা করতেন সবার জন্ম।

এক বিদ্যুৎ ছাড়া অন্য সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে। ওদের—মানে, ছেলেদের
মধ্যে সুহাসই ছিল লেখাপড়ায় সবার সেরা এবং মেয়েদের মধ্যে ছিল মিত্রানী।

॥ দুই ॥

সজলের কিন্তু একটা কমপ্লেক্স বরাবরই ছিল। সেই কমপ্লেক্সের জন্যই বোধ হয় সে অন্যান্যদের সঙ্গে ঠিক মন খুলে মিশতে পারত না। শুধু তাই নয়, জীবনটাকে বরাবরই সে একটু সিরিয়াস ভাবে নিয়েছে—ভাল চাকরি করবে—জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে—জীবনে সাচ্ছল্য আসবে এটাই ছিল তার স্বপ্ন বরাবরের। সজল চলে যেতে মিত্রানীর মনে হলো, সজল আজো তেমনি আছে—তিনি বছরে কোন পরিবর্তনই হয়নি তার। জীবন সম্পর্কে আজো সে তেমনি সিরিয়াস।

মিথ্যা বলেনি সজল মিত্রানীকে, কমপিটিউট পরীক্ষায় পাস করে চাকরি নিয়ে কলকাতা ছাড়বার পর, বিশেষ করে গত দুই বৎসরে যে-সব চিঠি সজল তাকে লিখেছে তার মধ্যে প্রায় শেষের দিকের সবগুলো চিঠিতেই একটি কথা যেন বারবার ঘূরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছে সজল তাকে। এবং তার সহজ অর্থই হচ্ছে, সজল তাকে জীবনসদ্বিনীকৃপে পেতে চায়—অবশ্য মিত্রানীর যদি আপত্তি না থাকে।

মিত্রানী সজলের সব চিঠিতেই জবাব দিয়েছে কিন্তু কেন না-জানি কোন চিঠির মধ্যেই সে লিখতে পারেনি সজল যা চায় তা হতে পারে না, তার পক্ষে সজলের অনুরোধ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়—বরং কিছুটা কৌশলেই যেন সজলের প্রশ্নের জবাবটা এড়িয়েই গিয়েছে এবং এও ভেবেছে মিত্রানী, সজল হয়ত নিজে থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এবং একসময় ঐভাবেই হয়ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

কিন্তু এখন বোঝা গেল তা হয়নি।

সেদিনকার মিত্রানীর মনের ঐ কথাগুলো পরে মিত্রানীর ডাইরীর পাতায় আরো অনেকে কথার সঙ্গে একেবারে শেষের দিকে জানতে পারা গিয়েছিল।

প্রায় নিয়মিতই বলতে গেলে প্রতি রাত্রে ঘূর্মোতে যাবার আগে মিত্রানী ডাইরী লিখতো, কিন্তু যাক—সে তো আরো পরের কথা।

নাচের কথাগুলো মিত্রানীর ডাইরীর পাতা থেকেই জানা যায়।

বেচারী সজল। সত্যিই ওর জন্য আমি দুঃখিত। হয়ত আজ স্পষ্ট করে ওকে আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কথাটা : সজল, মনে মনে আমি সুহাসের কাছে অনেকদিন থেকেই বাগদত্ত। আমি শুধু অপেক্ষা করে আছি কবে সুহাস এসে আমায় বলবে, মিতা, তোমাকে আমি ভালবাসি—তোমাকেই আমি চাই।

কি জানি—পারলাম না বলতে কিছুতেই যেন কথাটা সজলকে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা যেন কিছুতেই অমন স্পষ্ট করে ওকে জানিয়ে দিতে পারলাম না।

বুঝতে পারছি অনেকখানি আশা নিয়েই সজল আজ আমার কাছে এসেছিল।

কিন্তু কি করবো—আমি কি করবো—কি আমি করতে পারি?

আচ্ছা আমি যেমন সুহাসকে ভালবাসি, সেও কি তেমনি আমায় ভালবাসে?

কি জানি বুঝতে পারি না। ও এত চাপা যে কিছুই বোঝা যায় না ওর ভিতরের কথা।

কেন যেন মিত্রানীর চোখে সেরাত্তে একেবারে ঘুম ছিল না।

পরের দিন সকালে উঠে সবে চায়ের কাপটা নিয়ে বসেছে, বাবার ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠলো এবং একটু পরেই বাবার গলা শোনা গেল, মিতান মা, তোমার ফোন—

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখেই মিত্রানী বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। মিত্রানীর বাবা অবিনাশ ঘোষাল ঐদিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন। মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, তোমাকে এত করে বলি মিতান মা ফোনটা তোমার ঘরে নিয়ে নাও—যথন-তথন এত বিরক্ত করে—

বাড়িতে ফোন আসার কিছুদিন পর থেকেই অবিনাশ ঘোষাল এ কথা বলে আসছেন। নিজে বরাবর স্কুল-মাস্টারি করেছেন—এখনো করছেন—রিটায়ার করার প্রায় সময় হয়ে এলো, তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে—ছেলে বড়, ডাঙ্গোর-ছেলে প্রণবেশই তার নামে ফোনটা এনেছিল বছরখানেক আগে বাড়িতে—সরকারের কাছে বিশেষ আবেদন জানিয়ে। কিন্তু ফোন বাড়িতে আসার মাস তিনিকের মধ্যেই সে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে।

অবিনাশ ঘোষাল কখনো কারো কাছে ফোন করেন না—তাঁকেও বড় একটা কেউ ফোন করে না। ফোন আসে মিত্রানীর কাছেই।

এবং মিত্রানীই ফোন করে কখনো-সখনো।

মিত্রানী রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো!

মিত্রানী নাকি? আমি সুহাস।

কেন জানি সুহাসের নামটা শুনেই ধৃক করে ওঠে মিত্রানীর বুকের ভিতরটা। তাকে বন্ধু-বন্ধবরা ফোন করে, সুহাস কখনো আজ পর্যন্ত তাকে ফোন করেনি।

সুহাস অবিশ্য সময়ই পায় না বড় একটা। এম. এ. পড়তে পড়তেই, তার বরাবর অত ভাল পরীক্ষায় রেজাল্ট হওয়া সত্ত্বেও পড়া ছেড়ে দিয়ে কোন একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি নিয়েছে।

মাইনে এমন বিশেষ কিছুই নয়।

মিত্রানী চাকরির সংবাদটায় তেমন নয়, যতটা পড়া ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্বিত হয়ে শুধিরেছিল, তা তুমি পড়া ছেড়ে দেবে কেন?

সুহাস বলেছিল, দুটো তো একসঙ্গে ম্যানেজ করা যাবে না মিত্রানী—

কিন্তু পাস্টা করেই না হয় চাকরিতে ঢুকতে—অনেক ভাল চাঙ্গ হয়ত পেতে।

ঠিক, তা হয়ত পেতাম, কিন্তু সময় তো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে না। আজকের অভাবটা হয়তো আরো তখন দুঃসহ হয়ে উঠবে।

কিন্তু এম. এ.-তে তুমি নির্ধার ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হতে, তখন অনেক ভাল চাকরি হয়ত তোমার জুটতো।

হয়ত নাও জুটতে পারতো, তাছাড়া—

কি?

তুমি যা বলছো—এম. এ.-র রেজাল্টটা ভাল হলে এবং সেরকম চাকরি না পেলে ব্যর্থতাটা হয়ত আরো বেশী পীড়া দিত মিত্রানী, এই বরং ভাল করেছি—

তোমার এত ভাল কেরিয়ার, মিত্রানী তব যেন বোঝাবার চেষ্টা করেছে সুহাসকে।
সুহাস বলেছে, মাইনেটা কিন্তু নেহাঁ কম নয়—ডি. এ.. নিয়ে প্রায় তিনশ'র মতো
পারো—তারপর উন্নতি করতে পারলে—

কি জানি, মিত্রানী বলেছে, আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি বোধ হয় ভুল করলে সুহাস।
আরে আমরা তো জন্ম-মৃত্যুতেই ভুল করে বসে আছি—

মানে?

এই প্রচণ্ড স্ত্রাগনের জমানায় মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মানেটাই তো একটা ভুল—পথ
সীল্ড, সব পথে কঁটা—দু'পা এগুতে গেলেই হাঁচট খেতে হবে।

সুহাস আর সজল যেন একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত! মিথ্যে নয়, মিত্রানীর কত সময়
পরবর্তীকালে মনে হয়েছে সজলের মতো সুহাস কেন মনের মধ্যে সাহস পেল না!
মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তো দুজনাই—অথচ সুহাস লেখাপড়ায় কত ভাল ছেলে!

এম. এ.-টা পাস করতে পারলে সে অন্যাসেই একটা ভাল কলেজে কাজ পেয়ে
যেতো—তা না একটা সামান্য কেরানীগিরিতে ঢুকে গেল, যার কোন ভবিষ্যৎ নেই—যে
চাকরি-জীবনে কোন উন্নত বন্দুদের মধ্যে সুহাসই প্রথমে চাকরিতে
ঢুকেছিল।

তারপর কমপিটিউট পরীক্ষা দিয়ে সজল চাকরিতে ঢুকলো, সুহাস চাকরিতে ঢোকার
পর যেন অন্য সকলের কাছ থেকে কেমন একটু দরেই চলে গিয়েছিল। ডিগ্রী কোর্স শেষ
হবার পর থেকেই ওদের বিদ্যাতের বাড়ির আড়তায় সমাপ্ত ঘটেছিল। তাহলেও মধ্যে
মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতো। তবে এ দেখাসাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্তই, আগের
মতো আড়তা দেওয়া আর হয়ে গঠেনি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের যৌঁজথবর অবিশ্য পেতো
এ ওর কাছ থেকে মধ্যে মধ্যে।

সকলেই যে যার ধান্ধায় ব্যাস্ত। সকলেই চাকরি করে, একমাত্র বিদ্যুৎ ছাড়া।

যাদের বাড়িতে ফোন আছে, যেমন বিদ্যুৎ, কাজল, মণি এবং মিত্রানী—তারা পরস্পর
পরস্পরকে মধ্যে মধ্যে ফোন করতো।

সুহাস কখনো তাকে ফোন করেনি। আর মিত্রানীও কখনো আজ পর্যন্ত সুহাসকে
ফোন করেনি—বিশেষ করে তাই মিত্রানী একটু যেন বিশ্বিতই হয়েছিল সুহাসের ফোন
পেয়ে।

সুহাস ফোনের অপর প্রান্ত থেকে আবার বললে, আমি সুহাস!

কি থবর সুহাস—হঠাঁ ফোন করছো?

সজল কলকাতায় এসেছে জানো? সুহাস মিত্রানীর প্রশ্নের জবাবে বললো।

জানি। পরশু সে আমার এখানে এসেছিল।

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর স্তুতা, তারপর সুহাসের গলা শোনা গেল, মিত্রানী!
বল।

বলছিলাম—মানে, সজল তোমাকে কিছু বলেছে?

মিত্রানী ভেবে পায় না সুহাসের প্রশ্নের কি জবাব দেবে। সজল সেদিন তাকে যে
কথাটা বলেছিল সেটা কি কাউকে বলা ঠিক হবে! বিশেষ করে সুহাসকে!

চুপ করে আছো কেন মিত্রানী, সজল তোমাকে কিছু বলেছিল ?

না—মানে বলছিলাম, হঠাৎ ঐ প্রশ্ন কেন ?

সুহাস আবারও তার প্রশ্নটায় পুনরাবৃত্তি করলো, বল না, সজল তোমাকে কিছু বলেছিল ?

না তো—সেরকম কিছু তো আমার মনে পড়ছে না সুহাস—তবে কি তুমি ঠিক জানতে চাও যদি বলতে—

আছো মিত্রানী, সজল কি তোমাকে বলেছিল যে সে তোমাকে ভালবাসে—সে তোমাকে বিয়ে করতে চায় ? আর জবাবে তাকে তুমি বলেছিলে, তা সম্ভব নয়—কারণ তুমি অন্য একজনকে ভালবাসো ?

তোমাকে—মানে সজল তোমাকে ঐ কথা বলেছে ? মিত্রানীর কঠস্বরে খানিকটা বিস্ময় যেন ফুটে উঠে।

সুহাস তখন আবার বললে, নচেৎ আমি জানবো কি করে, বল ! সজলের কাছে অবিশ্য তুমি তার নামটা বলেননি—তাকে এড়িয়ে গিয়েছো, কিন্তু আমাকে তো তুমি বলতে পার—কে সে ? আমাদের বন্ধুদের মধ্যেই কেউ কি ?

কি হবে নামটা জেনে তোমার ?

বস্তুত মিত্রানীর যেন কিছুটা অভিমানই হয়। সবার মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত সুহাসই কিনা তাকে আজ নামটা জিজ্ঞাসা করছে ! আজও কি সে তাহলে বুঝতে পারেনি মিত্রানীর মনটা কোথায় বাঁধা পড়েছে !

কি হলো মিত্রানী, বলো ?

মিত্রানী আর কোন কথা বলেনি ফোনে—নিঃশব্দে সে ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছিল। ঐ তারিখের মিত্রানীর ডাইরীর পাতায়—ঐ ঘটনার কথটা লিখবার পর সে লিখেছে : আজ বুঝতে পারলাম, এতদিন যা ভেবে এসেছি তা মিথ্যা। সেই সঙ্গে বুঝতে পারলাম, সুহাসের মনের মধ্যে কোথাও আমি নেই।

॥ তিন ॥

ঐ ঘটনারই পরের দিন সজল আবার হঠাৎ এলো বিকেলের দিকে মিত্রানীদের ওখানে। শেষের ক্লাস দুটো মিত্রানীকে নিতে হ্যানি বলে একটু আগেই কলেজ থেকে চলে এসেছিল ও। গতকালের ঘটনার পর থেকেই মনটা তার ভাল ছিল না, টেলিফোনে সুহাসের কথাগুলোই যেন কেবল তার মনে পড়ছিল। মুখে কোনদিন কথটা দে প্রকাশ না করলেও —সুহাস কেন বুঝতে পারলো না মনটা তার এত বছর ধরে কোথায় বাঁধা পড়েছে।

নিজের ঘরে ক্যামবিশের আরাম-কেদারাটার উপরে গা ঢেলে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে ছিল মিত্রানী—সজলের ভুতোর শব্দটা পর্যন্ত তার কানে প্রবেশ করেনি সজলের কঠস্বরে সে চোখ মেলে তাকাল।

মিত্রানী !

কে ? ও সজল, এসো—মিত্রানী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু সজল তাকে বাধা

দিয়ে বললে, আর ব্যস্ত হতে হবে না তোমাকে, বসো বসো—বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সজল ওর মুখোমুখি বসে পড়ল।

মিত্রানী ভেবেছিল সেদিনকার তার ঐ শ্পষ্ট কথার পর সজল বোধ হয় জীবনে আর তার সামনে এসে দাঁড়াবে না। কথাটা ভেবে তার একটু কষ্টও হয়েছিল, এখন সজলকে আসতে দেখে সে যেন একটু খুশিই হয়। শুধু তাই নয়, ঐ মুহূর্তে সজলের চোখমুখের ভাব দেখে মিত্রানীর মনেও হলো না, তার সেদিনকার সেই কথায় সজল এতটুকু অসম্ভট হয়েছে বা সে কথাগুলো তার মনে আছে!

কখন ফিরলে কলেজ থেকে? সজল শুধালো।

এই কিছুক্ষণ আগে—মিত্রানী বললে।

তোমাকে যেন একটু কেমন ক্লাস্ট মনে হচ্ছে, মিত্রানী!

মিত্রানী মৃদু হেসে বলল, না। সে সব কিছু নয়—আচ্ছা সজল—

বল?

সুহাসের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বুঝি?

শুধু সুহাস কেন, সকলের সঙ্গেই তো দেখা করেছি—কেন বল তো, হঠাত সুহাসের কথা কেন?

না, এমনি—

তা কই, আজ যে চায়ের কথা বললে না?

চা খাবে?

খাবো না মানে—এনি টাইম ইজ টি-টাইম।

বোসো—আমি আসছি—

মিত্রানী ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সজল বসে বসে একা একা মিত্রানীর টেবিলের উপর রাখা বই ও খাতাপত্রগুলো খাঁটতে লাগল। একটু পরেই মিত্রানী ঘরে ফিরে এলো। জানো মিত্রানী, একটা প্ল্যান করেছি,—সজল বললে।

প্ল্যান!

হ্যাঁ, কে কবে কোথায় কখন থাকি—বিশেষ করে আমি তো আজ এখানে কাল সেখানে, তাই ঠিক করেছি একদিন সকলে মিলে সারাটা দিন কোথাও হৈ-চৈ করা যাবে।

বেশ তো। মন্দ কি—নট এ ব্যাড আইডিয়া!

পরশু শনিবার কি যেন একটা ছুটি আছে—তাই বিদ্যুৎকে আজ সকালেই বলেছি—আমরা সকলে শনিবারের দিনটা বটানিকস-এ গিয়ে হৈ-চৈ করে কাটাবো! কেন, বিদ্যুৎ তোমাকে ফোনে কথাটা বলেনি? সে তো বলেছিল, সে-ই তোমাকে ফোনে আমাদের প্ল্যানটা জানিয়ে দেবে—

না, এখনো বলেনি। হয়ত আজ সক্ষেপেলা বলবে। তা সবাইকে কথাটা জানানো হয়েছে?

বিদ্যুৎ সকলকে জানাবার তার নিয়েছে—তার গাড়ি আছে, ফোনও আছে, তার পক্ষেই সুবিধা।

প্রোঢ়া গোপালের ম্যা, মিত্রানীদের বাড়ির দাসী ঐ সময় দ্রেতে করে দু'কাপ চা ও

একটা প্লেটে কিছু খাবার নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

মিত্রানী একটু নীচু টুল এনে সামনে রেখে বলল, এটার উপরে রাখ গোপালের মা! গোপালের মা ট্রেটা নামিয়ে রেখে চলে গেল।

সজল বললে, এ কি, এক প্লেট খাবার কেন—তুমি কিছু খাবে না মিত্রানী? না। এ সময় আমি এক কাপ চা ছাড়া কিছু খাই না।

রাত্রি প্রায় আটটা পর্যন্ত মিত্রানীর সঙ্গে সজল এটা-ওটা নানা গল্প করে এক সময় মিত্রানীকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করল।

মিত্রানী প্রথমটায় গান গাইতে চায়নি কিন্তু সজলের পীড়াপীড়িতে গাইতেই হলো। সজল বললে, সেই গানটা গাও মিত্রানী!

কোন্ গানটা?

সেই যে অতুলপ্রসাদের সেই গানটা—

অতুলপ্রসাদের তো অনেক গান আছে, কোন্টা শুনতে চাও তাই বলো না।

সেই যে ‘একা মোর গানের তরী—’

মিত্রানী গেয়ে শোনায় গানটা। তারপর এক সময় সজল বিদায় নেয় মিত্রানীর কাছ থেকে। সজলকে দুদিন আগে স্পষ্ট করে তার প্রস্তাবে না বলার পর থেকেই মিত্রানীর মনের মধ্যে স্বভাবতই যে সংকোচটা দেখা দিয়েছিল তার যেন বিন্দুমাত্রও আর অবশিষ্ট থাকে না। যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে সজল ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেয়নি। মনটা মিত্রানীর হালকা হয়ে যায়।

বিদ্যুৎ মিত্রানীকে ফোন করেছিল পরের দিন সকালে।

সজল কলকাতায় এসেছে কয়েক দিনের ছুটিতে তুমি তো জান মিত্রানী—বলেছিল বিদ্যুৎ।

জানি, মিত্রানী বললে।

সে বলেছিল, কাল শনিবার আমরা পুরানো দিনের বন্ধুরা একটা দিন বটানিক্স-এ হৈ-চৈ করে কাটাবো—

হ্যাঁ, সে কাল আমার এখানে এসেছিল—বলছিল তোমাকে নাকি কথাটা বলেছে—তুমি সকলকে জানাবে।

জানিয়েছি। সবাই রাজি।

সুহাস কি বললো?

সেও রাজি বৈকি। তাহলে তুমি আসছো তো মিত্রানী?

হ্যাঁ—যাবো। তা খাওয়াদাওয়ার কি হবে?

সে ব্যবস্থা আমিই করবো বলেছি সকলকে। তা কি মেনু করা যায় বল তো? কাজল বলছিল—

কি বলছিল?

একে এই বৈশাখের প্রচণ্ড গরম—কোন কিছু হেভী নয়—লাইট রিফ্রেশমেন্ট-এর মত কিছু—

তা সত্তি—সময়টা আউটিং-এর পক্ষে আদৌ ভাল নয়—যা প্রচণ্ড গরম চলছে—

তা অবিশ্যি ঠিক। তবে আজ ক'দিন থেকে প্রত্যেক দিনই তো সন্ধ্যায় কালৈশাথী হচ্ছে—মেঘ করে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে—সন্ধ্যার দিকটা বেশ ঠাণ্ডাই মনে হয়।

আচ্ছা বিদ্যুৎ, কোল্ড ড্রিংক্স-এর কিছু বন্দোবস্ত করলে হয় না?

বিদ্যুৎ বললে, সে ব্যাবহা আমি করেছি—একটা আইস-বক্স নেবো—তার মধ্যে কোল্ড ড্রিংক্স থাকবে। আর থাকবে—কি বল তো?

বরফ।

না—আইসগ্রীম—

ওঁ, হাউ লাভলি! তবে একটু বেশি করে নিও কিন্তু—

নেবো।

হ্যাঁ বাবা, আমার দুটো-একটায় হবে না। যত খুশি যেন পাই—

এসময়ে আউটিং-এর ব্যাবহা হলেও সজলের পরিকল্পনাটা কিন্তু সকলেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। বহুদিন সকলে একত্রে মিলে আড়তা দেয়নি।

কলেজ-জীবনের সেই আনন্দময় দিনগুলো যেন হারিয়েই গিয়েছিল প্রত্যেকের জীবন থেকে।

কথা ছিল যে যার মত বটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে পৌঁছবে এবং সেই প্রাচীন বটবৃক্ষের তলে গিয়ে একত্রে মিলিত হয়ে জায়গা একটা বেছে নেওয়া হবে। তবে সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই সকলকে পৌঁছতে হবে।

মিত্রানীর পৌঁছতেই মিনিট পনেরো দেরি হয়ে গিয়েছিল। মিত্রানীকে দেখে সকলে হৈ হৈ করে উঠলো। মিত্রানী সকলের দিকে তাকাল।

সবাই এসেছে—বিদ্যুৎ, ফিল্ডেল, অমিয়, মণি, সতীন্দ্র, সুহাস, পাপিয়া, কাজল—কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে মিত্রানী বনলে, ব্যাপার কি, বিদ্যুৎ—আমাদের আজকের আউটিং-এর পরিকল্পনাকারী সজলকে দেখছি না যে—সজল আসেনি?

বিদ্যুৎ বললে, ভেরী স্যাড!

স্যাড! কি ব্যাপার? সজলের কিছু হয়েছে নাকি?

না—

তবে?

হঠাতে একটা জরুরী ট্রাংক কল পেয়ে তাকে তার কর্মস্থলে আজকেই সকালের প্লেনে চলে যেতে হচ্ছে।

এতক্ষণে হয়ত এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছে—বলছিল সকাল সাড়ে দশটায় বাগড়োগরার প্লেন। বিদ্যুৎ বললে।

বেচারী—তারই উৎসাহে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হলো—অথচ সে-ই আসতে পারল না!

হ্যাঁ, খুব ভোরে আজ আমার ওখানে এসেছিল সজল, বললে, আমাকে হঠাতে চলে যেতে হচ্ছে ভাই। জানই তো, পরের চাকরি—রেসপন্সিবল পোস্টে আছি—সকালের প্লেনেই ফিরে যেতে হচ্ছে। তাতে আমি বলেছিলাম, প্রোগ্রামটা তাহলে ক্যানসেল করে

দিই। সজল বললে, না, তা করো না—নহি বা থাকলাম আমি তোমাদের মধ্যে—তোমরা সকলে এন্জয় কর—বেটার লাক নেক্সট টাইম! তাই আর কাউকে কথটা জানাইনি—তা ছাড়া সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গিয়েছে।

বেচারী সজল!

॥ চার ॥

সকলেই সজলের অনুপস্থিতিটা সেদিন যেন সর্বক্ষণ অনুভব করেছে। তবু সকলে অনেক দিন পর একত্রে মিলিত হওয়ায় প্রচুর হৈ-চৈ করতে লাগল।

বৈশাখের ঐ প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও যেন কারো এতটুকু কোন ক্লাস্টিবোধ হয়নি। ক্রমে ক্রমে বেলা পাঁচটা বাজে—কারোর ফেরার কথা ঘনেই হয়নি। বরং সবাই হির করে, চাঁদনী রাত আছে—সন্ধ্যার পর সকলে ফিরবে।

সুহাস ঐ সময় বললে, কাগজে আজ লিখেছে কিন্তু বজ্রবিদ্যুৎসহ সন্ধ্যার দিকে এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে—

অমিয় বললে, তাহলে আজ অস্তত নিশ্চিন্ত থাকতে পার বন্ধু—আমাদের ঐ আবহাওয়া অফিসের ফোরকাস্ট কোনদিনই ঠিক হয় না। যে দিনটি তাঁরা বলেন, ঠিক তার উল্টোটাই হয়—

সকলে অমিয়ের কথায় হেসে ওঠে। সুহাস বললে, কিন্তু ক'দিন ধরেই আবহাওয়া অফিসের ফোরকাস্ট মিলে যাচ্ছে কিন্তু।

অমিয় বললে, আজ আর মিলবে না দেখে নিও, তাছাড়া—চন্দপতন তো শুরুতেই ঘটে গিয়েছে—

কাজল শুধায়, কিসের আবার চন্দপতন ঘটলো?

উদ্যোগ্নাই শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত—আসা হলো না তার।

মিত্রানী সুহাসের মুখের দিকে তাকাল। একবার ইচ্ছা হয়েছিল তার সুহাসকে জিজ্ঞাসা করে, সজল তাকে আর কি বলেছিল! কিন্তু পারে না— কেমন যেন একটা সংকোচ বোধ করে।

কাজল ঐ সময় হঠাত বলে ওঠে, তোকে আজ যা নীল রংয়ের সিঙ্কের শাড়িটায় দেখাচ্ছে না—

সুহাস মন্দ হেসে বললে, মিত্রানীর প্রেমে যেন আবার পড়ে যেও না কাজল, দেখো—

সুহাসের কথায় যেন একটু চমকেই তাকাল মিত্রানী তার মুখের দিকে।

কাজল হাসতে হাসতে জবাব দেয়, যাই বলো সুহাস, আমাদের ছেলে-বন্ধুগুলো একেবারে গবেট—দলে মিত্রানীর মতো একটা মেয়ে থাকতে এত বছরে এখনো কেউ ওর প্রেমে পড়তে পারল না।।

সুহাস বললে, কি করে জানলে কাজল যে আমাদের মধ্যে কেউ এখনো ওর প্রেমে পড়েনি?

মশাই, অত রেখে ঢেকে কেন? কাজল বললে, কেউ কিছু মনে করবে না—বলে

ফেলো, বলে ফেলো—আফটার অল উই আর ফ্রেন্ডস হিয়ার!

মিত্রানী বলে ওঠে, আঃ, কি হচ্ছে কাজল—

দেখ্ বাবা—তোরা যে যাই বলিস, কাজল বললে, প্রেমের ব্যাপারটা কিন্তু সত্ত্বিই আমার বড় ভাল লাগে—প্রেমে পড়াও যেমন আনন্দ—প্রেমে কেউ কারোর পড়েছে শুনেও আনন্দ—

বিদ্যুৎ হাসতে হাসতে ঐ সময় বলে ওঠে, অমিয়-ক্ষিতীশ-সুহাস, তোরা কেউ কেন কাজের নোস—মেয়েটা প্রেমের জন্য এত হেদিয়ে উঠেছে, অথচ তোরা—এতগুলো পুরুষমানুষ—

সুহাস বললে, একেবারে নীরব—পায়াণ—সব পায়াণ বুঝলে কাজল—

কাজল বলে ওঠে, থাক্ বাবা থাক্—আমি না হয় কালোকুছিত আছি—

সতীন্দ্র তাড়াতাড়ি বলে, ছিঃ, কাজল—ডোন্ট বি সিরিয়াস! সতীন্দ্র ব্যাপারটা হালকা করে দেবার চেষ্টা করে।

মিত্রানী ঐ সময় বললে, আচ্ছা, তোমরা কেউ আর কি কোন কথা খুঁজে পাচ্ছা না যে, প্রেম নিয়ে সকলে বাক্যবুদ্ধি কোমর বেঁধে নেমে পড়েছো?

সতীন্দ্র বললে, ঠিক,—অন্য কথা বলো, অন্য কথা।—বরং একটা গান হোক, মিত্রানী একটা গান গাও—

অবশেষে মিত্রানীর গানের ভিতর দিয়েই সমস্ত ব্যাপারটা যেন হালকা হয়ে গেল।

থাওয়াদাওয়ার পর্ব চুকতে চুকতেই বেলা প্রায় তিনটে হয়ে গেল। সকলে হাঁটতে হাঁটতে অতঃপর গঙ্গার ধারে যায়। এবং গঙ্গার ধারে অনেকক্ষণ বসে ছিল ওরা—ইতিমধ্যে অপরাহ্নের আকাশে কখন কালো একখণ্ড মেঘ জমতে শুরু করেছে ওদের খেয়ালও হয়নি কারো, হঠাতে খেয়াল হলো আচম্ভিতে একটা ধূলোর ঘূর্ণি এলোমেলোভাবে ছুটে আসায়। পরিদৃশ্যমান জগৎকা যেন মুহূর্তে সেই ধূলো আর রাশ্মিকৃত ছেঁড়া পাতায় একেবারে মুছে একাকার হয়ে গেল।

আঁধি!

মেয়েদের শাড়ির আঁচল আর চুলের রাশ এলোমেলো এবং কেউ কিছু ভাল করে বুঝবার আগেই দলের নজিন কে যে কোথায় কেমন করে ছিটকে পড়লো ওরা যেন বুঝতেই পারল না। অবশ্য ঐ প্রচণ্ড ধূলোর বাড়ের মধ্যে কারো দিকে কারো নজর দেবার মত বুঝি কোন সুযোগও ছিল না।

মিনিট পনেরো কি কুড়ি হবে—ধূলোর বড় যখন থেমেছে—কয়েক ফেঁটা বৃষ্টি—তারাই মধ্যে বিদ্যুৎ লক্ষ্য করলো, সে দলছাড়া হয়ে একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে। এদিক ওদিক তাকাল বিদ্যুৎ, কিন্তু আশেপাশে দলের আর কাউকেই সে দেখতে পেল না।

বিদ্যুৎ অন্যান্য সবাইকে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলল।

পরে জানা গিয়েছিল, একা বিদ্যুৎই নয়—সতীন্দ্র, অমিয়, মণি (মণিময়), ক্ষিতীশ, কাজল, পাপিয়া সাতজনই ওরা একে অন্যকে বেশ কিছুটা সময় খুঁজে বেড়িয়েছে। অবশেষে সকলে যখন একত্রিত হয়েছে, কাজলই বললে, সুহাস মিত্রানী, তাদের দেখছি না—তারা দুজন কই?

মিত্রানী—সুহাস। তাই তো, সবাই যেন ঐ মুহূর্তে কাজলের কথায়, মিত্রানী ও সুহাস যে তাদের মধ্যে নেই—ব্যাপারটা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলো।

মিত্রানী সুহাস কোথায় গেল!

সকলেই সুহাস আর মিত্রানীর নাম ধরে ডাকে আর ওদের হোঁজে।

মিত্রানী—সুহাস! কোথায় তোমার! মিত্রানী সু—হা—স—

বিদ্যুৎই ওদের মধ্যে শেষ বাপসা আলোয় প্রথমটায় সুহাসকে আবিষ্কার করেছিল—সর্বপ্রথম। অর্থাৎ ওর দৃষ্টিই সকলের আগে সুহাসের উপরে গিয়ে পড়ে।

সুহাস উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে—একটা ভাঙা পত্রবহুল গাছের ডাল, তারই নীচে সুহাসের দেহের নিম্নাংশ চাপা পড়েছে।

বিদ্যুৎ আর অমিয় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ভাঙা ডালটা টেনে সরায়—অন্যরা সুহাসের মুখের উপর ঝুকে পড়ে। কাজল ডাকে, সুহাস!

সবাই তার গলায় যেন একটা কাঘার সুর শুনছিল।

মিত্রানীর কথা ঐ মুহূর্তে আর কারো মনে ছিল না। মনেও পড়েনি কথাটা কারো যে একা সুহাসই নয়, মিত্রানীকেও পাওয়া যাচ্ছে না—সুহাসকে নিয়েই সকলে তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কাজল বসে পড়েছিল একেবারে সুহাসের মাথার সামনে। তার মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে ডাকে, সুহাস—সুহাস—

সুহাস যেন অতি কঠে চোখ মেলে তাকাল।

সুহাস—কাজল আরো ঝুকে পড়ে সুহাসের মুখের কাছে।

কে?

আ—আমি কাজল।

বিদ্যুৎ এগিয়ে এলো। সে বললে, লেগেছে কোথাও তোর সুহাস?

হ্যাঁ—মাথায়—

সত্ত্বাই সুহাসের মাথায় আঘাতের চিহ্ন ও রক্ত।

সুহাস উঠে বসতে বসতে বললে, উঃ, ভীষণ চোট লেগেছে মাথায়। এখনো মাথার মধ্যে বিম বিম করছে, ক্লান্ত অবসন্ন কঠে সুহাস বললে। তারপরই একটু থেমে বললে, মিত্রানী—মিত্রানী কোথায়?

বিদ্যুৎ বললে, মিত্রানীকে দেখছি না। তুই দেখেছিস তাকে?

না তো—তবে—

কি তবে? অমিয় সাগ্রহে শুধায়।

ধূলোয় ঘূর্ণির অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, সুহাস পূর্ববৎ ক্লান্ত গলায় বলতে থাকে থেমে থেমে, হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম পিছন থেকে—মাথাটা বিম বিম করে উঠলো—সব অন্ধকার হয়ে গেল—

তারপর? বিদ্যুৎ শুধালো।

জানি না। তারপর আর কিছু জানি না।

॥ পাঁচ ॥

মিত্রানীকে বেশী খুঁজতে হয়নি—

সুহাস যেখানে পড়ে ছিল—সেই ঝোপটারই অন্য দিকে একটা গাছের নীচে, মিত্রানীকে পাওয়া গেল—চিত হয়ে পড়ে আছে মিত্রানী। হাত দুটো ছড়ানো। বিদ্যুৎই প্রথমে দেখতে পায়।

তার পরনের নীল মুর্শিদাবাদী সিঙ্কের শাড়িটার আঁচল বুকের উপর থেকে সরে গিয়েছে আর—শাড়ির প্রাপ্তভাগটা প্রসারিত হাঁটুর অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। বাঁ দিককার জংগ্যা অনেকটা—

গায়ের ব্লাউজের বোতামগুলো মনে হয় কেউ যেন হাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলেছে। তলার ব্রেসিয়ারটারও একই অবস্থা।

চোখ দুটো যেন মিত্রানীর ঠেলে বের হয়ে আসছে। যেন এক অসহ্য যন্ত্রণার স্পষ্ট চিহ্ন ওর সারা মুখে তখনো। মুখটা সামান্য হাঁ করা, উপরের পাটির দাঁতের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। বোবা—সবাই যেন বোৱা হয়ে গিয়েছে।

বিদ্যুৎই সামনে মিত্রানীর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে অর্ধস্ফুট একটা চিংকার করে উঠে।

মিত্রানী—মিত্রানী মরে গেছে—

হ্যাঁ—সত্যিই—মিত্রানী মৃত।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই যেন কেমন বোবা—বিমৃঢ়।

সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কেমন যেন বোবা অসহায় দৃষ্টিতে।

সুহাস-বিদ্যুৎ-অমিয়-সতীন্দ্র-কাজল-পাপিয়া-মণি-ক্ষিতীশ—

ইতিমধ্যে আসন্ন সন্ধ্যায় ঝাপসা অন্ধকার কখন যেন আরো ঘন, আরো জমাট বেঁধে উঠেছে।

কেউ কাউকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না, ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে কেবল আটটি মানুষের উপস্থিতি।

সামান্য কয়েক ফোটা বৃষ্টি পড়তেই বাতাসে একটা আলগা ঠাণ্ডার আমেজ তখন। মিত্রানী মৃত।

ন'জন এসেছিল—তাদের মধ্যে একজন থেকেও নেই—পড়ে আছে ওদের সকলের চোখের সামনেই তার প্রাণহীন দেহটা মাত্র। মিত্রানী আর কোন দিনই কথা বলবে না—হাসবে না, সুলিলিত মধুর গলায় রবীন্দ্র বা অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে উঠবে না।

ভারী জমাট প্রাণাস্তকর স্তুতিটা যেন বিদ্যুতের কঠস্বরে হঠাত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো। সকলকেই যেন সে প্রশং করলো, এখন কি করি আমরা?

বিদ্যুতের প্রশং সকলেই নিঃশব্দে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তাই তো, কি এখন করবে ওরা—কি করতে পারে ওরা?

সুহাস জবাবটা যেন দিল, মিত্রানীকে তো এইভাবে এখানে ফেলে যেতে পারি না—

বিদ্যুৎ বললে, তবে—কি করবো?

ওর মৃতদেহটা চল তোমার গাড়িতে করেই—

বিদ্যুৎ বললে—নিয়ে যাবো?

হ্যাঁ—

কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবো। বললে আবার বিদ্যুৎ।

ফিতীশ বললে, আচ্ছা বিদ্যুৎ, এমনও তো হতে পারে এখনো ও মরে যায়নি—বেঁচে আছে। আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, হয়ত বড়ের মধ্যে আচমকা পড়ে গিয়ে খুব বেশী আঘাত পেয়ে হঠাৎ অঙ্গোন হয়ে গিয়েছে।

তাহলে? কাজল বললে।

পাপিয়া বললে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয় না—

ফিতীশ বললে, হ্যাঁ সেই ভাল। চল, আমরা ওকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলি—

বিদ্যুৎ মাথার দিকে ধরলো, ফিতীশ আর অমিয় দুজন পায়ের দিকে। মিত্রানীর দেহটা তুলতে গিয়েই বিদ্যুৎ যেন হাতে কিসের স্পর্শ পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, এই, কারো টর্চ আছে—টর্চের আলোটা ফেল তো।

টর্চের আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ বললে, নামাও—

ওরা আবার একটু যেন খতমত খেয়েই বিদ্যুতের কথায় মিত্রানীর মৃতদেহটা মাটির উপরে নামাল।

দেখি সতীন্দ্র, টর্চটা—

বিদ্যুৎ সতীন্দ্রের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে মিত্রানীর গলার কাছে ফেলতেই সর্বপ্রথম ব্যাপারটা তার নজরে পড়লো, মিত্রানীর গলায় একটা সাদা সিঙ্কের ঝুমাল পেঁচিয়ে— গলার পিছন দিকে শক্ত গিঁট দিয়ে বাঁধা। অন্যান্য সকলেরও ইতিমধ্যে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

কি—কি ওটা মিত্রানীর গলায়! কাজল চেঁচিয়ে উঠল চাপা কষ্টে। তবে—তবে কি ওকে কেউ গলায় ঝুমালের ফাঁস দিয়ে শ্বাসকুন্দ করে—

অমিয় তখনো তাকিয়ে ছিল, মিত্রানীর গলার দিকে। সে-ই বললে, হ্যাঁ—ওকে ঝুমালের ফাঁস দিয়ে শ্বাসকুন্দ করেই মেরেছে—

চিংকার করে ওঠে কাজল, খুন!

অমিয় আবার বললে, হ্যাঁ—আমার তো তাই মনে হচ্ছে কাজল। সাম ওয়ান কিন্ড হার। শি হ্যাজ বীন ঝুটালি মাডার্ড।

সুহাস বললে, কিন্তু কে? কে হত্যা করলে মিত্রানীকে ঐভাবে—

ফিতীশ বললে, কে হত্যা করেছে—এখনো জানি না বটে, তবে ওকে যে হত্যা করা হয়েছে—তাতে কোন ভুল নেই—

মিত্রানীকে হত্যা করা হয়েছে!

কথাটা যেন প্রচণ্ড একটা শব্দ তুলে সকলের কর্ণপটাহের উপর আছড়ে পড়লো একই সঙ্গে।

তাহলে এখন কি করবো? ফিতীশের প্রশ্ন। তার গলার ষ্টরটা যেন কেঁপে গেল। মনে হলো সে যেন বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যায় অন্ধকার আরো ঘন—আরো গাঢ় হয়েছে।

অঙ্গাভাবিক একটা স্তুতা যেন চারিদিকে।

আবার নিষ্ঠুরতা ভঙ্গ করলো সুহাসই। বললে, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো চলবে না। একটা কিছু তো আমাদের করতেই হবে মণি।

দলের মধ্যে মণিময়ই সব চাইতে বেশী প্র্যাকটিক্যাল। ভেবেচিস্তে কাজ করে—এবং বরাবরই দলের সংকট-মূরূর্তে যা পরামর্শ দেবার সে-ই দেয়। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি—চুপচাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সুহাসের প্রশ্নে এতক্ষণে সে কথা বললো, আমার মনে হয় সুহাস এক্ষেত্রে আমাদের একটি মাত্রাই কর্তব্য—

মিনিমিনে গলায় জবাব দিল অমিয়, কি?

আমাদের মধ্যে যে হোক একজন এখুনি শিবপুর থানায় চলে গিয়ে ব্যাপারটা তাদের বলুক—

থানায়—থানায় কেন? সুহাস কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে অন্ধকারেই মণিময়ের মুখের দিকে তাকাল।

বুঝতে পারছো না সুহাস, মিত্রানীর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় যখন, তখন থানায় খবর একটা আমাদের দিতেই হবে। ধীরে ধীরে কথাগুলো বললে মণিময়।

কিন্তু থানায় খবর দিলে—

সুহাসকে থামিয়ে দিয়ে মণিময় বললে, তাছাড়া আমরা আর কি করতে পারি সুহাস? মৃতদেহটা এখান থেকে নিয়ে গেলে বা ফেলে রেখে গেলে এখানেই, আমরা সকলেই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বো—

বিপদ! বিপদে পড়বো কেন? সুহাস আবার বললো।

কি বলছো সুহাস! আমাদের সকলকে আজ এখানে সেই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কতজনায় হ্যাত হৈ চৈ করতে দেখেছে—তাদের মধ্যে কেউ যদি আমাদের কারোর পাড়ার লোক হয়, আমাদের কাউকে চিনে থাকে—ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে পুলিস যখন খোঁজখবর শুরু করবে—সেই সময় যদি—

মণিময়কে থামিয়ে দিয়ে সতীন্দ্র এতক্ষণে কথা বললো, যু আর রাইট মণিময়, সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ডেথ্ সার্টিফিকেট-এর হাঙ্গামা, তাছাড়া শুধু ডেথ্ সার্টিফিকেট হলৈই হবে না—মিত্রানীর বাবা আছেন—ডাক্তার দাদা আছেন, তাঁদেরই বা কি বলবো? আর তাঁদের অজ্ঞাতে ডেড বডি সংকারাই বা করবো কি করে—আর যদি এখানে ফেলে যাই, একটু আগে মণিময় যা বললো—আরো জটিলতার সৃষ্টি হবে। তার টাইতে আমিই না হয় যাচ্ছি থানায়—সেখানে থেকে ডেকে নিয়ে আসি সব কথা বলে—তোমরা ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করো।

কথাগুলো বলে সতীন্দ্র অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওরা সাতজন অন্ধকারে ভূতের মত যেন দাঁড়িয়ে রইলো।

কেউ কারো মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। আবছা—ঝাপসা অথচ অন্ধকার

থাকার কথা নয়—চাঁদনী রাত—কিন্তু একটা হালকা মেঘের তলায় চাঁদ ঢাকা পড়ায় চাঁদের আলো প্রকাশ পায়নি।

ফিতীশ, বিদ্যুৎ, অমিয়, সুহাস, মণিময়, কাজল, পাপিয়া অল্প অল্প ব্যবধানে সব দাঁড়িয়ে।

অমিয় ওদের মধ্যে চেইন স্লোকার। এতক্ষণ সে একটি সিগারেট ধরায়নি। ফিতীশ ঘন ঘন নস্য নেয়—সেও যেন নস্য নিতে ভুলে গিয়েছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়লো। অন্ধকার সরে গিয়ে সব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সকলেই সকলকে এখন দেখতে পাচ্ছে। সকলেই দেখতে পাচ্ছে তাদের সামনে পড়ে আছে মিত্রানীর প্রাণহীন দেহটা।

ঘড়ির কাঁটা যেন আর ঘুরছেই না। থেমে গিয়েছে—সময় যেন হঠাত থমকে থেমে গিয়েছে। নিস্তুকতা যেন আরো কষ্টকর—আরো দুঃসহ।

অত বড় গার্ডেনটা একেবারে জনপ্রাণীহীন—একটা স্টীমারের ভোঁ শোনা গেল। শব্দটা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল।

আরো—আরো অনেক পরে—দূর থেকে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল—এ দিকেই আসছে আলোটা। দুটো প্রোজেক্টর অনুসন্ধানী চোখের মত একেবারে এগিয়ে আসে আর সেই সঙ্গে শোনা যায় দূরাগত একটা গাড়ির ইন্জিনের শব্দ। শব্দটা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়।

একটা জীপ গাড়ি এসে থামল ওদের সামনে।

প্রথমে থানা-অফিসার সুশীল নন্দী—দুজন কনস্টেবল—আর নামলো সতীন্দ্র।

কোথায় ডেডবডি? সুশীল নন্দী জিজ্ঞাসা করলেন।

ঐ যে, সতীন্দ্র দেখিয়ে দিল।

হাতে নন্দীর জোরালো টর্চ ছিল, সেই আলো ফেলে নন্দী মিত্রানীর মৃতদেহের সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করলেন মৃতদেহটা—গলার ফাঁসটা দেখলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। সকলের মুখের দিকে তাকালেন।

সুশীল নন্দী আগেই থানায় বসে সতীন্দ্র কাছ থেকে ব্যাপারটা শুনেছিলেন—তাই বোধ হয় ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আর গেলেন না। সোজাসুজিই একেবারে প্রশ্ন শুরু করলেন—আপনারা তা হলে কেউই কিছু জানেন না বা দেখেনও নি—কে ওর গলায় ফাঁস দিয়ে ওকে খুন করলো?

সবাই চুপ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

ঝঁ। আচ্ছা ভদ্রমহিলার কোন শক্র বা ঐ ধরনের কিছু ছিল?

শক্র! প্রশ্ন করলো সতীন্দ্র।

হ্যাঁ—শক্র, বললেন নন্দী, যে হয়ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—আজ সুযোগ পেয়ে—থাক সে কথা, আচ্ছা একটা কথা বলুন তো—আজ সারাটা দিন আপনাদের আশেপাশে কাউকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছেন—

মণিময় বললে, না—তাছাড়া আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। কোন দিকে তাকাবার আমরা ফুরসৎ পাইনি—

কোয়াইট ন্যাচারাল—তবু—

না—অফিসার, মণিময় আবার বললে—সে-রকম কিছুই আমাদের কারো চোখে
পড়েনি—

আপনারা কাউকে সন্দেহ করেন এ ব্যাপারে? আবার নন্দীর প্রশ্ন।

না—এবার সুহাস মণিময় একত্রেই জবাব দিল।

আপনাদের সঙ্গে তো গাড়ি আছে?

হাঁ, বিদ্যুতের গাড়ি আছে, মণিময় বললে।

বিদ্যুৎবাবু কে?

বিদ্যুৎ এগিয়ে এলো। বললে—আমিই বিদ্যুৎ সরকার।

আপনিই একা তাহলে গাড়িতে এসেছিলেন আজ? আর বাকী সব—

মণিময় জবাব দিল—ট্রামে বাসে।

বিদ্যুৎবাবু—

বলুন—

আপনাদের সকলকে একবার থানায় যেতে হবে—সুশীল নন্দী বললেন।

থানায় কেন? সুহাস বলল।

আপনাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে এক-একটা জবানবন্দি—আই মীন
স্টেটমেন্ট চাই—

মণিময় বললে, বেশ, যাবো আমরা—

এক কাজ করুন, বিদ্যুৎবাবুর গাড়িতে যাঁরা পারেন যান, বাদ বাকি সব জীপে উঠুন।

॥ ছয় ॥

সে রাত্রে ছাড়া পেতে পেতে প্রায় রাত সোয়া এগারোটা বেজে গিয়েছিল সকলের।
শ্রান্ত—অবসন্ন হয়ে ফিরেছিল যে যার গৃহে। ফিরতে ওরা সকলে পারত না হয়ত, যদি
থানার একজন সেপাই কলকাতার দিকে ফিরতি একটা খালি ট্যাঙ্কি থামিয়ে ওদের ফিরে
যাবার ব্যবস্থা করে না দিত।

থানা-অফিসার সুশীল নন্দী একটা কথা বিশেষ করে ওদের বলে দিয়েছিলেন,
কলকাতা থেকে কেউ যেন অন্যত্র কোথাও না যায়—তাঁকে না জানিয়ে।

মিত্রানীর প্রৌঢ় বাপ অবিনাশ ঘোষালকে তাঁর কন্যার মৃত্যু-সংবাদটা ওরা কেউই
দিতে সম্মত হয়নি—তাই অগত্যা সুশীল নন্দী হিরে করেছিলেন পরের দিন সকালে
তিনিই অবিনাশ ঘোষালকে সংবাদটা দেবেন। কিন্তু তা আর তাঁকে দিতে হয়নি—তার
আগেই অর্থাৎ সেই রাত্রেই—

রাত একটা নাগাদ বিদ্যুতের কাছ থেকেই সংবাদটা পেয়েছিল মিত্রানীর দাদা
ডাঃ প্রণবেশ ঘোষাল।

কি একটা সরকারী কাজে প্রণবেশ কলকাতায় একদিনের জন্য এসেছিল।

রাত্রি নয়টা নাগাদও যখন মিত্রানী ফিরে এলো না—অবিনাশ ঘোষাল ব্যস্ত হয়ে
পড়েছিলেন, ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন, প্রণব, খুকী তো এখনো ফিরল না—বলেছিল

সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে—

প্রণবেশ বলেছিল, বদ্ধুবান্ধবরা মিলে বটানিকসে হৈ চৈ করতে গিয়েছে—একা তো নয়—ভাবছেন কেন?

রাত নটা বাজে, তুমি বরং এক কাজ করো—বিদ্যুতের বাড়িতে একটা ফোন কর—

প্রণবেশ ফোন করে ভানলো, তখনও বিদ্যুৎ ফেরেনি—

তারপর রাত সাড়ে নয়টা, পৌনে দশটা—পৌনে এগারোটা—পনেরো মিনিট অস্তর-অস্তর ফোন করে গিয়েছে প্রণবেশ।

কিন্তু ঐ একই জবাব—বিদ্যুৎ এখনো ফেরেনি—

শেষটায় কিন্তু প্রণবেশ নিজেও বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। এত রাত হয়ে গেল, এখনো না ফেরার কারণটা কি? পথে কোন দুর্ঘটনা কিছু ঘটেনি তো? ঘটাটা এমন কিছু আশ্চর্যও নয়। সে একবার ঘর একবার বাইরে করতে থাকে।

সাড়ে এগারোটা—বারোটা—সাড়ে বারোটা—না তখনো ফেরেনি বিদ্যুৎ। অবশ্যে প্রণবেশই লালবাজারে ফোন করে—তারা কোন সংবাদ জানে না—তারা বলে শিবপুর থানায় ফোন করতে।

রাত তখন একটা প্রায়।

হঠাৎ ঐসময় ফোন ক্রিঃ ক্রিঃ করে বেজে উঠলো।

হালো—ডাঃ প্রণবেশ ঘোষাল—

প্রণবেশবাবু—আপনি তো মিত্রানীর দাদা?

হ্যাঁ—

শুনুন—একটা স্যাড নিউজ আছে।

স্যাড নিউজ—কি?

মিত্রানী ইজ ডেড।

কি—কি বললেন—চিকার করে ওঠে প্রণবেশ—প্রোড অবিনাশ ঘোষাল ঐ সময় পুত্রের পাশেই দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ—মিত্রানীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে—

না, না—এ আপনি কি বলছেন—মিতু—মিতু। কিন্তু কে—কে আপনি! কি আপনার নাম?

বিদ্যুৎ সরকার—

তারপরই অপর প্রাপ্তে একটা ঠঁ করে শব্দ ও ফোনটা ডিসকানেকটেড হয়ে গেল।

হালো—হালো—অধীরভাবে ট্যাপ করে প্রণবেশ—কিন্তু না, অন্য প্রাপ্ত ফোন ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

কি! কি হয়েছে প্রণব! অবিনাশ ঘোষাল আশঙ্কায় যেন একেবারে ভেঙে পড়ল।

বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ সরকার কে বাবা? প্রণবেশ বলে উঠল।

মিতুর ক্লাস-ফ্রেণ্ড—

প্রণবেশ তখুনি আবার ফোন করল! কিছুক্ষণ রিং হবার পর অপর প্রাপ্ত থেকে সাড়া এলো—কে!

বিদ্যুৎ সরকার আছেন ?

কথা বলছি—

আমি মিত্রানীর দাদা কথা বলছি—একটু আগে আপনি ফোন করেছিলেন—
ফোন করেছিলাম, আমি !—বিশ্বায় বিদ্যুতের কঠে।

হ্যাঁ—একটু আগে আপনিই তো আমাদের বাড়িতে ফোন করে বললেন—
আমি তো এইমাত্র—নট ইভ্র টু মিনিটস—ফিরছি—

আপনি আমাকে ফোন করেননি ?

না—

মিত্রানী—মিত্রানীর মানে আমার বোন মিত্রানীর কোন খবর কিছু জানেন ? আপনারা
তো একসঙ্গে আজ সকালে বটানিকসে গিয়েছিলেন ?

বিদ্যুৎ অপর প্রাচুর থেকে কোন সাড়া এলো না।

বিদ্যুৎবাবু—শুনছে—বিদ্যুৎবাবু—হ্যালো—হ্যালো—

কোনো সাড়া নেই—অথচ প্রণবেশ বুঝতে পারছে অপর প্রাস্ত তখনো ফোন ছেড়ে
দেয়নি !

কি হলো প্রণবেশ ? অবিনাশ ঘোষাল আবার প্রশ্ন করেন আধীর্ঘ্য কঠে।

প্রণবেশ ফোনটা নামিয়ে আবার ডায়েল করে—রিং হয়ে যাচ্ছে—কেউ ধরছে না।

প্রণবেশ শেষ পর্যন্ত ফোনটা নামিয়ে রাখলু।

একটু আগে কে ফোন করেছিল প্রণব ?

বিদ্যুৎ সরকার—অথচ বিদ্যুৎ সরকার এইমাত্র বললে সে ফোন করেনি—এই নাকি
ফিরছে—

মিত্রুর খবর—

সে কিছু বলল না—অথচ—আমি আসছি বাবা—প্রণবেশ কোনমতে শার্টটা গায়ে
চাপিয়ে যেন ঝড়ের মত বের হয়ে গেল।

হ্যাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন অবিনাশ ঘোষাল।

কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার অনেকটা পথ—প্রণবেশ রাস্তায় বের হয়ে দেখলো—
জনহীন রাস্তা খাঁ খাঁ করছে—কোনরকম যানবাহনের চিহ্নমাত্রও নেই—যতদূর দৃষ্টি চলে
রাস্তার এ-প্রাস্ত থেকে অন্য প্রাস্ত পর্যন্ত। এত রাত্রে যে ট্যাঙ্কি পাওয়া যাবে না তা জানত
প্রণবেশ। একটু এগিয়ে গেলেই হালদার-পাড়ায় একটা ট্যাঙ্কির আড়তা আছে—অনেক
বছর পাঞ্জাবীদের ঐ পাড়ায় বসবাস করার জন্য প্রণবেশের সেটা জানা ছিল, আর বুড়ো
ট্যাঙ্কি ড্রাইভার কর্তার সিংকে চিনতো প্রণবেশ—প্রণবেশ হাঁটতে লাগলো।

প্রণবেশের ভাগ্য ভাল, কর্তার সিং দূরপাল্লার এক সওয়ারীকে মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে
পৌঁছে দিয়ে আস্তানায় ফিরে খাটিয়া পেতে শয়নের উদ্যোগ করছিল।

প্রণবেশ এসে সামনে দাঁড়াল। সর্দারজী !

প্রণববাবু—ইতিনি রাত মে কেয়া বাং হ্যায়—

বড় বিপদে পড়েছি সর্দারজী, একবার এখনুন শ্যামবাজার যেতে হবে—অথচ কোন
ট্যাঙ্কি এত রাত্রে পাঞ্চি না—

ঠিক হ্যায়, চলিয়ে—

শ্যামবাজারে অ্যাডভোকেট সমর সরকারের বাড়িটা খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ
পেতে হয়নি প্রণবেশের। বিদ্যুৎ তখনো জেগেই ছিল।

ফোনে প্রণবেশের প্রশ্নের জবাবে সে কোন কথা বলতে পারেনি। কেমন করে দেবে
সে অত বড় দুঃসংবাদটা—

গলা যেন কেউ তার চেপে ধরেছিল। দোতলায় নিজের ঘরের মধ্যে একটা ইঞ্জি-
চেয়ারের উপরে বিদ্যুৎ জেগে বসে ছিল। গাড়ির শব্দে জানলায় উঁকি দিয়ে দেখতে পেল
তাদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটা থেমেছে—

কে একজন তাদের সদরে দাঁড়িয়ে।

দুর্ঘটনার সংবাদটা ছেট্ট করে সংবাদপত্রে তৃতীয় পৃষ্ঠায় নীচের দিকে প্রকাশিত
হয়েছিল ঘটনার পরের পরের দিন।

বটানিক্যাল গার্ডেনে গত পরশু পিকনিক করতে গিয়ে দলের মধ্যে একটি তরণীর
রহস্যজনক মৃত্যু। মৃত্যু ঘটেছে রূমালের ফাঁসে। উক্ত তরণীর নাম মিত্রানী ঘোষাল। পরে
ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কিরীটী সকালবেলা তৃতীয় কাপ চায়ের সঙ্গে ঐ দিনকার সংবাদপত্রের পাতা
ওলটাচ্ছিল—অন্যমনক্ষভাবে—তরণীর বাড়ি যে কলীঘাট অঞ্চলেই কিরীটী বুঝতে
পারেনি এবং শুধু তাই নয়—তারই পরিচিত মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে ঐ মিত্রানী তাও
বুঝতে পারেনি। পারবার কথাও নয়—সংবাদটার মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না,
যেটা তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। যেমন প্রত্যই সংবাদটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে
তেমনি পড়তে থাকে কিরীটী।

ঘটাখানেক বাদে কৃষণ এসে ঘরে ঢুকলো,—শুনছো, তোমার মাস্টারমশাই—

কার কথা বলছো? কিরীটী স্তুর মুখের দিকে তাকাল।

কলীঘাটে তোমার সেই পুরনো মাস্টারমশাই থাকেন না!

অবিনাশবাবু—

হ্যাঁ—তাঁর মেয়ে নাকি গত পরশু বন্ধুবন্ধবদের সঙ্গে বটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক
করতে গিয়েছিল—

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী সজাগ হয়ে বসে, কি হয়েছে তার?

গলায় রূমালের ফাঁস দিয়ে কে যেন তাকে হত্যা করেছে—

তুমি—তুমি কার কাছে শুনলে?

এই তো একটু আগে আমাদের পাশের বাড়ির ঘশোদাবাবু বলছিলেন—ঘশোদাবাবু
আর অবিনাশবাবু তো শালা-ভগীপতি।

কিরীটী তাড়াতাড়ি আবার সংবাদপত্রের পাতা উল্টে সংবাদটা খুঁজে বের করে—বার
দুই ভাল করে সংবাদটা পড়লো, তারপর উঠে দাঁড়াল।

একটু বেরঞ্জি কৃষণ—

এই সকালে আবার কোথায় বেঝবে! সকালে তো হেঁটে এসেছো—

একবার মাস্টারমশাইয়ের ওখানে যাবো।

অবিনাশবাবুর ওখানে?

হ্যাঁ—বাপারটা আমাকে একটু জানতে হচ্ছে—

অবিনাশ ঘোষালের সঙ্গে কিরীটীর পরিচয় সেই যখন সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে—
ফার্ম ক্লাসের ছাত্র—অবিনাশবাবু সেই সময়েই ক্লুলে সেকেন্ড টাচার হয়ে আসেন—অক্ষ করাতেন ক্লাসে—পরে, বৎসর চারেক পরে, ঐ ক্লুলেরই প্রধান শিক্ষক হন।

সবে তখন এম. এস-সি. পাস করে অবিনাশ ঘোষাল ক্লুলের শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে
এসেছিলেন—

কতই বা বয়স তখন তাঁর, বছর আটাখ-উনত্রিশ হবে।

মাত্র মাস আটকে পড়েছিল কিরীটী অবিনাশবাবুর কাছে—গণিতশাস্ত্রের প্রতি তিনিই
কিরীটীর মনের মধ্যে একটা আকর্ষণ ও প্রীতি জাগিয়ে তোলেন।

যার ফলে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিল কিরীটী পরবর্তীকালে রসায়ন-শাস্ত্রে শেষ ডিগ্রী
নিয়ে এবং যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক সেদিন শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সেটা
সেদিন পর্যন্তও অস্ফুল ছিল। সময় পেনেই কিরীটী যেতো অবিনাশবাবুর ওখানে। সহজ
সরল আভাভোলা মানুষটিকে ওর বড় ভাল লাগে।

অবিনাশবাবু খুব খুশি হতেন কিরীটীকে দেখালে।

এসো—এসো, কিরীটী রায় যে—

পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করে কিরীটী বলেছে, ভাল আছেন তো মাস্টারমশাই?

হ্যাঁ—বাবা, ভালই তো আছি। তার পরই বলতেন, তোমার নতুন রহস্য উদ্ঘাটনের
কাহিনী কিছু শোনাও।

কিরীটী হাসতে হাসতে বলতো, আমার চাইতে সুব্রতই ভাল বলতে পারে
মাস্টারমশাই—একদিন তাকে নিয়ে আসবো, শুনবেন।

মধ্যে মধ্যে সুব্রতও কিরীটীর সঙ্গে আসতো—সে তখন বেশ জমিয়ে বলে
কিরীটীকাহিনী শোনাত।

কি শ্রদ্ধা—কি আগ্রহ নিয়েই যে শুনতেন অবিনাশ ঘোষাল সেসব কাহিনী—শোনা
নয় যেন গিলতেন।

একদিন বলেছিলেন সুব্রতকে অবিনাশ ঘোষাল—বুবলে সুব্রত, প্রবলেম সল্ভ
করবার অস্তু এক ন্যাক ছিল কিরীটীর—কঠিন কঠিন প্রবলেম ও অনায়াসেই সল্ভ
করে দিত—রহস্য উদ্ঘাটনের বাপারেও তার সেই প্রতিভার শুরুণ—

কিরীটীর প্রশংসায় যেন একেবারে শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন।

মিত্রানাকে কিরীটী কয়েকবার দেখেছে, বেশ দ্বির বুদ্ধিমতী মেয়েটি, মনে হয়েছে।

কিরীটী যখন অবিনাশ ঘোষালের ওখানে পেঁচাল বেলা তখন প্রায় সাড়ে আটটা
হবে। ইতিমধ্যে রৌদ্রের তাপ বেড়েছে—আর একটা রৌদ্রতাপ-দক্ষ দিন।

প্রথমেই প্রগবেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আকস্মিক বিপর্যয়ে প্রগবেশ আর কর্মসূলে
ফিরে যায়নি—কটা দিন ছুটি নিয়েছে।

কিরীটীর সঙ্গে প্রণবেশেরও পরিচয় ছিল।

এই যে কিরীটীবাবু, আপনার কথাই ভাবছিলাম, প্রণবেশ বললৈ।

মাস্টারমশাই কোথায় প্রণবেশবাবু? কিরীটী শুধাল।

বাবা উপরের ঘরে—আমাদের বাড়িতে মত পরঙ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে
কিরীটীবাবু—আমার বোন মিতু—•

আমি জানি—

জানেন! কার কাছে শুনলেন—

সংবাদটা আজকের সংবাদপত্রেও ছাপা হয়েছে, তাছাড়া আমার স্ত্রীকে আপনার মামা
যশোদাবাবু—

কি করে যে হলো এখনো যেন কিছুই মাথায় আসছে না। কিরীটীবাবু, মিতুর মত
মেরোকে—কথাটা আর শেষ করতে পারে না প্রণবেশ—তার গলার স্বর যেন বুজে আসে
—চোখের কোণ দুটো জলে ভরে ওঠে।

সমস্ত ব্যাপারটা আপনি বোধ হয় জানেন?

হ্যাঁ—মোটামুটি শুনেছি ওর বন্ধু বিদ্যুৎ সরকারের মুখে আর বাকিটা শিবপুর থানার
ও. সি. সুশীল নন্দীর মুখ থেকে গতকাল দিপ্রহরে। বাবার সঙ্গে দেখা করবেন।

হ্যাঁ—

কেমন যেন হঠাৎ স্তুক হয়ে গিয়েছেন বাবা। বড় ভালবাসতেন মিতুকে—

চলুন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

দুজনে দেতলায় এলো।

বাড়িতে সর্বক্ষণ লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকেন অবিনাশ ঘোষাল—একটা চৌকির
উপরে মাদুর বিছানো—একটা বালিশ শিয়ারের দিকে—গীতুকালে ঐ মাদুর আর
বালিশটিই তাঁর শয্যা—আর শীতকালে একটি চাদর।

চারিদিকে ছোট বড় আলমারীতে একেবারে ঠাসা—গণিতশাস্ত্রের বইতে—চৌকির
অর্ধেকটায়ও খাতাপত্র বই সব ছড়ানো—

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন অবিনাশ ঘোষাল। পরনে একখানি মোটা খদরের
ধূতি—বক্ষে মোটা উপবীত।

মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল অবিন্যস্ত। একমুখ কাঁচাপাকা দাঢ়িও।

চোখে মোটা কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে পুরু লেসের চশমা। পায়চারি করতে করতে করতে
মধ্যে মধ্যে অবিনাশ ঘোষাল বাঁ হাতে আঙুলগুলো দিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলো যেন টানছেন।

ওরা যে দুজন ঘরে ঢুকেছে সেটা টেরও পান না অবিনাশ ঘোষাল। একমাত্র আদরণী
কন্যার আকস্মিক মৃত্যু যেন প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে মানুষটার ওপরে।

মাস্টারমশাই।

পায়চারি থামিয়ে ফিরে তাকালেন অবিনাশ ঘোষাল। কে?

মাস্টারমশাই আমি কিরীটী।

ওঁ কিরীটী—ও, তুমি এসেছো। জানো, জানো কিরীটী, আমার মিতু মা—

সব শুনেছি মাস্টারমশাই—

কিন্তু কেন এমন হলো বল তো ! আমার মিতু মাকে কে এমন করে খুন করলো ! তুমি তো জানো, তুমি তো দেখেছো আমার মিতু মাকে—এত নিরীহ, এত সরল, এত পবিত্র—আচ্ছা কিরীটী, তুমি তো অনেক কঠিন রহস্য উদ্ঘাটন করেছো—তুমি—তুমি পারবে না কিরীটী তাকে খুঁজে বের করতে, যে আমার মিতু মাকে—

পারবো মাস্টারমশাই—

পারবে !

হ্যাঁ—আপনার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই পারবো ।

জানি, জানি, তুমি পারবে—কেউ যদি তাকে খুঁজে বের করতে পারে সে একমাত্র তুমই পারবে—আমি, তাকে শুধু একটা প্রশ্ন করবো—কেন, কি জন্য সে আমার মিতু মাকে এমন করে খুন করলো । একবারও কি হাত দুটো তার কাঁপলো না ! অমন করে শ্বাসরোধ করে—না জানি মা আমার কত কষ্ট পেয়েছে । উঃ, কি নৃশংস ! আমার কি মনে হয় জানো কিরীটী—

বলুন—

সেদিন যারা গার্ডেনে পিকনিকে উপস্থিত ছিল সেই বন্ধুদের মধ্যেই কেউ একজন—

বাধা দিল প্রণবেশ । বললে, না, না—এ আপনি কি বলছেন বাবা, ওদের পরম্পরের মধ্যে কত দিনের বন্ধুত্ব—সেই কলেজ লাইফ থেকে । তা ছাড়া ওদের পরম্পরের প্রতি ভালবাসা—

প্রণবেশবাবু—কিরীটী বলে, মাস্টারমশাইয়ের কথাটা হয়তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । একজনকে দেখে বা কিছু সময়ের জন্য মিশে তার ভিতরের কতটুকুই বা আমরা জানতে পারি, তার সত্যিকারের বা আসল চেহারার কতটুকুই বা আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয় । তাছাড়া একটা কথা ভুলে যাবেন না, ওদের সকলেরই বয়স অল্প—এই বয়সে সাধারণত মানুষ যতটা সেন্টিমেন্টাল—স্পর্শকৃত ও ভাবপ্রবণ হয়—বয়েসটা একটু বেশী হলে ততটা হ্যাত হয় না । ইমোশান বা ঝোকের মাধ্যম কোন বিশেষ এক মুহূর্তে এমন অনেক কিছুই হ্যাত তারা করে বা করতে পারে যেটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ থিতিয়ে আসে ।

কিরীটী—

বলুন মাস্টারমশাই । আবিনাশ ঘোষালের ডাকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটী সাড়া দিল ।

দোষ হ্যাত আমারও আছে, সন্তানের প্রতি বাপের কর্তব্য পালনের জটি আমারও আছে । মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে বোধ হয় এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটতো না—

মাস্টারমশাই, একটা কথা বলবো ।

বলো ।

মিত্রানী কাউকে ভালবাসতো কিনা আপনি জানেন ?

তুমি তো জানো কিরীটী, আমার সন্তানদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কখনো আমি বাধা দিইনি—আমার কাছে সেটা অপরাধ বলেই বরাবর মনে হয়েছে—তাছাড়া আমাদের বাপ ও মেয়ের মধ্যে সব কথাই খোলাখুলি হতো—সে রকম কিছু থাকলে বোধ হয় আমি জানতাম ।

আর একটা কথা মাস্টারমশাই, কখনো তার বিয়ের চেষ্টা করেছেন বা সে সম্পর্কে তার সঙ্গে কোন আলোচনা করেছেন?

করেছি বৈকি। কিছুদিন আগেও বিয়ের কথাটা তার কাছে তুলেছিলাম, সে তখন বলেছিল—

কি বলেছিল মিত্রানী?

সময় হলেই সে আমাকে জানাবে।

কি জানাবে?

তা তো কিছু বলেনি, টুকুই কেবল বলেছিল আর আমিও কিছু বলিনি।

কিরিটী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মৃদু কঢ়ে বললে, আচ্ছা তার পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে কারোর প্রতি—

যতদূর জানি—বন্ধুদের মধ্যে সে সুহাস ছেলেটিকে একটু বেশী বোধ হয় পছন্দ করতো।

সুহাস!

ঐ যে সুহাস মিত্র। ওর কলেজের সহপাঠী। ছেলেটি শুনেছি—লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল বরাবরই—বি.এ.-তে ইকনমিকসে অনার্স পেয়েও আর নাকি পড়েনি, একটা বড় ফার্মে চাকরি করছে। মধ্যে মধ্যে আসতোও এখানে—বেশ স্মার্ট ও ভদ্র ছেলেটি, মনে হতো মিতু যেন সুহাসকে একটু বেশী পছন্দ করতো।

আর কে আসতো এখানে?

বিদ্যুৎ আসতো।

আর কেউ?

সতীন্দ্র আর সজলও কয়েকবার এসেছে। তবে ইদানীং আর সজলকে এখানে গত দু'বৎসর হতে আসতে দেখিনি—তবে দিন চারেক আগে হঠাৎ এসেছিল!

অবিনাশ ঘোষালের দু'চোখের কোণ বেয়ে দুফেঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

মাস্টারমশাই, যা হয়ে গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না। আপনি যদি এভাবে ভেঙে পড়েন—

না, না—আমার জন্য ভেবো না কিরিটী, আমি ঠিক আছি—ঠিক আছি, বলতে বলতে অবিনাশ ঘোষাল চোখের জল মুছে নিলেন।

অতঃপর কিরিটী সেদিনকার মত প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল।

নীচে এসে প্রণবেশের সঙ্গে তারপর অনেকক্ষণ কথা বলেছিল এবং প্রণবেশ বিদ্যুতের মুখে ও থানায় সুশীল নন্দীর কাছে যা শুনেছিল সব বললে।

প্রণবেশই একসময় অতঃপর প্রশ্ন করে, আচ্ছা কিরিটীবাবু, আপনারও কি সত্য মনে হয় যে—

কি?

ঐ মানে মিতুর বন্ধুদের মধ্যে কেউ একজন—

নিশ্চিত হয়ে এই মুহূর্তে তা বলতে পারি না, তবে এটা ঠিক, সমস্ত ঘটনা শোনার পর যা মনে হয়—

কি! কি মনে হয় আপনার?

কিরীটী নিজেকে যেন হঠাৎ সামলে নিল। বললে, কি জানেন প্রণবেশবাবু—ইট ইজ টু আরলি টু সে এনিথিং। আছা আমি এখন চলি—মাস্টারমশাইয়ের দিকে একটু নজর রাখবেন—মিত্রানীর মৃত্যুতে একটু বেশী রকমই আঘাত পেয়েছেন বলে যেন মনে হলো—

ভাবছি কিছুদিনের জন্য বাবাকে আমি সঙ্গেই নিয়ে যাবো।

॥ সাত ॥

ঐদিনই দ্বিপ্রহরে লালবাজারে গিয়ে কিরীটী পুলিস কমিশনার মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলো। লম্বা-চওড়া সুগঠিত চেহারা। অফিসেই ছিলেন রায়চৌধুরী, কিরীটী স্লিপ পাঠাতেই ঘরের মধ্যে ডাকলেন।

দুজনার মধ্যে পরিচয় ছিল। রায়চৌধুরী কিরীটীকে শ্রদ্ধা করতেন।

আসুন—আসুন, বসুন রায়সাহেব—হঠাৎ এখানে কি মনে করে!

কিরীটী বসে মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারটা বললেন।

সব শুনে মিঃ রায়চৌধুরী বললেন, ব্যাপারটা আমারও কানে এসেছে—আজই সকালে—

কি রকম!

হোমিসাইডাল স্কোয়াডের জ্যোতিভূষণ আমাকে বলেছিলেন—তাঁর হাতে ইনভেস্টিগেশনের ভার পড়েছে। আপনি মনে হচ্ছে বেশ একটু ইন্টারেস্টেড ব্যাপারটায়, রায়সাহেব!

একটু আগেই তো বললাম মিঃ রায়চৌধুরী, মিত্রানী, মানে যে মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে—

ঠিক আছে, আমি বরং জ্যোতিবাবুকে ডাকছি—তাঁর কাছেই আপনি সব ডিটেল্সে পাবেন।

জ্যোতিভূষণ চাকী—বেশ একজন কর্ম্ম—উৎসাহী অফিসার। বয়েস খুব বেশী নয়, ত্রিশ থেকে বত্তিশের মধ্যে—বনিষ্ঠ দোহারা চেহারা। জ্যোতিভূষণের সরেজমিন তদন্তের রিপোর্ট থেকেই সেদিনকার দুর্ঘটনার অনেক কিছুই জানতে পারল কিরীটী। ব্যাপারটা ঘটেছে ঐদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে কোন এক সময়ে।

মিনিট পনেরো-কুড়ির জন্য একটা প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝাড় ও ধূলোর ঘূর্ণি উঠেছিল। সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সেই ঝাড় ও ধূলোর ঘূর্ণির মধ্যে বক্স ও বাঙ্কবীরা সব চারদিকে অতর্কিতে ছিটকে পড়েছিল। দিনটি ছিল শনিবার।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব থেমে যাওয়ার পর প্রত্যেকে প্রত্যেককে খুঁজতে শুরু করে, একে অন্যের দেখা পায় কিন্তু দুজনের দেখা পাওয়া যায় না। মিত্রানী ঘোষাল আর সুহাস মিত্র। পরের ব্যাপারটা প্রণবেশের মুখেই শুনেছিল কিরীটী। প্রণবেশ যেমনটি বলেছিল, জ্যোতিভূষণের রিপোর্টেও তাই বলে। তারপর শিবপুর থানা অফিসার সুশীল নন্দীর রিপোর্ট।

পরের দিন সকালে হোমিসাইড্যাল স্কোয়াডের সঙ্গে সুশীল নন্দী স্পটে যান। স্পটে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে ওঁরা কয়েকটি জিনিস পান।

ঠিক যেখানে মৃতদেহটা আবিকৃত হয়েছিল, তার হাত পাঁচেক দূরে একটা খোপের ধারে একটা বেতের টুপি—কয়েকটা পোড়া চারমিনার সিগারেটের শেষাংশ—এবং মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল গতরাত্রে, তার আশেপাশে কিছু রাঙ্গ কাচের চুড়ির টুকরো—আরো কিছু দূরে একটা বায়নাকুলার সুশীল নন্দী পেয়েছেন।

সত্ত্ব কথা বলতে কি, কিরীটীর আগমনে সুশীল নন্দী যেন মনের মধ্যে একটা উভেজনাই বোধ করেন। তাই তিনি বিশেষ উৎসাহ নিয়েই কিরীটীকে তাঁর অনুসন্ধানের কাহিনী আদ্যোপাস্ত বর্ণনা করে একে একে ঐ উপরিউক্ত জিনিসগুলো দেখালেন।

বললেন—মিঃ রায়, এই জিনিসগুলো আমি অকুছানে পরের দিন সকালে অনুসন্ধানে গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছি—

কিরীটী বললে—ভালই করেছেন মিঃ নন্দী, এগুলো হয়তো মিত্রানীর হত্যারহস্য উদ্ঘাটনে যথেষ্ট সাহায্য করবে। ভাল কথা, ওদের আলাদা ভাবে জবানবন্দি, মানে ওদের কোন স্টেটমেন্ট নেননি?

নিয়েছি বৈকি। তবে সবাই প্রায় এক কথাই বলেছে—এবং বিশেষ কোন তৎপর্য আমি কারোর স্টেটমেন্টেই খুঁজে পাইনি। এই দেখুন না, পর পর প্রত্যেকের স্টেটমেন্টই আমি লিখে রেখেছি ও পরে ওদের দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছি—বলতে বলতে লম্বা খাতাটা এগিয়ে দিলেন সুশীল নন্দী কিরীটীর দিকে।

কিরীটী স্টেটমেন্টগুলো পড়তে শুরু করল।

(১) প্রথমেই বিদ্যুৎ সরকার! বাপ আডভোকেট সমর সরকার—বনেদী ধনী পরিবারের ছেলে। বি. এ. পাস করবার পর বাপের এক বন্ধু নামী চির-পরিচালকের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গত কয়েক বছর কাজ করছে। সুগঠিত ও দ্বাষ্টাবান—মিত্রানীর সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের—একই কলেজে তিনি বৎসর ওরা পড়েছে। মধ্যে মধ্যে মিত্রানীর ওখানে যেতো—মিত্রানীও আসত—পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে টেলিফোনেও কথাবার্তা হতো মধ্যে মধ্যে। ঝড় উঠবার পর কিছুক্ষণের জন্য দল থেকে ছিটকে পড়ে। তারপর অন্যান্য বন্ধুদের সাহায্যে যেভাবে মিত্রানীকে খুঁজে পায় তারই বর্ণনা। অবিবাহিত।

(২) সুহাস মিত্র—নিয়মিত ব্যায়াম করার ফলে সুগঠিত চেহারা, কলেজ জীবনে শুধুই যে সে একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবেই পরিচিত ছিল তাই নয়—ভাল অ্যাথলেটও ছিল। প্রাক্তন কলেজ ব্লু। বাড়ির অবস্থা তেমন ভাল নয়, তাছাড়া বাপ পঙ্গু—বিবাহযোগ্য দৃষ্টি বোন। তাই বি. এ. পাস করবার পরই একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছে। তারও স্টেটমেন্ট—অনেকটা বিদ্যুৎ সরকারের মতই—অকস্মাৎ ঝড় ওঠায় দল থেকে ছিটকে পড়ে ধূলোর অক্ষকারে কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছিল না—দু'পা কোনমতে এগোয় তো পাঁচ-পা পিছিয়ে আসে এলোমেলো ঝড়ে বাতাসে—তারপরই হঠাৎ একটা ভারী গাছের ডাল মাথার উপরে ভেঙে পড়ে। মাথায় আঘাত লেগে অচেতন্য হয়ে যায়, বন্ধুরা এসে তাকে গাছের ডাল সরিয়ে উদ্ধার করে। অন্যান্য বন্ধু ও মিত্রানীর সঙ্গে বিশেষ একটা দেখাসাক্ষাৎ হতো না—অবিবাহিত।

(৩) মণিময় দন্ত—বি. এ. পাস করে এম. এ. এক বছর পড়েছিল। এই সময় তার মামার সুপারিশে খিদিরপুর ডকে একটা ভাল চাকরি পেয়ে গত কয়েক বছর ধরে সেখানেই চাকরি করছে। রোগী পাতলা চেহারা—হঠাতে বড় ওঠায় দল থেকে ছিটকে পড়ে। তারপর বড় থামলে প্রথমেই সে বিদ্যুৎকে দেখতে পায়—তখন দুজনে ঝুঁজতে ঝুঁজতে অন্য সকলের দেখা পায়—সুহাস আর মিত্রানী বাদে—তারপর তার স্টেটমেন্ট বিদ্যুতেরই অনুরূপ। তারও অন্যান্য বন্ধুদের ও মিত্রানীর সঙ্গে বিশেষ একটা দেখাসাক্ষাত হতো না। বিবাহিত। একটা সস্তানের বাপ।

(৪) ক্ষিতীশ চাকী—বি. এ. পরীক্ষা দুবার দিয়ে পাস না করতে পেরে পড়া ছেড়ে দেয়—কোন বিশেষ রাজনৈতিক পার্টির সভ্য—সক্রিয় সভ্য। পার্টির কাজকর্ম নিয়েই সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে—বাকী স্টেটমেন্ট তার অন্যান্যদেরই অনুরূপ। বিবাহিত।

(৫) অমিয় রায়—বি. এ. পাস করবার পর ওকালতি পাস করে আলিপুর কোর্টে নাম লিখিয়ে প্র্যাকটিস করছে বাপের জুনিয়ার হয়ে। সেও ঘটনার যা স্টেটমেন্ট দিয়েছে অন্যান্যদেরই অনুরূপ। বন্ধুদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তার দেখা হতো। বিবাহিত—গত ফাল্গুনে বিবাহ করেছে।

(৬) সতীন্দ্র সান্যাল—আবলুশ কাঠের মত গাত্রবর্ণ। গোলগাল চেহারা। বাপ কেন্দ্ৰীয় সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার—এবং বেশীরভাগই দেশে-বিদেশে চাকরির ব্যাপারে ঘূরতে হয় বলে—ওরা দুই বোন, এক ভাই ও মা কলকাতাতেই থাকেন। ফুড ডিপার্টমেন্টে ভাল চাকরি করে। অবিবাহিত—বাকী স্টেটমেন্ট অন্যান্যদেরই অনুরূপ। বিবাহ হয়নি বটে এখনো, তবে দ্বির হয়ে গিয়েছে।

(৭) কাজল বোস। দেখতে কালো। রোগী। বি. এ., বি. টি. পাস করে একটা স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড-মিস্ট্রেস—বাপ নেই—মামা-মামীর কাছে মানুষ—স্কুল বোর্ডিংয়েই থাকে আগরপাড়ায়। বিবাহ হয়নি। কলকাতার বাইরে থাকায় বন্ধু-বন্ধুবের সঙ্গে বিশেষ একটা দেখা হতো না—কদচিং কখনো কালে-ভদ্রে, একমাত্র সুহাস মিত্র ছাড়। সুহাসের সঙ্গে প্রায়ই তার দেখা হয়—বাকী ঘটনার স্টেটমেন্ট অন্য সকলের মতই।

(৮) পাপিয়া চক্ৰবৰ্তী। বি. এ. পাস এবং ভাল এ্যাথলেট। জীবনে অনেক কাপ মেডেল শীল্ড পেয়েছে। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, অত্যন্ত স্মার্ট চেহারা, ল্লিম ফিগার, কলকাতার একটা বড় অফিসে ‘রিসেপশনিস্ট’—ভাল মাইনে। অবিবাহিত। সকলের সঙ্গেই মধ্যে মধ্যে দেখা হতো, বিশেষ করে মিত্রানী ও সুহাস মিত্রের সঙ্গে। তার বাকী স্টেটমেন্ট অন্যান্যদেরই অনুরূপ।

কিরীটী সকলেরই স্টেটমেন্ট বা জবানবন্দিগুলো পড়লো। তারপর একসময় সুশীল নন্দীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, এদের মধ্যে পাঁচজনের স্টেটমেন্টের কোন গুরুত্ব নেই—

সুশীল নন্দী বললেন, কার কার কথা বলছেন? মণিময়, ক্ষিতীশ, অমিয়, সতীন্দ্র আৱ পাপিয়া—

হাঁ, মণিময় দন্ত, ক্ষিতীশ চাকী, অমিয় রায়, সতীন্দ্র সান্যাল আৱ পাপিয়া চক্ৰবৰ্তী। —কিরীটী বললে।

কেন? প্রশ্নটা করে তাকালেন সুশীল নন্দী কিরীটীর মুখের দিকে।

কারণ, আমার মনে হয়—কিরীটী ধীরে ধীরে বলতে লাগল, যাদের কথা একটু আগে বলছিলাম, সেই পাঁচজনের সেদিনকার পিকনিকে উপস্থিতিটা নিছক একটা উপস্থিতি—বা অন্যান্যদের সঙ্গে অনেক দিন পরে একটা মিলনের আনন্দ বলে বোধ হয় ধরে নিতে পারেন। কেন এই কথাটা বলছি, আবার একটু পরিষ্কার করে বলি। তারপর একটু যেন থেমে পুনরায় তার অর্ধসমাপ্ত কথার জের টেনে কিরীটী বলতে লাগল, দলের মধ্যে সেদিন ঐভাবে মিত্রানীর মৃত্যুর ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যে ঘেরা এবং সে মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—কেউ তাকে রুমালের ফাঁস গলায় দিয়ে হত্যা করেছে বাড় ও ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে অন্যান্যদের অগোচরে।

হত্যা যখন করা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তাকে হত্যা করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে—কে? কে তাকে হত্যা করলো! বা কে তাকে হত্যা করতে পারে! হয় তো বাইরের কেউ ঐ সময় তাকে হত্যা করেছে গলায় রুমালের ফাঁস দিয়ে, না হয় যারা ঐ মুহূর্তে এখানে উপস্থিত ছিল, তাদেরই মধ্যে কেউ! তাই নয় কি?

হ্যাঁ, মডু গলায় সুশীল নন্দী বললেন, কিন্তু—

জানি। আপনি হয়তো বলতে চাইছেন, তারা দীর্ঘদিনের পরিচিত ও পরম্পরার পরম্পরার বন্ধু। কথাটা ঠিক এবং সেফেত্তে কারোর প্রতি কারোর আক্রেশ থাকলে হয়তো অনেক আগেই তাকে হত্যা করতো, সে ধরনের সুযোগ পেতে তার কোন অসুবিধা ছিল না। তবে ঐদিনই বা হত্যা করলো কেন! তাই নয় কি?

হ্যাঁ।

দেখুন, আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন হত্যা দুই রকমের হয়—এক দীর্ঘ দিনের হত্যালিঙ্গা—হত্যাকারী একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে—সেটা হচ্ছে পূর্ব-পরিকল্পিত হত্যা—আর একটা হচ্ছে সাডেন প্রোভোকেশন-জনিত হত্যা। এখন কথা হচ্ছে মিত্রানীর ক্ষেত্রে কোন্টা হয়েছে? যদি প্রথমটাই ধরে নিই—তাহলে স্বত্বাবতই যে কথাটা আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক, সেটা হচ্ছে হয়তো সেই হত্যাকারী মিত্রানীর পূর্ব-পরিচিত ছিল এবং সেই পরিচয়ের মধ্যে দিয়েই কোন কারণে সে মিত্রানীর প্রতি বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সেই বিরুদ্ধতা হয়তো এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল—যার ফলে ঐ নিষ্ঠুর হত্যা সংঘটিত হয়েছে।

তাহলে আপনি বলতে চান মিঃ রায়—মিত্রানীর পরিচিত জনদের মধ্যে কেউ—

ঠিক তাই—আর সেই পরিচিত জনদের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই ঐ বন্ধুদের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক নয় কি?

তা অবিশ্যি—

অবশ্যই ওরা ছাড়াও মিত্রানীর আরো পরিচিতজন থাকতে পারে—সেটা তখনই আমরা ভাববো, যখন সেদিন যারা উপস্থিত ছিল, তারা প্রতোকে সন্দেহের তালিকা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু আগেই যে পাঁচজনের নাম করেছি তারা সেই তালিকা থেকে আমার মতে বাদ পড়ে।

কেন?

কিরীটী অমনিবাস (১৩)—৩

আপনার নেওয়া জবানবন্দি বা স্টেটমেন্টগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন, তাহলেই আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন,—মণিময়, ক্রিতীশ, সতীন্দ্র ও পাপিয়া এরা একমাত্র পাপিয়া ব্যতীত—সকলেই যে যার জীবনে প্রতিষ্ঠিত, বিবাহিত, সংসারধর্ম করছে—এদের পক্ষে ঐ ধরনের একটা নৃশংস হত্যার ব্যাপারে লিখ হওয়া স্বাভাবিক কি?

কেন? ওদের মধ্যেও তো কোন আক্রেণ বা দৰ্য্যার কারণ থাকতে পারে মিত্রানীকে কেন্দ্র করে—সুশীল নন্দী বললেন।

তা থাকতে পারে হয়ত এবং যদি থাকেই, স্বভাবতই যে প্রশ্নটা আমার মনে হচ্ছে—কি কারণে আক্রেণ বা দৰ্য্যা—

কত কারণ তো থাকতে পারে—সুশীল নন্দী বললেন।

কথাটা মিথ্যা বলেননি আপনি—তবু একটা কিন্তু থেকে যায়—

কিসের কিন্তু—

কিন্তু হচ্ছে মিত্রানী কি তাহলে তার কিছুটা অস্তত আভাস পেত না! শুধু তাই নয়—ওদের জবানবন্দি থেকেও হয়ত তার কিছুটা ইঙ্গিত আমরা পেতাম—যেটা বাকী দুজনার জবানবন্দি থেকে অধ্যাং সুহাস মিত্র ও কাজলা বোসের স্টেটমেন্ট থেকে আমরা পেতে পারি—কিন্তু সে কথা আমরা পরে ভাববো। তার আগে আমি আপনার একটু সাহায্য চাই—

বনুন কি সাহায্য চান?

আমি ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলতে চাই—

বেশ তো। সে আর এমন কঠিন কি! আমি ব্যবহা করবো।

যত তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট—

তাই হবে—

তাহলে আজ আমি উঠি!

কিরীটী বিদায় নিল। জ্যোতিভূষণও কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলেন।

বেলা তখন অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে, বৈশাখের সূর্য মধ্য-গগনে প্রথর তাপ ছড়াচ্ছে।

গাড়িতে উঠতে হীরা সিং শুধায়, কিধার জায়গা সাব?

লালবাজার হয়ে চল—বাবুকে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

গাড়ি চলেছে কলকাতার পথে—চলমান গাড়ির খোলা জানালাপথে আগনের হস্কার মত তপ্ত হাওয়া যেন এসে চোখমুখ ঝলসে দিচ্ছে।

গাড়িতে উঠে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী। থানায় জ্যোতিভূষণ একটা কথাও বলেননি, দুজনের কথবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন।

কিরীটীর দিকে একবার তাকালেন জ্যোতিভূষণ, সিগার মুখে গাড়ির ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে অন্যমনক্ষভাবে বাটিরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

মিঃ রায়!

কিছু বলছিলেন জ্যোতিবাবু?

আচ্ছা, মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারটা আপনার কি মনে হচ্ছে পূর্ব-পরিকল্পিত না সাড়ন প্রোভোকেশন!

অবশ্যই পূর্ব-পরিকল্পিত বলেই মনে হচ্ছে—কিন্তু এক ডায়াগায় ব্যাপারটা যেন ঠিক মিলছে না—

কি রকম? প্রশ্নটা করে তাকালেন জ্যোতিভূষণ কিরীটির মুখের দিকে।

ধরঃন যদি পূর্ব-পরিকল্পিত হয়—হত্যাকারীর পক্ষে চাল পাওয়াটা যেন ফিফটি-ফিফটি হচ্ছে, অর্থাৎ যদি বাড় ও ধূলোর অংধি না উঠতো, চারিদিক একটা অন্ধকারের ঘবনিকায় না ঢেকে যেতো, হত্যাকারী হত্যা করবার সুযোগই পেতো না, অবিশ্য যদি হত্যাকারী মিত্রানীর পরিচিত জনেদের মধ্যেই কেউ হয়ে থাকে।

আমার মনে আছে মিঃ রায়, সেদিনকার কাগজেও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে দেখেছিলাম—বিকালের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির সঙ্গাবনার কথাটা। এবং পর পর কয়েকদিনই বিকেলের দিকে সে সময় ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। হত্যাকারী হয়ত সেইটুকুর উপরেই ভরসা করে প্রস্তুত হয়েছিল।

হতে পারে—তাহলে চাল পাওয়াটা হত্যাকারীর পক্ষে ফিফটি-ফিফটি থেকে যাচ্ছে—অর্থাৎ চাল না পেলে সেদিন সে মিত্রানীকে হত্যা করতে পারতো না—মিত্রানী খুন হতো না। ভাল কথা, ময়না তদন্তের রিপোর্টটা কবেতক পাওয়া যাবে? পেলেই আমাকে একটু জানাবেন। আমি বাড়িতেই থাকবো।

জ্যোতিভূষণকে লালবাজারে নামিয়ে কিরীটি ফিরে এলো। এবং সারাটা দিন কিরীটি আর কোথাও বের হলো না।

লালবাজার থেকে ফোন এলো সঙ্ক্ষের দিকে।

কিরীটি কৃষণ আর সুব্রত বসে বসে চা পান করছিল।

কিছুক্ষণ পূর্বে সুব্রত এসেছে।

ফোনের রিং হতেই কিরীটি বললে, দেখ তো সুব্রত, বোধ হয় লালবাজার থেকে জ্যোতিবাবু ফোন করছেন!

সুব্রত ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো—

কিরীটিবাবু আছেন?

আছে।

বলুন লালবাজার থেকে জ্যোতিভূষণ কথা বলছি।

এগিয়ে গিয়ে ফোনটা সুব্রত হাত থেকে নিল কিরীটি। কিরীটি কথা বলছি, তারপর পেলেন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট?

হ্যাঁ।

শ্বাসরোধ করে মৃত্যু ছাড়া দেহে আর কিছু পাওয়া গিয়েছে কি?

মিঃ রায়, মনে হচ্ছে আপনি যেন আরো কিছু আশা করছেন!

করেছিলাম বলেই তো আই অ্যাম ইগারলি ওয়েটিং ফর দি রিপোর্ট!

শি ওয়াজ রেপড। হাউ হরিব্ল!

হরিব্ল তো বটেই, তবে আমি ছায়ার পিছনে যেন কায়ার আভাস পাচ্ছি—দি ম্যান বিহাইন্ড দি কারটেন, আর এখন অত অস্পষ্ট মনে হচ্ছে না—ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ।

রিপোর্টটা কি আপনি দেখতে চান?
 পরে দরকার হলে আপনাকে জানাব।
 ফোনটা নামিয়ে রেখে কিরীটী আবার এসে সোফায় বসল।
 প্রশ্ন করে কৃষ্ণ, ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলে?
 হ্যাঁ।

সুব্রত বললে, কার—মিত্রানী দেবীর?
 হ্যাঁ, তার উপর বলাংকার করা হয়েছিল—
 তাহলে—সুব্রত যেন কি বলতে চায় কিন্তু তার বলা হলো না—

কিরীটী কতকটা যেন তাকে থামিয়ে দিয়েই বললে, তুই তো সব শুনেছিস
 সুব্রত—এবারে তোর কি মনে হয়, বাইরের কেউ, না ঐ মিত্রানীর পরিচিত জনদের
 মধ্যেই কেউ—

কৃষ্ণ জবাবটা দিল, বাইরের কেউও-তো হতে পারে।

না কৃষ্ণ, না—গণিটা অভ্যন্তর ছেট—মিত্রানীর পরিচিত জনদের মধ্যেই কেউ এবং
 সম্ভবত যারা এদিন ঐসবয় এখানে উপস্থিত ছিল তাদেরই মধ্যে একজন—যার তিনটি
 বন্ধুই ছিল, অর্থাৎ সুবিধা সুযোগ ও হত্যার উদ্দেশ্য!

কি উদ্দেশ্য হতে পারে? কৃষ্ণের প্রশ্ন।

ব্যর্থ প্রেমের আক্রেণ বা বহুদিন ধরে অবদমিত কামভাব, ঠিক প্যাশান নয়, মিত্রানীর
 প্রতি একটা লালসা—যে কারণে প্রথমে এ অকস্মাৎ হাতের মুঠোয় আসা সুযোগকে
 যেমন সে নষ্ট হতে দেয়নি, তেমনি বহুদিনের লালসার পরিত্তিপ্রি সাধন করতেও সে
 এতটুকু পশ্চাদপদ হয়নি। কিল্ড হার বাই থ্রোটিং অ্যান্ড দেন রেপড হার।

পর পর হত্যা ও ধর্ষণ—বিশেষ করে হত্যার নিষ্ঠুর পদ্ধতি দেখে সেটাই বেশী করে
 মনে হয়!

দিন দুই পরে শনিবার সুশীল নন্দীর ফোন এলো।

মিঃ রায়—কাল সকলে বিকালের দিকে আমার এখানে আসছে আপনি যেমন
 বলেছিলেন—

কিরীটী জবাবে বলেছিল, ঠিক আছে। আমি যাবো, কটার সময় তারা আসছে?
 এই ধরন পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে!

আমার কথা কিছু তাদের বলছেন?

না, আমিই তাদের সঙ্গে আরো কিছু আলোচনা করতে চাই এইটুকুই বলেছি। সুশীল
 নন্দী বললেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে অতঃপর কিরীটী ফোনের রিসিভারটা সবে নামিয়ে রেখেছে, সুব্রত
 এসে ঘরে ঢুকল।

এই যে সুব্রত—এসে গেছিস তুই, ভালই হলো, নচেৎ একটু পরেই হয়ত তোকে
 ফোন করতাম।

সুব্রত কোন কথা না বলে একটা খালি সোফার উপরে উপবেশন করলো।

কিরীটিই বললে, কাল শনিবার সুশীল নন্দীর ওখানে একবার যাবো বিকেলের দিকে,
তুইও থাকবি আমার সঙ্গে—

মিত্রানীর বন্ধু ও বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলবি? সুব্রত শুধাল।
হ্যাঁ।

কিন্তু পাঁচজনকে তো আগেই লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছিস তুই!

তা দিয়েছি ঠিকই, তবু সকলেরই মুখোযুধি একবার আমি হতে চাই—তাতে করে
মিত্রানীর মৃত্যুতে কার মনে কি রকম রেখাপাত করেছে, কিছুটা অস্তত তার আভাস
পাবো হয়তো।

কিন্তু ওরাই তো সব নয়—একজন তো বাকী থেকে যাচ্ছে, যদিও সে ঘটনার দিন
স্পটে উপস্থিত ছিল না—

সজল চক্ৰবৰ্তী?

হ্যাঁ।

কথাটা যে আমার মনে হয়নি সুব্রত তা নয়, ঘটনার সময় সেদিনকার স্পটে সে না
থাকলেও মিত্রানীর পরিচিত জনদের মধ্যে সেও একজন। সে নিশ্চয়ই এতদিনে ব্যাপারটা
জানতে পেরেছে—কাজেই তার মনে মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারটা কতখানি রেখাপাত
করেছে তাও জানা প্রয়োজন তো বটেই, তাছাড়া মিত্রানী সম্পর্কে কোন নতুন তথ্যও
হ্যাত সে দিতে পারে।

কৃষ্ণ এতক্ষণ ঘরের এক কোণে বসে গভীর ঘনোযোগের সঙ্গে একখানা বই পড়ছিল,
দুই বন্ধুর আলোচনায় কোন সাড়া দেয়নি, সে এবারে বললে, দেখো, একটা কথা তোমাকে
গতকাল থেকেই বলবো ভাবছিলাম।

কি বল তো? স্তুরি মুখের দিকে তাকাল।

দলের মেয়ে দুটিকেই বোধ হয় তুমি তোমার বাদের—মানে অমিশনের লিস্টে যোগ
করে নিতে পারো—

তুমি বোধ হয় পোস্টম্যাটেমের রিপোর্টার কথাই ভাবছো কৃষ্ণ, কিন্তু এটা তো স্বীকার
করবে ঐ চৰম ঘটনাটা ঘটাবার আগে বিক্ষিপ্ত কোন ইতিহাস বা ঘটনা ঐ ব্যাপারের সঙ্গে
জড়িত থাকতে পারে।

তা যে পারে না আমি বলছি না, তবে—

তাছাড়া এটাও তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে কৃষ্ণ, রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে এমন
অনেক কিছু আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও, পরে কোন এক সময় সেটা কোন
মূল্যবান সূত্র হয়েও দাঁড়াতে পারে! কি জানো কৃষ্ণ, ঠিক সেই কারণে ঐ দশটি নৱনারীর
পরিচয়ের ইতিহাস যতটা সম্ভব আমি জানতে চাই—যদি কোথাও কিছু এমন খোঁজ পাই
যেটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে এগুতে পারব!

কৃষ্ণ আর কথা বাড়াল না, সোফা থেকে উঠে পড়ে বললে, বোসো তোমরা, আমি
চা নিয়ে আসি।

কৃষ্ণ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ আট ॥

ওদের সকলের পৌছাবার আগেই কিরীটী সুশীল নন্দীর ওখানে পৌছে গিয়েছিল। কিরীটী সুশীল নন্দীকে আগেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল, ধানার মধ্যে নয়—সন্তুব হলে এই বিলডিংয়েরই দোতলায় সুশীল নন্দীর কোয়ার্টস-এ সে সকলের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সুশীল নন্দী বলেছিল, তাতে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ তার স্ত্রী কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছেন—তার কোয়ার্টস থালি।

কিরীটী ও সুরত সুশীল নন্দীর দোতলার বসবার ঘরে ঢুকে দেখলো—দুটি ঘুবকের সঙ্গে বসে সুশীল নন্দী কি সব আলোচনা করছেন!

কিরীটীদের ঘরে ঢুকতে দেখে সুশীল নন্দী বললেন, আসুন মিঃ রায়, সকলে এখানে এসে পৌছাননি, মাত্র দুজন এসেছেন—মণিময়বাবু, ফিল্টাইশবাবু—ইনি কিরীটী রায়, সরকারের পক্ষ থেকেই উনি আপনাদের সকলের সঙ্গে মিশ্রণী দেবীর হত্যার বাপারে কিছু ডিজ্ঞাসাবাদ করতে চান।

মণিময় দণ্ড ও ফিল্টাইশ চাকী ঘৃণপৎ একসঙ্গে সুশীল নন্দীর কথায় কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, কিরীটীও ওদের দিকে তাকিয়েই আছে তখন, দুজনারই বয়স বত্তিশ থেকে চোত্তিশের মধ্যে। মণিময়ের গায়ের ঝংটা কালো হলেও চোখে মুখে একটা আলগা শ্রী আছে—বেশ বলিষ্ঠ, সুগঠিত চেহারা। উচ্চতায় মাঝারি। মাথায় বড় বড় চুল। ঘাড়ের দিকে মেন একটু বেশীই, লংস ও একটা হাওয়াই শৰ্ট পরানো। পায়ে কালো চপ্পল।

ফিল্টাইশ চাকী একটু বেঁটেই—তবে রোগা পাতলা চেহারার জন্য তেমন বেঁটে মনে হয় না, গায়ের রং তামাটে, মনে হয় কোন এক সময় গৌর ছিল, এখন রোদে জলে ঘুরে ঘুরে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে, তেলহাইন রুক্ষ একমাত্র চুল—কিছু কিছু চুলে পাক ধরেছে ইতিমধ্যে। নাকটা একটু চাপা, ছোট কপাল, গালের হাড় দুটো প্রকৃত। বুদ্ধিদীপ্ত চপ্পল দুটো চোখের দৃষ্টি।

কথা বললে ফিল্টাইশ চাকীই, সুশীলবাবু একটু আগেই বলেছিলেন, আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান বলেই বিশেষ করে আমাদের সকলকে আজ এখানে ডাকা হয়েছে। কিন্তু আমরা যা জানি সবাই তো সেদিনই বলে ওর খাতায় সই করে দিয়েছি! কথার মধ্যে একটা ঝাঁক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিরীটী মুদু হেসে বললো, ঠিকই ফিল্টাইশবাবু, আমি ঠিক সেজন্য আপনাদের এখানে আজ আসবার জন্য ওঁকে বলতে বলিনি—

তবে? ফিল্টাইশের প্রশ্ন।

দেখুন আমি একটু ভিতরের কথা জানতে চাই। কিরীটী বললে।

ভিতরের কথা মানে? প্রশ্নটা করে ফিল্টাইশ চাকী কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

আপনাদের সকলের পরম্পরের সঙ্গে তো দীর্ঘদিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা—তাই—কি তাই? বলুন, থামলেন কেন?

মিশ্রণী সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত এমন অনেক কথা জানেন যেটা

জানতে পারসে আপনাদের কাছ থেকে মিত্রানীর হত্যারহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে আমার কিছুটা সাহায্য হতে পারে। যেমন ধরন মিত্রানী এতদিন বিয়ে করেনি কেন? তার বাবাকে বিয়ের কথায় সে বলেছে সময় হলে জানবো—

ফিল্টোশ চাকী বললে, তাই নাকি—তা সে-রকম কিছু আমি শুনিনি। তাছাড়া ওটা তার তো পার্সোনাল ব্যাপার—

ঠিকই—আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, কিরীটি বললে, মিত্রানী কাউকে ভালবাসত কিনা জানেন? কিংবা অন্য কেউ মানে আপনাদের মধ্যে তাকে কেউ ভালবাসত কিনা বা তার প্রতি কোনরকম দুর্বলতা ছিল কিনা কারো?

ফিল্টোশ চাকী বললে, কাউকে মিত্রানী ভালবাসতো কি বাসত না আমি জানি না—তা নিয়ে কোনদিন আমার কোন মাথাবাথা ছিল না। আর দুর্বলতার কথা যদি বলেন, আমার তার প্রতি এতটুকুও দুর্বলতা ছিল না, কলেজ ছাড়বার পরও বড় একটা দেখাসাক্ষাৎই হতো না।

আচ্ছা ফিল্টোশবাবু, ফিল্টোশের কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রশ্নটা করলো হঠাতে— মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?

ব্যাপারটা এত অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর যে, ঐ ব্যাপারে কোন কিছু মাথায়ই এখনো আসছে না। না মশাই, কাউকে আমি সন্দেহ করি না।

আচ্ছা ফিল্টোশবাবু, আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। আপনি যেতে পারেন।

ধন্যবাদ। ফিল্টোশ চাকী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল এবং দরজার দিকে এগুতেই কিরীটির শেষ কথাটা তার কানে এলো।

পুলিসের কিস্ত ধারণা—আপনাদেরই মধ্যেই একজন সৌন্দর্য—

কি, কি বললেন! চকিত ঘূরে দাঁড়ায় ফিল্টোশ।

কিরীটি কথাটা তার শেষ করে, মিত্রানীকে—না—কিছু না—আপনি যান।

ক্ষুঁ মীন সাম ওয়ান অব আস মিত্রানীকে হত্যা করেছি!

তাই।

বলিহারি বুদ্ধি! বরাবরই আমার ধারণা, বেশীর ভাগ পুলিসের লোকেরই বুদ্ধি বলে কোন পদার্থ নেই। এখন দেখছি—

সুশীল নন্দী বাধা দিলেন গন্তীর গলায়—ফিল্টোশবাবু, আপনি যেতে পারেন।

প্রথমে সুশীল নন্দী ও পরে কিরীটির প্রতি ঝুঁক দৃষ্টি হেনে ফিল্টোশ চাকী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মণিময় এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবারে সে কিরীটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, সত্যি কিরীটিবাবু! তার গলায় রীতিমত একটা উদ্বেগ যেন প্রকাশ পেল।

কি সত্যি মণিময়বাবু? মন্দ হেসে কিরীটি প্রশ্ন করে। বস্তুত এতক্ষণ সে মন্দ মন্দ হাসছিল।

ঐ যে ফিল্টোশ বলে গেল, আ—আপনাদের তাই ধারণা নাকি?

কিরীটি শাস্ত গলায় এবারে জবাব দিল, তা যদি ধরন হয়ই, সেটা কি খুব একটা অপ্রত্যাশিত কিছু—

না, না—কিরীটীবাবু, এ হতেই পারে না, আপনি বিশ্বাস করুন।

আপাতত ঐ কথা থাক, আগে আমার প্রশ্নটার জবাব দিন। মিত্রানীকে আপনাদের মধ্যে কেউ ভালবাসতো কি না আপনি কিছু জানেন? বা তার আপনাদের কারোর প্রতি কোন আকর্ষণ বা দুর্বলতা ছিল কিনা—

দেখুন কিরীটীবাবু, আমি ঠিক জানি না—আমি তার সঙ্গে কখনো সেরকম ভাবে মিশনি—সহপাঠিনী হিসাবে সামান্য যা পরিচয়—

মণিময়ের কথা শেষ হলো না, সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি একসঙ্গেই যেন খোলা দরজার উপর গিয়ে পড়লো। অমিয় রায়, সতীন্দ্র সান্যাল সর্বপ্রথমে এবং তাদের পশ্চাতে কাজল বোস, পাপিয়া চক্ৰবৰ্তী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো।

সুশীল নন্দীই সকলকে আহুন জানালেন—আসুন আসুন, তা বিদ্যুৎবাবু আর সুহাসবাবুকে দেখছি না! তাঁরা এলেন না?

জবাব দিল সতীন্দ্র সান্যাল, তাদেরও আসার কথা নাকি!

হ্যাঁ—আমি তো সকলকেই লোক মারফৎ চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছি আলাদা আলাদা ভাবে আসবার জন্য।

কিন্তু চিঠিতে তো সে কথা লেখা ছিল না, শুধু আমাকেই আসবার কথা লেখা ছিল, সতীন্দ্র বললে।

সুশীল নন্দী বললেন, তা আপনারা সব একত্রে এলেন কি করে?

সুশীল নন্দীর কথায় ওরা সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। তখন অমিয়ই বললে, হাওড়া বৌজের কাছে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে বিশ্বী জ্যাম হয়েছে—তাই সকলেই আমরা যে যার যানবাহন ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে বৌজের উপর দিয়ে একে অন্যের দেখা পাই—পরে বৌজ পার হয়ে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত হেঁটে এসে সকলে একটা ট্যাঙ্কি ভাড়া করে আসছি—

ও তাই বলুন—তা আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—

সকলের দৃষ্টিই তখন মণিময়ের প্রতি নিরবন্ধ—মনে হচ্ছে সকলের মনের মধ্যেই যেন একটা সংশয় দেখা দিয়েছে, কিন্তু কেউ কিছু বললো না, ঘরের মধ্যে সকলের জন্যই আসনের ব্যবস্থা ছিল, একে একে সব চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

॥ নয় ॥

সুব্রত এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি—নীরব দর্শকের মত কিরীটীর পাশে নিঃশব্দে বসে ওদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এদেরও সকলের বয়েস অন্য দুইজনার মতই, অমিয়র চেহারার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই—সাধারণ একজন যুবক, একজোড়া গৌঁফ আছে—পরনে ধূতি-পাঞ্জাবি, চোখে সরু শৌখিন ফ্রেমের চশমা—চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন একটু বোজা-বোজা।

সতীন্দ্র সান্যালের কালো আবলুস কাঠের মত গায়ের রঙ। বেশ মোটা-সোটা, মুখটা লাগাল—প্রকল্প। জামা কাপড় চেহারা দেখে মনে হয় বেশ সুন্দী ব্যক্তি। আর হবেই বা

না কেন, কিরীটির মনে পড়লো সুশীল নন্দীর খাতায় লেখা আছে ওর সম্পর্কে, ফুড ডিপার্টমেন্টে ওর বড় চাকুরে বাপের দৌলতে ভাল চাকরি একটা করছে। সুশীল নন্দী সতীদ্রু সম্পর্কে যেন ঠিক-ঠিকই লিখেছেন। কাজল বোস—একেবারে টিপিক্যাল একজন স্কুল মিস্ট্রেসের মতন চেহারা। কালো, রোগা ঠিক না বলে বলা উচিত যৌবন-রস যেন ওর দেহ থেকে অনেকখানি নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। চোখেমুখে ও চেহারায় যেন একটা হতাশা—একটা ক্লাস্ট্রি স্পষ্ট ইঙ্গিত।

আর পাপিয়া চক্ৰবৰ্তী। হ্যাঁ—উজ্জুল শ্যাম—ন্নিম ফিগার—ঠিক যেন আজকের দিনের যে সব তরণীদের পথেথাটে চোখে পড়ে—নিজেকে আকৰ্ষণের বস্তু করে তোলার উপ্র প্রচেষ্টা, পাপিয়া যেন তাদেরই সমগোত্তীয়। পাপিয়ার মত মেয়েরা অস্তরের সঙ্গে কখনো কোন পুরুষের কাছে ধৰা দিতে পারে না—কতকটা যেন আত্মকেন্দ্ৰিক।

কথা বললো পাপিয়াই চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো সুশীলবাবু, হঠাৎ এভাবে আবার আমাদের তলব পাঠিয়েছেন কেন?

মণিময় ও ক্ষিতীশকে যা বলেছিলেন সুশীল নন্দী, কিরীটিকে দেখিয়ে ওদেরও তাই বললেন। সকলেই তাঁর কথায় একেবারে কিরীটির দিকে তাকাল!

পাপিয়াই আবার বললে, আপনাকে যেন চিনি বলে মনে হচ্ছে—নন্দী সাহেব, উনি কি সত্যসন্ধানী কিরীটি রায়?

ঠিকই ধরেছেন মিস চক্ৰবৰ্তী।

হ্যাঁ। এখন তাহলে বুঝতে পারছি, আজকে আমাদের ডাকার আসল উদ্দেশ্যটা। আর উনি বোধ হয় সুৱতবাবু, ওঁর পাশে বসে!

হ্যাঁ, সুৱত রায়। সুশীল নন্দী আবার বললেন।

কিরীটি কথা বললে এবারে, দেখুন মিস চক্ৰবৰ্তী—আপনারা সকলেই মিত্রানীর বন্ধু—সহপাঠীও, তাই মিত্রানী সম্পর্কে দুটো-একটা প্রশ্ন আমি করতে চাই—

সতীদ্রু বলেন, কি প্রশ্ন?

মিত্রানীর প্রতি দলের কারো কোন দুর্বলতা ছিল কিনা—কিংবা মিত্রানীর আপনাদের কারোর প্রতি—

সবাই চুপ। একেবারে যেন বোবা! অকস্মাৎ যেন সকলেই কেমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছে।

বুঝতে পারছি আমার প্রশ্নে আপনারা সকলেই একটু অস্বস্তিবোধ করছেন।
সুশীলবাবু—

বলুন—

আপনার পাশের ঘরটা আমরা একটু ব্যবহার করতে পারি?

নিশ্চয়ই—

তাহলে আমি আর সুৱত পাশের ঘরে যাচ্ছি, আপনি এক-একজন করে এঁদের ঐ ঘরে পাঠান—

বলা বাহল্য, সেই মতই ব্যবস্থা হলো।

প্রথমেই এলো অমিয় রায়। সে এক কথাতেই জবাব দিল, কলেজ ছাড়ার পর মিত্রানীর সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না—কচিং কখনো দেখা হতো—তাও দু’-একটা সাধারণ কুশল প্রশংসন ছাড়া ওদের মধ্যে আর কোন কথা বড় একটা হতো না—কাজেই মিত্রানী সম্পর্কে সে বিশেষ কোন খবরই রাখে না।

অমিয়কে কিরীটী বিদায় দিল।

অমিয়র পর এলো সতীন্দ্র। তারও জবাব অমিয়র মতই।

কিরীটী মৃদু হেসে তাকেও বিদায় দিল।

অতঃপর এলো পাপিয়া চক্ৰবৰ্তী।

সে কিরীটীর প্রশ্নের জবাবে বললে, মিত্রানী ওয়াজ এ টিপিক্যাল অধ্যাপিকা। স্ট্যুডেন্ট অ্যান্ড নেভার সোসাল। ঐ টাইপের মেয়েরা প্রেম করলেও কখনো তা কি প্রকাশ করে—করে না! কাজেই, তার সম্পর্কে ঐ ধরনের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—মিত্রানী সম্পর্কে আমার ধারণা, প্রেম-ট্রেমের বাপারে তার বোধ হয় একটা নশিয়াই ছিল। বলে পাপিয়া মৃদু হাসলো। কিরীটী মৃদু হেসে তাকেও বিদায় দিল।

সর্বশেষ এলো কাজল বোস।

দুই চোখে ঐ মুহূর্তে তার, কিরীটীর মনে হয়, কেমন যেন একটা ভয় ও সংশয়। দাঁড়িয়ে থাকে সে, বসে না।

বসুন মিস্ বোস—কিরীটী বললে।

কিন্তু আমার যা বলবার ছিল তা তো সেইদিনই থামার অফিসারকে বলেছি কিরীটীবাবু।

জানি বলেছেন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

একটু দ্বিধা, একটু সংক্ষেপ নিয়েই যেন কাজল চেয়ারটার উপরে বসলো। সোজাসুজি কিরীটীর চোখের দিকে যেন সে তাকাতে পারছে না।

বলুন তো মিস্ বোস, আপনার বাস্তবী মিত্রানী আপনাদের বন্ধু-ছেলেদের মধ্যে কাউকে কি ভালবাসতো।

ঠিক জানি না। তার সঙ্গে আমার বড় একটা দেখা হতো না কলেজ ছাড়ার পর। তাছাড়া সে ছিল নামকরা একটি কলেজের প্রফেসার, আর আমি সাধারণ একজন স্কুল-মিস্ট্রেস—

কিরীটী বুঝলো কাজলের মধ্যে একটা ইনফিলিয়ারিটি কমপ্লেক্স আছে মিত্রানী সম্পর্কে। কিরীটী একটু যেন সজাগ হয়ে নড়েচড়ে বসলো।

আপনি মনে হচ্ছে মিত্রানীকে তেমন বোধ হয় একটা খুব পছন্দ করতেন না!

না, না—তা নয়—

তবে?

ওর বৱাবৰই ভাল ছাত্রী ও অধ্যাপিকা বলে মনের মধ্যে একটা ভ্যানিটি ছিল। অন্যান্যেরা টের না পেলেও আমি টের পেতাম।

আচ্ছা আপনাদের দলের পুরুষদের কারো উপরই কি মিত্রানীর কোন দুর্বলতা ছিল

না? আবার আগের প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলো কিরীটা, আপনার দৃষ্টিতে না পড়লে দলের অন্য কারো মুখেও কি কিছু শোনেন নি?

না। তবে সুহাস যেন একদিন আমাকে কথায় কথায় বলেছিল—

কি বলেছিলেন সুহাসবাবু?

মিত্রানীর সুহাসের প্রতি ব্যবহারটা যেন একটু কেমন-কেমন ছিল। আর মনে হয়, আবার সুহাসেরও বোধ হয় মিত্রানীর প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। আচ্ছা কিরীটিবাবু—

বলুন।

সত্যিই কি পুলিসের ধারণা হয়েছে যে, আমাদের মধ্যেই কেউ সেদিন মিত্রানীকে— সেটাই তো স্বাভাবিক মিস বোস।

কেন—কেন?

মনে করুন, আপনারা ছাড়া সে সময় সেখানে কেউ বাইরের লোক ছিল না—সেও একটা কথা এবং আপনাদের কারো পক্ষে সেদিন ঐখানে মিত্রানীকে হত্তা করার যে রকম সুবিধা ছিল, ততটা আর কারোর পক্ষেই ছিল না।

কিন্তু—

কিরীটি বলতে লাগল, তাছাড়া ধরন যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তিরই কাজ হবে—সে নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও ছিল যেটা আপনাদের অতঙ্গে মানুষের কারো না কারো চোখে পড়তই, সেরকম কাউকে কি সেদিন আপনাদের আশেপাশে সুযোগের অপেক্ষায় ঘূরবৃৰ করতে দেখেছিলেন আপনাদের কেউ?

না, সে রকম কাউকেই দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

আচ্ছা মিস্ বোস!

বলুন।

আপনাদের মধ্যে কেউ সেদিন বেতের চুপি মাথায় দিয়ে গিয়েছিলেন?

না তো!

আচ্ছা আপনাদের দলের মধ্যে কে কে সিগ্রেট খায়?

সুহাস, অমিয় আর বিদ্যুৎ—আরো একজন চেইন শোকার সজল চক্রবর্তী। সে তো সেদিন আসেইনি—

কে কি ব্রাউন খায় জানেন?

বিদ্যুৎ আর সজলের কথা জানি না—তবে সুহাস আর অমিয় দুজনে চার্মিনার খায়।

ইঁ। কে বেশী খায় সিগ্রেট ওদের দুজনের মধ্যে?

সুহাসই মনে হয় বেশী খায়।

আপনারা কেউ সেদিন একটা বায়নাকুলার নিয়ে গিয়েছিলেন?

বায়নাকুলার! না তো!

কারো কাছেই বায়নাকুলার ছিল না?

না।

আচ্ছা মিত্রানীর হাতে কি সবুজ রঙের কাচের চুড়ি ছিল? আপনার হাতেও তো দেখছি কাচের চুড়ি রয়েছে—

হঁ—এটা আমার শখ। মিত্রানীকে কথনো কাচের চুড়ি ব্যবহার করতে দেখিনি। আর কাচের চুড়ি ব্যবহার সে করতেই বা যাবে কোন্ দুঃখে—এত টাকা মাইনে পেত।

টাকার জন্যই কি কেউ কাচের চুড়ি ব্যবহার করে! আপনার মত শখ থাকলে অনেক বড়লোকের মেয়েও হাতে কাচের চুড়ি পরেন। আচ্ছা আপনি সেদিন পড়ে-টড়ে গিয়েছিলেন নাকি?

কই না তো!

দেখছি আপনার ডান হাতে তিনটি, অন্য হাতে একটি চুড়ি—

আমার এক ছোট ভাইবি আছে, সে ভেঙে ফেলেছে।

আচ্ছা মিস বোস, এবারে আপনি যেতে পারেন।

কাজল উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুব্রত!

কি?

কাজল বোসের বাঁ হাতটায় কভির কাছে লক্ষ্য করেছিলি—একটা অ্যাব্রেশন মার্ক আছে।

দেখেছি—মনে হয় সব কথা উনি স্পষ্ট করে বললেন না।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, আর কিছু মনে হলো তোর ঐ মহিলা সম্পর্কে?

মনে হলো নিজের অসুন্দর চেহারার জন্য যেন একটা মানসিক দৈন্যে ভুগছেন।
ঠিক। আর কিছু?

আর তো কিছু মনে হলো না।

সুহাসবাবুর প্রতি বোধ হয় ঐ ভদ্রমহিলার কিছুটা দুর্বলতা আছে।

ঐ সময় সুশীল নন্দী এসে ঘরে ঢুকলেন—মিঃ রায়!

বলুন।

আরো দু'জন এসেছেন।

কে কে? কিরীটী শুধাল।

সুহাস মিত্র আর সজল চক্রবর্তী। মানে সেই ভদ্রলোক যার অনুরোধেই সেদিন ওদের বটানিক্স-এ পিকনিকের প্রোগ্রাম হয়েছিল। কিন্তু সজলবাবু তো সেদিন পিকনিকে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর সঙ্গেও কথা বলতে চান নাকি?

ঘটনাচক্রে এসেই পড়েছেন যখন তখন আলাপ করতে দোষ কি! দিন না—তাঁকেই আগে পাঠিয়ে দিন।

সুশীল নন্দী চলে গেলেন এবং একটু পরে সজল চক্রবর্তী এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। চেহারায় ও পোশাকে বেশ শ্মার্ট। বেশ লম্বা সুগঠিত চেহারা। গাত্রবর্ণ শ্যামল বলা চলে। ছোট কপাল, নাকটা একটু চাপা—চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত। পরনে দামী সুট—

আপনার নাম—

সজল চক্রবর্তী।

বসুন।

সজল বসতে বসতে বললে, আজই এগারোটা নাগাদ মর্নিং ফ্লাইটে কলকাতায় এসেছি—মিত্রানীর বাসায় ফোন করেছিলাম—প্রণবেশবাবুর মুখেই সব শুনলাম। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি তো একেবারে হতবাক। ব্যাপারটা তো বিশ্বাসই করতে পারিনি—সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের ওখানে আমি ছুটে যাই—অ্যান্ড হি অলসো রিপিটেড দি সেম স্টোরি! সে-ই বললে থানা অফিসার নাকি আজ তাকে বিকেলের দিকে এখানে আসতে বলেছেন কि সব আলোচনার জন্য—আমিও তাই ওর সঙ্গে চলে এলাম।

বেশ করেছেন। ভালই করেছেন। আপনিও তো মিত্রানীর বন্ধু—সহপাঠী! আপনি নিশ্চয়ই তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই জানেন।

কি আর, কতটুকুই বা জানতে পারি বলুন—এইটুকু বলতে পারি—শী ওয়াজ ভেরি নাইস—ভেরি সোস্যাল।

কিন্তু কাজল বোস বলছিলেন—

কি? কি বলছিল কাজল?

মিত্রানী ওয়াজ রাদার আনসোস্যাল।

বরং ঠিক উল্টোটাই—

আচ্ছা মিঃ চক্ৰবৰ্তী—মিত্রানীর কোন লাভ-অ্যাফেয়ার ছিল বলে জানেন?

তা বোধ হয় ছিল—

আপনাদের মধ্যে কি কেউ—

ইফ আই অ্যাম নট রং, ঐ সুহাস—

সুহাস মি৤ৱ?

মনে হয়।

আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, পুলিসের একটা ধারণা, আপনাদের দলের মধ্যেই কেউ তাকে হত্যা করেছে—

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? আই মাস্ট সে দে আর ফুলস! আমাদের মধ্যেই কেউ মিত্রানীকে হত্যা করতে যাবে কেন?

ঈর্ষার তাড়নায়ও তাকে কেউ আপনাদের মধ্যে হত্যা করে থাকতেও তো পারে।

ঈর্ষা! কিসের ঈর্ষা! না, না—অসম্ভব।

আপনি তো সকলেরই মনের কথা জানেন না মিঃ চক্ৰবৰ্তী। তাছাড়া সব সময় নিজের মনের কথাই কি আপনি জানতে পারেন? থাক সে কথা—আপনার কোন বায়নাকুলার আছে?

বায়নাকুলার!

হ্যাঁ।

কই না!

নেই?

না।

তা আপনি এই সেদিন কলকাতায় এসেছিলেন—হঠাতে দুদিন পরেই যে আবার কলকাতায় এলেন?

একটা অফিসিয়াল কাজে আসতে হলো।

কালই বোধ হয় আবার চলে যাবেন?

না—দিন দুই আছি।

আপনি থাকেন কোথায়?

কল্টোলায়।

বাড়িতে কে কে আছেন?

বাবা মা আর এক ছোট বোন। ছোট বোন কলেজে পড়ে। সেকেন্ড ইয়ার।

কল্টোলায় আপনাদের নিজেদের বাড়ি?

না মিঃ রায়, ভাড়াটে বাড়ি। বাবা আমার সামান্য জজ কোর্টের কেরানী ছিলেন।

অবশ্যি আমি এখন যাকে আপনারা বলেন মোটা মাইনে তাই পাই, কিন্তু বাবা আমার অর্থসাহায্য নেবেন না। এ পিকিউলিয়ার টাইপ।

॥ দশ ॥

সজল চক্ৰবৰ্তীৰ পৰ এলো সুহাস মিত্র। নিয়মিত ব্যায়াম কৱলে যেমনটি হয়, তেমনি সুগঠিত চেহারা, পৱনে ধূতি পাঞ্জাবি। কালোৱ উপৰ সব কিছু মিলিয়ে সুহাস মিত্রেৰ চেহারাটা যাকে বলে সুশ্রী তাই। সমস্ত মুখে একটা আঘাবিশ্বাস ও বৃদ্ধিৰ ছাপ।

বসুন সুহাসবাবু—কিরীটী বললে।

সুশীলবাবু বলছিলেন, আপনি নাকি কি সব আলোচনা কৱতে চান।

হ্যাঁ—দু-একটা প্ৰশ্ন আৱ কি মিত্রানী সম্পর্কে।

ক্ষণকাল সুহাস মিত্র কিরীটীৰ মুখেৰ দিকে তাকিয়ে রইলো—তাৰপৰ শাস্ত গলায় বললে, তা শুনতে পাৱি কি—কি প্ৰশ্ন আপনাৰ মিত্রানী সম্পর্কে? অবশ্যি উভৰ আমাৰ জানা থাকলে নিশ্চয়ই পাৰেন।

ধন্যবাদ।

কিন্তু কিরীটীবাবু, কি হবে আৱ তাৰ কথা জেনে। সে তো আজ অতীত। কোনদিনই সে ফিরে আসবে না।

শেষেৰ দিকে কিরীটীৰ যেন মনে হলো, সুহাস মিত্রেৰ গলাটা যেন কেমন ৰংঢ় হয়ে এলো।

সুহাসবাবু, আপনি তো তাৰ একসময় সহপাঠী ছিলেন—অনেক দিনেৰ পৰিচয় আপনাদেৱ ছিল—কিছুটা হয়ত ঘনিষ্ঠতাৰে ছিল—

না। পৰিচয় ছিল ঠিকই—তবে ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছুই ছিল না।

আপনি তাকে—মানে মিত্রানীকে ভালবাসতেন?

সাধাৰণ একজন মার্চেন্ট অফিসেৰ কেৱলৰ ভালবাসা কি আজকেৰ দিনে ভালবাসা!

টাকা-পয়সা-মান-সম্পদ বা মৰ্যাদা দিয়ে তো ভালবাসাৰ বিচাৰ হয় না। যাক সে কথা, আপনি কি কখনো তাকে আপনাৰ মনেৰ কথা জানিয়েছেন?

না।

কেন?

প্রয়োজন বোধ করিনি শেষ পর্যন্ত—

কেন প্রয়োজন বোধ করেননি?

কথনো কথনো মনে হতো বলি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জানতে পারলাম—সে অন্য একজনকে ভালবাসে—

কি করে ডানলেন? নিশ্চয়ই কেউ আপনাকে বলেছিল?

ধরে নিন তাই!

কিন্তু সে যে সত্য বলেছে তার প্রমাণ কি আপনি কিছু পেয়েছিলেন?

সত্য যা তার কি আবার কোন প্রমাণের দরকার হয় কিরীটীবাবু! ও-কথা থাক। আর কি আপনার জানবার আছে বলুন।

সেদিন যখন বড় ও ধূলোর অঙ্ককারে সকলের কাছ থেকে ছিটকে পড়ে অঙ্গের মত পথ ঝুঁঁজে পাওয়েছিলেন না, তখন আপনার আশেপাশে আর কারো গলা শুনছিলেন বা আর কারোর সাড়া পেয়েছিলেন কিংবা কারো কোনরকম চিৎকার বা আর্তনাদ আপনার কানে এসেছিল সুহাসবাবু?

না, তাছাড়া আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই একটা ভারী গাছের ডালের তলায় অকস্মাত আমি চাপা পড়েছিলাম, সব অঙ্ককার হয়ে যায়—আমি জ্ঞান হারাই।

আচ্ছা ঠিক যে মুহূর্তে ঝড়টা ওঠে, তখন আপনার আশেপাশে কারা ছিল মনে আছে?

হাত দুয়েকের মধ্যে ছিল বিদুৎ, আর তারই পাশে ছিল বোধ হয় মির্তানী—

আর কাজল বোস?

ঠিক মনে নেই—তবে কাজল বোধ হয় আমার কাছাকাছিই ছিল।

হ্যাঁ। আর একটা কথা। সেদিন যতক্ষণ গার্ডেনে ছিলেন, দূরে বা কাছে কোন তৃতীয় কাউকে আপনার নজরে পড়েছিল কি—যার মাথায় ধরন একটা বেত্তের টুপি ছিল আর হাতে বা গলায় একটা বায়নাকুলার ঘোলানো ছিল?

বায়নাকুলার—বায়নাকুলার, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সকলে যখন গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি, যেন একজনকে মুখে চাপদড়ি, চোখে রঙিন চশমা, পরনে কালো প্যান্ট ও গায়ে স্ট্রাইপ দেওয়া একটা হাওয়াই শার্ট দেখেছিলাম বার দুই—ভদ্রলোক বায়নাকুলার দিয়ে গঙ্গার মধ্যে যেন কি দেখেছিলেন—আমাদের কিছুটা দূরেই—আপনার পরিচিত কেউ নন?

না। তাছাড়া পরিচিত হলে তো আমাদের কাছে বসতো।

ঝড়টা যখন ওঠে তখন তাকে দেখেছিলেন?

ঠিক তেমন নজর করিনি—নিজেরাই হঠাৎ ধূলোয় পড়ে বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম—

আচ্ছা সুহাসবাবু, আপনি নিশ্চয় ঝমাল ব্যবহার করেন? কিরীটীর প্রশ্ন।

করি বৈকি।

সেদিন নিশ্চয়ই আপনার পকেটে ঝমাল ছিল?

ছিল।

সিলকের ঝমাল ছিল কি সেটা?

না মশাই, সাধারণ ক্যালিকোর রুমাল একটা—সাদা।

আপনার রুমালের কোণে নাম লেখা থাকত বা কোন চিহ্ন?

হ্যাঁ—আমার ডাক নাম টুটু—ইংরাজীতে ‘টি’ অক্ষরটা লেখা থাকত।

হঠাৎ পকেট থেকে একটা সিঙ্কের রুমাল বের করলো কিরীটী—সাধারণ জেন্টস রুমালের সাইজের থেকে সামান্য একটু বড়—তার এক কোণে ইংরাজী ‘টি’ অক্ষরটা সবুজ সুতো দিয়ে বোনা। বললে, দেখুন তো, এই রুমালটা একবার!

দেখি রুমালটা, রুমালটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে সুহাস বললে, আশ্চর্য!

কি হলো?

রুমালটা আমারই মনে হচ্ছে—কিন্তু,— রুমালটা কিরীটীর হাতে আবার ফিরিয়ে দিল সুহাস।

আপনারই রুমাল! এটা তো সিঙ্কের?

হ্যাঁ গত বছর কাজল আমার জন্মদিনে সবুজ সুতো দিয়ে ‘টি’ লিখে এই রুমালটাই আমাকে উপহার দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পিকনিকের দিন দুই আগে কোথায় যে রুমালটা ফেললাম আর খুঁজে পাই নি, অথচ মনে আছে সেটা অফিসে আমার পকেটেই ছিল।

ঠিক বলেছেন—ঠিক চিনতে পেরেছেন ওটা আপনারই রুমাল?

হ্যাঁ—তাছাড়া দেখুন ওর এক কোণে লাল কালির একটা দাগ আছে—

কথাটা মিথ্যা নয়, কিরীটী দেখতে পেল, সত্যিই এক কোণে একটা লাল কালির দাগ আছে রুমালটায়।

কিন্তু এটা—এটা আপনি পেলেন কোথায় কিরীটীবাবু? ব্যগ্র কঠেই প্রশ্ন করে সুহাস মিত্র কিরীটীকে।

এই রুমালটাই পাকিয়ে ফাঁস দিয়ে মিত্রানীকে সেদিন—

না-না-না—একটা যেন চাপা আর্তনাদ করে ওঠে সুহাস, না, না, না।

কিরীটী তাড়াতাড়ি রুমালটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর শান্ত গলায় ডাকল, সুহাসবাবু?

অ্য়।

আপনার ফেবারিট ব্রাউন সিগারেট চার্মিনার, তাই না?

হ্যাঁ—

দিনে কতগুলো সিগারেট খান?

তিন-চার প্যাকেট।

আচ্ছ আপনি মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারে দলের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করেন?

আমাদের দলের মধ্যে—না, না—এ অসম্ভব—

কিন্তু পুলিসের ধারণা, সেদিন আপনাদের মধ্যেই কেউ—

হরিব্ল! কি বলেছেন আপনি?

আমার কি ধারণা জানেন?

কি?

ঐ ধূলোর ঘড় আর অঙ্ককারের ভেতরেও আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ

কিছু অস্পষ্টভাবে দেখেছেন বা শুনেছেন, যেটা সেদিন আপনাদের জবানবন্দিতে কেউই আপনারা সুশীল নন্দীর কাছে প্রকাশ করেননি—অথচ যে কথাটা জানতে পারলে মিত্রানীর হত্যাকারীকে ধরার ব্যাপারে হয়ত অনেক সাহায্য পেতো পুলিস!

আমি—আমি—আমার কথা আমি বলতে পারি—অস্তত আমি কিছু আপনাদের কাছে গোপন করিনি—সুহাস মিত্র বলে উঠলো জবাবে—

কিরীটী তার কথাটার আর জের টানলো না। সে সম্পূর্ণ অন্য এক প্রশ্ন করলো।
বললে, আচ্ছা সুহাসবাবু, কাজল বোস সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

সুহাস মিত্র প্রথমটায় কিছু সময় চুপ করে রইলো তারপর ধীরে ধীরে বললে, মিত্রানীকে ও বোধ হয় একটু হিংসা করতো—

সেটা ওর সঙ্গে আমি কথা বলেই বুঝতে পেরেছি—তা নয়, আমার প্রশ্ন আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

কি?

উনি আপনাকে ভালবাসেন।

জানি।

ওঁর প্রতি আপনার মনোভাবটা বোধ হয় বিপরীত?

আমি ওকে ঠিক পছন্দ করি না।

তার কোন কারণ আছে?

আসলে ও দেহে মেয়েছেলে হলেও মনের গঠনের দিক দিয়ে ঠিক যেন তা নয়—
যাদার ওর মধ্যে একটা যেন পুরুষাঙ্গী ভাব আছে—

মৃদু হেসে কিরীটী বললে, আপনি যে মিত্রানীকে মনে মনে ভালবেসেছিলেন, সেটা বোধ হয় উনি অনুমান করতে পেরেছিলেন!

মিত্রানীর প্রতি আমার মনোভাব তো কখনো ঘুণাঘুণেও কারো কাছে আমি প্রকাশ করিনি—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ভালবাসার ব্যাপারটা মুখ ফুটে প্রকাশ না করলেও মেয়েদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না সুহাসবাবু।

॥ এগার ॥

কিরীটী আর সুত্রত সেদিন যখন উঠবে-উঠবে করছে, বিদ্যুৎ সরকার এলো।

সবাই তখন চলে গিয়েছে।

বিদ্যুৎ ঘরে চুকে বললে, সুশীলবাবু, আমি অত্যন্ত দুঃখিত—বিশেষ কাজে আটকা
পড়ায় আসতে দেরী হয়ে গেল।

সুশীল নন্দী বললেন, ঠিক আছে, বসুন—আলাপ করিয়ে দিন—ইনি—বিদ্যুৎ
সরকার আর বিদ্যুৎবাবু, এঁকে চাক্ষুষ দেখেছেন কিনা জানি না, তবে নিশ্চয়ই এঁর নাম
শুনেছেন—কিরীটী রায়।

নমস্কার। ওঁর নাম আমি বহুবার শুনেছি মিত্রানীর মুখে। আজই সকালে মিত্রানীর দাদা
কিরীটী অমনিবাস (১৩)—৪

প্রগবেশবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে যথন কথা হচ্ছিল, উনি বললেন, মিত্রানীর মৃত্যুর ব্যাপারটা উনি তদন্ত করছেন।

কিরীটী বললে, মিত্রানীর বাবা অবিনাশবাবুর কাছে একসময় আমি পড়েছি—স্বল্পে উনি আমাদের অঙ্গের মাস্টার ছিলেন।

বিদ্যুৎ সরকার কিরীটীর মুখোমুখি একটা থালি চেয়ার টেবে নিয়ে বসল, উঃ, কি প্রচণ্ড গরম—

কিরীটী বললে, আজও সকালবেলায় কাগজে ছিল সন্ধ্যার দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ এক পশলা বড়-বৃষ্টি হতে পারে—

বিদ্যুৎ বললে, ছিল নাকি! আমি দেখিনি। সচরাচর ওদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস বড় একটা মেলে না বলে আমি কখনো ও-সব দেখি না বা থাকলেও গুরুত্ব দিই না—

একেবারে যে মেলে না নয়, কিরীটী বললে, সেদিন কিন্তু পূর্বাভাস ঠিক মিলে গিয়েছিল—আর তাতেই হতাকারীর পূর্ব পরিকল্পনা সাক্ষেসফুলও হয়েছিল।

চকিতে বিদ্যুৎ সরকার কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী একটা সিগার ধরানোর ব্যাপারে ঐ মুহূর্তে ব্যস্ত থাকায় ব্যাপারটা তার নজরে না পড়লেও সুব্রত দৃষ্টি কিন্তু এড়ায় না।

আরো কিছুক্ষণ পরে কিরীটী ও বিদ্যুৎ সরকারের মধ্যে কথা হচ্ছিল। বিদ্যুৎ সরকার যে অবস্থাপম পরিবারের ছেলে, সেটা তার চেহারা ও পোশাকেই কিছুটা যেন ধরা যায়। যেমন গাত্রবর্ণ, তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। চেহারার মধ্যে একটা যেন বনেদী ছাপ আছে।

বিদ্যুৎবাবু, আপনার সঙ্গে তো প্রায়ই মিত্রানীর টেলিফোনে কথাবার্তা হতো?

হ্যাঁ—মধ্যে মধ্যে হতো।

কিছুটা আপনাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল ধরে নিতে পারি বোধ হয়—কিরীটী বললে।

ঘনিষ্ঠতা বলতে আপনি কি মীন করছেন জানি না কিরীটীবাবু—তবে আমাদের পরম্পরের মধ্যে কিছুটা হৃদ্যতা ছিল। আমাদের কলেজ-লাইফে আরো সহপাঠিনী ছিল কিন্তু মিত্রানীকে আমার বরাবরই ভাল লাগতো ওর মিঞ্চকে সরল মিষ্টি স্বভাবের জন্য—মনের মধ্যে কোন মার প্যাচ ছিল না।

আচ্ছা মিত্রানীর আপনাদের ছেলেদের মধ্যে কারোর প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ বা তার প্রতি কারো ছিল বলে আপনার মনে হয়? আপনারা তো পরম্পরের অনেক দিনের পরিচিত!

মিত্রানীর ঠিক সে রকম কারোর প্রতি ছিল বলে কখনো আমার মনে হয়নি। তবে মিত্রানী বরাবর যেমন লেখাপড়ায় ভাল ছিল, আমাদের দলের সুহাসও তাই ছিল—কলেজ-লাইফে লাইব্রেরীতে ওদের দুজনকে অনেক দিন বসে গভীর আলোচনারত দেখেছি—আর বিশেষ কিছু তেমন চোখে পড়েছে বলে তো মনে পড়ছে না। তারপর একটু থেমে বিদ্যুৎ বললে, তবে ইদানীং বছর তিনিকের বেশী কলেজ ছাড়বার পর বিশেষ তেমন একটা দেখাশোনা হতো না—ঐ সময়ে যদি কিছু হয়ে থাকে তো বলতে পারবো না।

আচ্ছা বিদ্যুৎবাবু, দৃষ্টিনার দিন হঠাত যখন ধূলোর বাড় উঠে চারিদিক ঢেকে গেল—আপনারা সকলেই পরম্পরের কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে গেলেন কিছু সময়ের জন্য, তখন কারো কোনরকম চিৎকার বা গলার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কি?

না তো? তবে আমার মনে হচ্ছে, একটা কথা যা সেদিন সুশীলবাবুকে বলিনি, সেটা বোধ হয় আমার বলা ভাল—

কি কথা?

বড় ওঠবার পরই যখন হাতড়াতে হাতড়াতে কোনঙ্গমে সেই ধূলোর ঘূর্ণির অন্ধকারের মধ্যে এগুচ্ছ, মনে হয়েছিল যেন কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল—আমি ‘কে’ বলে চেঁচালাম, কিন্তু কারো সাড়া পেলাম না। তারপরই আরো কয়েক পা অন্ধের মত এগুতেই একটা যেন ঝটাপটির শব্দ আমার কানে এসেছিল, কিন্তু চোখে ধূলো ঢোকায় চোখ দুটো এত কর-কর করছিল, এত জুলা করছিল যে, নিজেকে নিয়েই তখন আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি—

কেউ আপনাকে ধাক্কা দিয়েছিল? একটা ঝটাপটির শব্দ শুনেছিলেন?

হ্যাঁ।

বড় ওঠবার মুহূর্তে আপনি মিত্রানীকে দেখতে পেয়েছিলেন, সে কোথায় কত দূরে ঠিক কার পাশে ছিল?

মিত্রানী ঠিক বোধ হয় আমার পাশেই ছিল।

আর কাজল বোস?

সে বোধ হয় সুহামের কাছাকাছিই ছিল।

আচ্ছা বিদ্যুৎবাবু, আর একটা কথা, সেদিন আপনাদের আশেপাশে মুখে চাপদাঢ়ি, চোখে রঙিন কাচের চশমা, মাথায় বেতের টুপি, হাতে বা গলায় ঘোলানো একটা বায়নাকুলার—এমন কাউকে দেখেছিলেন কি? পরনে কালো প্যান্ট, গায়ে স্ট্রাইপ দেওয়া একটা হাওয়াই শার্ট—

না—সে রকম তো কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আমরা নিজেদের নিয়ে এত অশঙ্খ ছিলাম যে—

বুঁৰেছি, আশেপাশে তাকাবার ফুরসুৎ পাননি। তাই না?

হ্যাঁ।

আপনার বায়নাকুলার আছে বিদ্যুৎবাবু?

না।

আপনাদের দলে কারোর আছে?

বলতে পারবো না।

আপনি সিগেট খান?

মাঝে-মধ্যে—

কি ব্রান্ড?

কোন স্পেশ্যাল ব্রান্ড নেই—একটা হলেই হলো, ঠিক নেশায় তো ধূমপান করি না, এমনি শখ করে দু একটা খাই। তারপরই একটু থেমে বিদ্যুৎ সরকার বললে, দেখুন মিঃ

রায়, আপনি মিত্রানীর মৃত্যুর ব্যাপারটা একটু আগে বলেছিলেন, হত্যাকারীর পূর্বপরিকল্পিত—সত্ত্বিই কি আপনি তাই মনে করেন?

করি।

ও! আচ্ছা, আপনার কি আমাদের মধ্যে সত্ত্বিই কাউকে সন্দেহ হচ্ছে—

আপনার কাছে মিথ্যা বলবো না বিদ্যুৎবাবু, সেই রকমই আমার সন্দেহ হয়।

মানে অনুমান—

আচ্ছা বিদ্যুৎবাবু, রাত অনেক হনো—এবার আমি উঠবো। চল সুব্রত—

কিরীটী হঠাতে উঠে দাঁড়াল। সুব্রতও উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে।

॥ বারো ॥

ছুটির দিন বলেই হয়ত রাষ্ট্রায় অত্যন্ত ভিড়—ওদের গাড়ি কেবলই ধামছিল সামনের ভিড়ের চাপে। গাড়ি এক সময় হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে ডাইনে স্ট্র্যান্ড রোড ধরলো।

হঠাতে কিরীটীর কথা শুনে তাকাল ওর দিকে সুব্রত।

সুব্রত!

কিছু বলছিস?

সকলের কথাই তো মোটামুটি শুনলি—

আমি সকলের কথা মন দিয়ে শুনিনি—জনাতিনেক ছাড়া—মৃদুকষ্টে সুব্রত বললে।

তিনজন কে কে?

সুহাস মিত্র, বিদ্যুৎ সরকার ও কাজল বোস—

ছঁ। আর কারো কথাই তাহলে তুই মন দিয়ে শুনিসনি। কান দিসনি—

না।

তবে আমার মনে হয়, যা জানতে আজ আমরা ওদের ডেকেছিলাম—তার মধ্যে কিছুটা হয় তো মিস করেছিস।

কি বলতে চাস তুই?

মানুষের মুখ যদি তার মনের ইনডেক্স হয়—একজনকে তুই মিস করেছিস মানে তার মনের কথাটা পাঠ করা হয়নি তোর।

যথা?

এখন আর তার কথা তুলে লাভ নেই—কারণ সেই বিশেষ ব্যক্তিটির কথাগুলো না শোনা থাকলে তার কথার তাংপর্যই হয়ত ঠিক তুই বুঝতে পারবি না। থাক সে কথা—যদের কথা তুই মন দিয়ে শুনেছিস, মানে তোর ঐ সুহাস মিত্র, বিদ্যুৎ সরকার ও কাজল বোস, তাদের সম্পর্কে তোর কি ধারণা তাই বল।

সুহাস মনে হলো সত্ত্বিই মিত্রানীকে ভালবাসত—মিত্রানীর মৃত্যুতে সে অত্যন্ত শক পেয়েছে।

আর কাজল বোস?

বেচারী সুহাসকে সে অঙ্কের মতই ভালবাসে, অথচ সুহাস মনে হলো কাজলকে সহাই করতে পারে না যেন।

ଠିକ । ଆଛା ଆର କେଉ ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ମିତ୍ରାନୀକେ ଭାଲବାସତୋ ବଲେ ତୋର ମନେ ହୁଯ ? ମେ ରକମ କିଛୁ ତୋ ମନେ ହଲୋ ନା ।

କିନ୍ତୁ ଆମାର ମନେ ହଲୋ—

କି ମନେ ହଲୋ ତୋର ?

ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଆରୋ ଏକଜନ ମିତ୍ରାନୀକେ ପେତେ ଚେଯେଛିଲ ବୋଧ ହୁଯ—ର୍ୟାଦାର ହି ଶୁଯାନଟେଡେ ଟୁ ହ୍ୟାଭ ହାର ।

କେ, କାର କଥା ବଲଛିମ ?

ସଜଳ ଚକ୍ରବତୀ—କାଜେଇ ଦୁଃଜନାର ଆକର୍ଷଣ ଏକଜନେର ବିକର୍ଷଣେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଏକଟା ଜଟିଲ ତ୍ରିକୋଣ ଗଡ଼େ ଉଠେଛିଲ ହୁଯାତ ।

ଜଟିଲ ତ୍ରିକୋଣ !

ହଁ—ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣେର ତ୍ରିକୋଣ ! ଆର ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣେରଟି ଫଳ ଆମାର ମନେ ହଞ୍ଚେ ଏଥନ ଐ ନିଷ୍ଠାର ହତ୍ୟା । କିଂବା ବଲା ଚଲେ ଐ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣେର ମଧ୍ୟେଇ ମିତ୍ରାନୀର ନିଷ୍ଠାର ହତ୍ୟାର ବୀଜଟି ରୋପିତ ହୁଯେଛିଲ । ଏଥନ କଥା ହଞ୍ଚେ, ମିତ୍ରାନୀ ବ୍ୟାପାରଟା ଜାନତ କିନା । ଏବଂ ଯଦି ଜେନେ ଥାକତ, ସେ କିଭାବେ ବ୍ୟାପାରଟା ନିଯେଛିଲ ।

ଆରୋ ଏକଟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ବଲ କିରାଟୀ ।

ଆପାତଦୃଷ୍ଟିତେ ଭାଲବାସା ଓ ସ୍ଥାନ ଯଦିଓ ଦୁଟି ବିପରୀତ ବଞ୍ଚି—ତାହଲେଓ ଦେଖା ଯାଯ, ଭାଲବାସା ଥିକେ ଯେମନ ସ୍ଥାନର ଜୟ ହତେ ପାରେ, ତେମନି ସ୍ଥାନରେ ପିଛନେ ଅନେକ ସମୟ ଅବଚେତନ ମନେ ଥାକେ ଐ ଭାଲବାସାଇ । ଏଥନ କଥା ହଞ୍ଚେ ଦୁଇନେର ଭାଲବାସାଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଲବାସାଇ ଛିଲ, ନା କ୍ରମଶ ଏକଦିନ ସ୍ଥାନର ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଯେଛିଲ । ଅଥବା ପ୍ରଥମ ଥିକେଇ ଜୟ ନିଯେଛିଲ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହୁଯେଛିଲ ଭାଲବାସା ! ପରମ୍ପର-ବିରୋଧୀ ଦୁଟି ବଞ୍ଚି—ଭାଲବାସା ଓ ସ୍ଥାନ । ତାଇ ପ୍ରଥମଟାଯ ମିତ୍ରାନୀର ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପାରଟା ଯତଟା କଠିନ ବା ଜଟିଲ ଭାବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଥନ ମନେ ହଞ୍ଚେ ବ୍ୟାପାରଟା ବେଶ ଜଟିଲ ।

ମନେ ହଞ୍ଚେ ହତ୍ୟାକାରୀ ତୋର କାହେ ଏଥନ ଖୁବ ଏକଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନେଇ ।

ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନା ଥାକଲେଓ ଏଥନେ ଖୁବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଯ ଓଠେନି । ସୁହାସ ମିତ୍ରେର କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଯ, କାକେ ସେ ମେଦିନି ଦେଖେଛିଲ କିଛୁକୁରେ ମୁଖେ ଚାପଦାଢ଼ି, ଚୋଖେ ରଙ୍ଗିନ ଚଶମା, ମାଥାଯ ବେତେର ଟୁପି, ପରନେ କାଳୋ ପାନ୍ଟ ଓ ସ୍ଟ୍ରୀଟିପ ଦେଓଯା ହାଓୟାଇ ଶାର୍ଟ, ହାତେ ବାଯନାକୁଲାର ଏବଂ ଯେ ବାଯନାକୁଲାର ଓ ବେତେର ଟୁପି ଅକୁଷ୍ଟଲେ ପାଓୟା ଗିଯେଛେ ମେଣ୍ଟଲୋର ସଙ୍ଗେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋନ ସମ୍ପର୍କ ଆହେ କିନା ! ତୋର କି ମନେ ହୁଯ ? ସମ୍ପର୍କ ଆହେ ?

ଯଦି ଥାକେଇ ତୋ ବ୍ୟାପାରଟା ଠିକ ମେଲାତେ ପାରଛି ନା—ବେତେର ଟୁପିଟା ମାଥା ଥିକେ ପ୍ରବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବତ୍ତେର ମଧ୍ୟେ ହୁଯାତ ଉଡ଼େ ଯେତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଯନାକୁଲାରଟି—ମେଟା—ମେଟାଇ ବା ଓଥାନେ, ମାନେ ଐ ସ୍ପଷ୍ଟେ ଏଲୋ କି କରେ ? ବ୍ୟାପାରଟା କି ଏକଟା ଅସାବଧାନତା ନା ଇଚ୍ଛାକୃତ, ଅସାବଧାନତା ହୁଓୟା ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଉଚିତ ନୟ, ଆର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଯଦି ହୁଯେଇ ଥାକେ ତାହଲେ—

ନିଜେର ଅପରାଧେର ଦାୟିତ୍ବଟା କାରୋ କାଁଧେ ଚାପନୋର ଇଚ୍ଛା ଛିଲ ହୁଯାତ ତାର ।

ଠିକ, କିନ୍ତୁ କାର କାଁଧେ—କିରାଟୀ କଥାଗୁଲୋ ବଲତେଇ ଯେନ କେମନ ଚୁପ କରେ ଯାଯ ।

ଗାଡ଼ି ତଥନ ରେଡ ରୋଡ ଧରେ ଛୁଟେ ଚଲେଛେ ।

ହୁ-ହୁ କରେ ଗାଡ଼ିର ଖୋଲା ଜାନାଲା ପଥେ ହାଓୟା ଚୁକଛେ ।

কিরীটীর গলার দ্বর আবার শোনা যায়, প্রবাবিলিটি মোটিভ কাকে সব চাইতে বেশী
ফিট ইন্ করে—

তোর কি তাহলে হির ধারণা কিরীটী—ওদেরই মধ্যে একজন—

আগে সন্দেহ থাকলেও এখন সন্দেহ মাত্র নেই সুব্রত—ওয়ান অফ দেম—হাঁ, ওদেরই
মধ্যে একজন।

কে?

কে তা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না বটে সুব্রত এবং মণিমু জ্ঞ, ফিটীশ চাকী,
অমিয় রায়, সতীন্দ্র সান্যাল ও পাপিয়া চক্রবর্তীকে আমি বাদ দিয়েছি—এবং ওদের বাদ
দেওয়ার কারণও আমি আজই ব্যাখ্যা করোছি, শুনেছিস—

হাঁ—তাহলে—বাকী তিনজনের মধ্যেই—

তিনজন তো ঠিক নয়!

তবে?

বল চারজন—বিদ্যুৎ সরকার, সুহাস মিত্র, কাজল বোস আর—

আর আবার কে? তুমি কি তাহলে সজল চক্রবর্তীকেও ঐ লিস্টে ফেলতে চাও? কিন্তু
সে তো ঐ দিন কলকাতাতেই ছিল না—ভোরের প্লেনেই ফ্লাই করে চলে গিয়েছিল।

জানি, তবে সেটা এলিবিও হতে পারে—কিন্তু আমি ঠিক এই মুহূর্তে তার কথা
ভাবছি না—ভাবছি সেই মুখে চাপদাঙ্গি, রঙিন চশমা চোখে, মাথায় বেতের টুপি, পরনে
কালো প্যান্ট ও স্ট্রাইপ দেওয়া হাওয়াই শাট ও গলায় বা হাতে বায়নাকুলার—যাকে
সুহাস মিত্র দেখেছিল—বিরীটী একটু থেমে বেন বলতে লাগল—

কে? কে সে? তার উপস্থিতিটা ঐন্দ্রিয় একটা নিছক ঘটনাই, না উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—
তোর মাথায় দেখছি ঐ অঙ্গাত বাঞ্ছিটির ভৃত চেপেছে!

ভৃত নয় সুব্রত ভৃত নয়, আমার মন বলছে—মিত্রানীর ঐ ত্রিকোণের সঙ্গে কোথাও
ঐ মুখে চাপদাঙ্গি, রঙিন চশমাধারীর অদৃশ্য যোগাযোগ রয়েছে—হয়ত বা রহস্যের সেই
নিউক্লিয়াস।

গাড়িটা এ সময় ধীরে ধীরে থেমে গেল।

কিরীটী আর সুব্রত দেখলো, গাড়ি বাড়ির দরজায় পৌছে গিয়েছে।

॥ তেরো ॥

পরের দিন ভোরবেলাতেই কিরীটী মিত্রানীদের ওখানে গিয়ে হাজির হলো। গতরাত
থেকেই তার মনে হয়েছে মিত্রানীর ঘরটা একবার তার দেখা দরকার।

দোতলায় উঠতেই মাস্টারমশাই অবিনাশ ঘোষালের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।
অবিনাশ ঘোষাল বারান্দায় পায়চারি করছিলেন।

কিরীটী—

মাস্টারমশায় আমি একবার মিত্রানীর ঘরটা দেখবো বলে এলাম।

বেশ তো। যাও—ঐ যে সামনের ঘরটাই, দরজা ভেজানো আছে মাত্র, সে চলে
যাওয়ার পর থেকে কেউ আর ঐ ঘরে ঢোকেনি। কিরীটী—

বলুন মাস্টারমশাই—

তুমি তো আজন্ম ভট্টিল রহস্যের মীমাংসা করছো। জীবনে অনেক গহ্বিততম অপরাধের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে—

হ্যাঁ মাস্টারমশাই—আমাদের চারপাশের মানুষগুলো যাদের আমরা নিতা দেখি—যাদের সঙ্গে হয়ত কথা বলি, হন্দ্যতা করি, ভালবাসি—তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ ঘৃণ্যতম অপরাধে যখন চিহ্নিত হয়, আমরা বিস্মিত হই, আঘাত পাই—কিন্তু বিচার করে দেখতে গেলে আঘাত পেলেও বিস্ময়ের তো কিছু নেই মাস্টারমশাই—

নেই বলছো?

না, কারণ আমাদের পরিচয় মানুষের বাইরের জগতের সঙ্গেই—তার মনোজগতের বিশেষ করে অবচেতন মনের খবর আমরা কিছুই তো পাই না। সেখানে কার মন কোন্‌ পথে চলেছে, কোন্ ভট্টিল আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটির সংবাদ তো আমরা পাই না। এই মুহূর্তে আমার মনের কথাটা কি আপনার জানা সম্ভব!

ঠিক—ঠিক বলেছো কিরীটি—নচেৎ একজনকে হত্যা করে তার দেহের উপরে জ্বন্য কৃত্তিম অতোচার—

আপনি—আপনি কি করে জানলেন কথাটা মাস্টারমশাই?

জেনেছি কিরীটি, প্রণবেশই আমাকে বস্থিল।

ঐ মুহূর্তে কিরীটি অবিনাশ ঘোষালের কথাটার জবাব না দিতে পারলেও পরে দিয়েছিল।

কিরীটি চৃপ করে ধাকে এবং কিরীটাকে চৃপ করে ধাকতে দেখে অবিনাশ ঘোষাল বললেন, মিতা মাকে আমি আর ফিরে পাব না জানি—কিন্তু তুমি যদি সেই পিশাচটাকে ধরতে পার— তাকে ক্ষমা করো না—ক্ষমা করো না কিরীটি—

কিরীটি এবারেও অবিনাশ ঘোষালের কথার জবাব দিল না—কেবল বললেন, মিত্রানীর ঘরটা একবার আমি দেখে আসি মাস্টারমশাই—

অবিনাশ ঘোষাল আর কোন কথা বললেন না। বাইরের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় প্রাণপণে নিজের বুকের অদ্বিতীয়টাকে দমন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিরীটি আর একবার সেই শোকে-দৃঢ়থে মুহূর্মান মানুষটির দিকে তাকিয়ে নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে গিয়ে চুকল দরজার কপাট ঠেলে।

ঘরের জানালাগুলো বন্ধ ছিল। গোটা দুই জানালা খুলে দিতেই দিনের আলো অঙ্ককার ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। নিঃশব্দে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতেই সিংগল খাটটার প্রায় কাছাকাছি, লেখাপড়ার টেবিলটার পাশে একটা ত্রিকোণ বুক-সেলফের প্রতি তার নজর পড়ল। থমকে যেন দাঁড়াল কিরীটি।

ত্রিকোণ বুক-সেলফটার উপরে একটা সুদৃশ্য ধূপাধাৰ—তার পাশেই একটি কার্যকার্যখচিত ফটো-ফ্রেমের মধ্যে মিত্রানীর ফটো। মিত্রানী তারই দিকে চেয়ে যেন মৃদু হাসছে।

কয়েকদিন আগেও মেয়েটি জীবিত ছিল—আজ আর নেই। অতীব নিষ্ঠুরভাবে একটা সাদা সিঙ্কের ঝুমাল পাকিয়ে তারই সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে।

রুমালটার কোণে সবুজ সুতো দিয়ে লেখা ইংরাজী অক্ষর ‘টি’। মনে পড়ছে ঐ সঙ্গে এক তরুণীর বুকভরা ভালবাসার উপহার তারই প্রেমাস্পদকে। কাজল বোসের দেওয়া উপহার সুহাস মিত্রকে, সুহাস মিত্র নাকি পিকনিকের—অর্থাৎ ঐ দুর্ঘটনার দিন দুই আগে কোথায় হারিয়ে ফেলে।

সুহাস মিত্র কি সত্য কথা বলেছে! যদি সত্যিই বলে থাকে তো রুমালটা হত্যাকারীর হাতে কিভাবে গেল!

তবে কি—তবে কি হত্যাকারী ইচ্ছা করেই রুমালটা চুরি করেছিল? হত্যা করবার জন্য তো সে অন্য কোন রুমালও ব্যবহার করতে পারত। এই বিশেষ রুমালটিরই বা তার প্রয়োজন হলো কেন! একটি—একটিমাত্র কারণই থাকতে পারে তার, হত্যাকারী চেয়ে-ছিল যাতে করে মিত্রানীর হত্যার সন্দেহটা সুহাস মিত্রের উপরে গিয়ে পড়ে।

কিরীটী মনে মনে হাসে। হত্যাকারী তার পরিকল্পনা মত মিত্রানীকে যে কারণেই হোক হত্যা করতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং যেটা সে কিরীটীর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণকে এড়িয়ে যেতে পারে নি, হত্যাকারী বাইরের বা সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ নয়—সে এমন একজন যার কেবল সুহাস মিত্রের বাড়িতে অবাধ গতিবিধি ছিল তাই নয়—সে সুহাসদের অনেক কথাই জানত, ওদের সকলকার ভিতরের খবর এবং সেটা একমাত্র জানা সম্ভব ছিল এই নয়জনেরই—হ্যাঁ, সেইখানেই কিরীটী নিঃসন্দেহ ওদের মধ্যেই কেউ একজন হত্যাকারী। গত রাত থেকেই কিরীটীর মনের মধ্যে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। প্রবাবিলিটি, চান্স ও মোটিভের দিক থেকে এই নয়জনের মধ্যে কার উপরে বেশী সন্দেহ পড়ে!

কে? কে? দলের প্রত্যেকেই এক-একজন করে তার মনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে গতকাল। আর তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজেকে নিজে একটাৰ পৰ একটা প্রশ্ন করে গিয়েছে কিরীটি।

পারে নি—এখনো পারেনি শক্ত মুঠোর মধ্যে একজনকে ধরতে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল টেবিলটার সামনে কিরীটী। নানা ধরনের বই খাত্তাপত্র—বোৰা যায় রীতিমত পড়ুয়া ছিল মেয়েটি। খাতা বই ড্রয়ার প্রভৃতি ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা মেটা সুদৃশ্য সবুজ মলাটের খাতা কিরীটীর হাতে এলো।

খাতার কয়েকটা পাতা উল্টোতেই কিরীটী বুঝতে পারল সেটা একটা ডাইরী। মুক্তার মত সুন্দর হাতের লেখা—পাতার পৰ পাতা লেখা। প্রথম দিকে বিশেষ কোন তারিখ নেই, যাও আছে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে—কিন্তু শেষের দিকে তারিখগুলো দেওয়া আছে। একেবারে শেষ পাতার তারিখটার দিকে তাকিয়ে যেন চমকে ওঠে কিরীটি—

১০ই মে, বুধবার, রাত দশটা পঞ্চাম, আজ সজল হঠাৎ সকালে এসে হাজির। আশ্চর্য হইনি কিছু—সজল যে একদিন আসবে জানতাম এবং সে যে প্রস্তাৱ কৰবে তাও জানতাম। আমার অনুমানটি যে মিথ্যা নয় সেটাই প্রমাণিত হলো। তার প্রশ্নের জবাবে বলতে বাধ্য হলাম তার প্রস্তাৱ আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমি অন্যের বাগদত্তা কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বললাম, মন জানাজানিৰ পালা এখনো চলেছে। ভাবছি বলে দিলেই হতো স্পষ্ট করে, সুহাসের প্রতীক্ষায় আমি আজও আছি—তার কাছেই আমি বাগদত্ত।

ও যখন চলে যায় ওর মুখের দিকে তাকাতে আমার কষ্ট হচ্ছিল—কিন্তু ঐ ভাবে আমাকে পীড়াপীড়ি না করলে আজ ওর কাছে যতটুকু বলেছি সেটুকুও কখনো কারো কাছে প্রকাশ করতাম না।

কিরীটী পড়ে চলে।

ঐ পর্যন্ত ঐ পাতায়। তার পরের পাতায় একেপাশে কেবল তারিখ দেওয়া আর লেখা রাত্রি, ১৩ই মে, শনিবার।

পরশুদিন সুহাস ফোন করেছিল—সকালে। সে তো কখনো আমাকে আজ পর্যন্ত ফোন করেনি—এই তার আমাকে প্রথম ফোন।

মিত্রানী—

বল।

বলছিলাম—মানে সজল কি তোমাকে কিছু বলেছে?

বুঝতে পারলাম না সুহাসকে কি জবাব দেবো, সজল গতকাল আমাকে যে কথাটা বলেছিল, সেটা কি কাউকে বলা ঠিক হবে!

চুপ করে আছ কেন মিত্রানী, সজল তোমাকে কিছু বলেছিল?

বললাম, না—মানে বলছিলাম হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

সুহাস আবারও তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো, বল না সজল তোমাকে কিছু বলেনি?

বললাম—হ্যাঁ, মিথ্যাই বললাম—না তো, সেরকম কিছু তো আমার মনে পড়ছে না সুহাস, তবে কি ঠিক তুমি জানতে চাও যদি বলতে—

আশ্চর্য—তারপরই তার প্রশ্ন : আচ্ছা মিত্রানী, সজল কি তোমাকে বলেছিল, সে তোমাকে ভালবাসে—সে তোমাকে বিয়ে করতে চায়? তার জবাবে তাকে তুমি বলেছিলে তা সন্তুষ্ট নয়—কারণ তুমি অন্য একজনকে ভালবাস?

জিজ্ঞাসা করলাম, সজল তোমাকে ঐ কথা বলেছে?

সুহাস ফোনে আবার বললে, নচেৎ আমি জানবো কি করে বল! সজলের কাছে অবিশ্য তুমি তার নামটা বলোনি—এড়িয়ে গেছো, কিন্তু আমাকে তুমি বলতে পার কে সে— আমাদের মধ্যেই কেউ কি—

আশ্চর্য! এরপর আর কি বলতে পারি—বললাম, কি হবে নামটা জেনে তোমার?

তবু সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল—আমি চুপ করে রইলাম। আশ্চর্য, সত্যিই কি আজো বুঝতে পারেনি সুহাস কোথায় আমার মনটা বাঁধা পড়েছে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে চলে এলাম ঘর থেকে।

এর পরে মাত্র দুটি লাইন লেখা ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠায়। তারিখ নেই তবে পড়ে মনে হয় ঠিক পরের দিনই—বিকেলের দিকে আবার সজল এসেছিল—

সজল এসেছিল—

যাক, সজলের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সজল বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সহজ ভাবেই নিয়েছে। সজল বললে সে চায় পুরাতন বন্ধু-বান্ধবরা সকলে মিলে—বিদ্যুৎকে সে নাকি কথাটা বলেছে। যাবার আগে সজল একটা অঙ্গুত ব্যাপার করলো—ভাবতেও হাসি পাচ্ছে। সুহাসকে ওর চোখ দিয়ে আজ আমাকে চিনতে হবে—হায় রে—

কিরীটী ডাইরীটা একপাশে রেখে আরে কিছুক্ষণ বই ও খাতাপত্র ধৰ্টিলো, তারপর একসময় জানালা দুটো বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

অবিনাশ ঘোষাল তখনো আগের মতই পায়চারি করছিলেন—
মাস্টারমশাই—

অবিনাশ ঘোষাল কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

মাস্টারমশাই, মিত্রানীর ডাইরীটা আমি নিয়ে যাচ্ছি!

মিত্রানীর ডাইরী! অবিনাশ ঘোষাল শুধালেন।

ইঁ।

কোথায় পেলে?

ওর ভুয়ারে—

ওঁ, আজ্ঞা। যাও নিয়ে।

॥ চোদ ॥

ডাইরীখানা নিয়ে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বসবার ঘরের সোফায় গিয়ে বসল কিরীটী একটা চুরোটি ধরিয়ে।

বেশী দিন ময়—বৎসর খানেক আগের তারিখ থেকে ডাইরী লেখার শুরু, তাহলেও প্রথম প্রাতাতেই নিয়েছে মিত্রানী—ডাইরী লিখতার সেই কবে থেকে—কিন্তু মাঝখানে কয়েক বৎসর লিখিনি, লিখতে ইচ্ছাও হয়নি—কিন্তু আজ থেকে আবার লিখবো ভাবছি। চমৎকার ডাইরীটা পাঠিয়েছে সজল—এমন সুন্দর মরাক্কা লেদারে বাঁধানো ডাইরীটা— দেখানেই কিছু লিখতে লোভ জাগে মনে। কিন্তু কি লিখি? কাকে নিয়ে শুরু করি আমার এই ডাইরী—দৈনন্দিন ডীবন-কথা! ত্রিশ বৎসর বয়স হলো—অধ্যাপনা করছি। কলেজে যাই, মেয়েদের পড়ই, অবসর সময়টা বেশীর ভাগই বই নিয়ে কাটে—একা, বড় একা লাগে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় যেন এক মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। এ যাদ্রার শেষ কোথায় কে জানে।

সুহাস—সুহাস কি আজও বুঝতে পারেনি কি বৃক্ষভরা ভালবাসা নিয়ে তারই প্রতীক্ষায় প্রহর শুনে চলেছি! যার জন্য অপেক্ষা করে আছি তার সাড়া নেই—অথচ যার কথা মনেও পড়ে না ভুলেও কখনো, সে একটার পর একটা চিঠি লিখে চলেছে।

সজল, আমি বুঝি, তুমি স্পষ্ট করে না লিখলেও বুঝতে পারি, তোমার ঐ কথার গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ কোন কথাটি তোমার মনের মধ্যে উকি দিতে চাইছে।

কিন্তু আমি যে অনেক আগেই দেউলিয়া হয়ে বসে আছি। কাউকেই আর দেবার মত যে অবশিষ্ট কিছুই নেই। বাবা এতদিন পর্যন্ত কখনো আমার বিয়ের কথা বলেননি—কিন্তু গতরাত্রে বলছিলেন, একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি মা—সন্ধানও ঠিক নয়, পাত্রপঙ্কজই এগিয়ে এসেছে, তোর যদি কোন আপত্তি না থাকে তো কথা বলতে পারি।

বললাম, না বাবা—

চেলেটি ভাল—

আমি তোমাকে ঠিক সময়ে, জানাবো বাবা।
বাবা আর কোন কথাই বললেন না। অসহ্য হলেন কিনা কে জানে! আশচর্য! সুহাস,
এখনো তোমার সময় হলো না!

কয়েক পৃষ্ঠা পরে—

বিদ্যুতের সঙ্গে সেদিন হঠাত দেখো—সে বগলে, কেমন আছো মিত্রানী?

ভাল।

ভাবছিলাম একদিন তোমাকে ফোন করবো—

করেছিলে নাকি?

না।

করলেও কথা হতো না—আমার সাড়া পেতে না।

কেন?

ফোনটা আজ দশদিন আউট অফ অর্ডার হয়ে আছে।

বিদ্যুৎ হো হো করে হেসে উঠলো।

তা আমার কথা হঠাত মনে পড়লো কেন বিদ্যুৎ?

আমার নায়িকার সন্ধানে—মানে আমার পরের বইতে মনে হচ্ছিল তোমাকে চমৎকার
ফিট ইন করবে।

এবার হেসে উঠলাম আমি।

হাসলে যে?

শেষ পর্যন্ত আর মেয়ে খুঁজে পেলে না? আমার কথা ভাবছিলে?

সত্তি—বল না, করবে অভিনয়?

না।

কেন?

আমি বিয়ে করবো—

সে তো অভিনয় করলেও বিয়ে করা যায়—

না, স্ত্রী আর অভিনেত্রী একসঙ্গে হওয়া যায় না।

কিন্তু তোমাকে অনেক উদাহরণ দিতে পারি—

পারো হয়ত, কিন্তু অভিনেত্রীদের স্বামীর ঘর—কোনদিনই স্বামীর ঘর হয়ে ওঠে না,
একটার হ্যামার অন্টার শাস্তসুন্দর জীবনের গলা টিপে ধরতে শুরু করে পদে
পদে—যার ফলে বিক্ষেপ—অশাস্তি—তারপর—

কি তারপর?

হয় দুঃসহ এক জীবন-যন্ত্রণা—না হয় অকস্মাত একদিন পরিসমাপ্তি। না বিদ্যুৎ, মেয়ে,
হয়ে জন্মেছি—আমি মেয়ে হয়েই বেঁচে থাকতে চাই। গৃহিণী, সন্তানের জননী—

তা বসে আছো কেন আজো?

বসে আছি পথ চেয়ে—

কার পথ চেয়ে—আমার নয় তো!

না—সে নহ তুমি—সে নহ তুমি—

তবে? কে সে ভাগ্যবান মিত্রা?

আচ্ছা বিদ্যুৎ—

বল।

সুহাসের খবর কি? তার সঙ্গে দেখা হয় তোমার?

হয় কদাচিত্ত কথনো। জানোই তো, মিদারণ সিরিয়াস টাইপের ছেলে সে।

অমন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করলো বি. এ.-তে অথচ এম. এ.-টা পড়লো না, কি এক সামান্য চাকরিতে চুকে গেল সাততাড়াতাড়ি।

তার সংসারের কথা তো তুমি জানো না—বাবা চাকরি করতে করতে হঠাৎ সেরিব্রাল অ্যাটাকে পদ্ধু হয়ে গিয়েছেন—দুটি বিবাহযোগ্যা বোন—একটিরও বিয়ে দিতে পারেনি, গায়ের রঙের জন্য বিয়ের বাজারে বিকোয়ানি বলে তাদের পড়াচ্ছে—চাকরি করা ছাড়াও গোটা দুই চিউশনী করছে।

সত্যিই আমি জানতাম না ব্যাপারটা।

॥ পনেরো ॥

কিরীটী পাতার পর পাতা পড়ে চলে ডাইরীর।

বাবা আর আমার বিয়ের কথা বলেননি। বলবেনও না জানি। বুঝি বাবা জানতে চান কোথায় আমার মন বাঁধা পড়েছে। কিন্তু কি বলবো তাকে? যাকে মন দিলাম তারই যে সাড়া নেই!

আজ হঠাৎ সুহাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কলেজ স্টুটের একটা বইয়ের দোকানে। ও আমাকে দেখতে পায়নি—আমিই ওকে দেখতে পেয়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকলাম, সুহাস!

চমকে ও ফিরে তাকাল, মিত্রানী—

হ্যাঁ—চিনতে পেরেছো তাহলে!

চিনতে পারবো না হঠাৎ একথা তোমার মনে হলো কেন মিত্রানী? সুহাস বললে।

মিত্রানীকে মনে আছে আজো তোমার?

প্রত্যুভৱে মৃদু হাসলো সুহাস। কোন কথা বললো না।

বই কেনা হলো?

না।

কেন?

টাকা নেই।

আমার কাছে আছে নাও না, দেবো?

না। ধন্যবাদ।

নিতে বাধা আছে বুঝি?

তা নয়—

তবে ?

পাওয়াটা যেখানে সুনিশ্চিত, সেখানে হাত বাড়ানোর মধ্যে যে কথানি লজ্জা—থাক,
সে তুমি বুঝবে না।

তা তুমি এখানে এসেছিলে—কোন নতুন বই কিনতে বুঝি ?

হ্যাঁ—এসেছিলাম কিন্তু বইটা আসেনি এখনো।

দুজনে একসঙ্গে দোকান থেকে বের হয়ে এলাম। পাশাপাশি হেঁটে চলেছি—সক্ষা হয়ে
গেলেও ঐখানে তখনো বেশ ভিড়।

কফি খাবে সুহাস ?

মন্দ কি, চলো।

দুজনে গিয়ে কফি হাউসে ঢুকলাম।

কতদিন পরে আবার কফি হাউসে এলাম।

কফি হাউসটা তখন গমগম করছে। এক কোণে কয়েকজন কলেজেরই ছাত্রছাত্রী মনে
হলো, একটা টেবিলে বসে জোর গলায় তর্কাতর্কি করছে। কোনমতে একটা নিরিবিল
টেবিলে গিয়ে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। কফির অর্ডার দিলাম।

বললাম, বেশ ছিলাম কলেজ-জীবনে, তাই না !

সুহাস হাসলো নিঃশব্দে।

বরাবরই ও কথা কম বলতো—আজ যেন মনে হলো আরো গন্তীর হয়ে গিয়েছে।
কফি খেতে খেতে একসময় বললাম, আচ্ছা সুহাস, তুমি কোন কমপিটিউট পরীক্ষা দিলে
না কেন ?

দিলেও হতো না।

সজল পাস করলো, আর তুমি পারতে না ?

সকলের দ্বারা তো সব কিছু হয় না মিত্রানী। যা হয়েছে তাতেই আমি খুশি। কি জানো
মিত্রানী, যোগ্যতার বাইরে কখনো লোভের হাত প্রসারিত করতে হয় না। ওতে করে
কেবল দুঃখই বাড়ে—ওসব কথা থাক—অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে সত্ত্ব
খুব ভাল লাগছে—

সত্ত্ব বলছো ?

বাঃ, মিথ্যা বলবো কেন।

তা ইচ্ছে করলেই তো মধ্যে মধ্যে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে—

কি হবে—তার চাইতে আজকের মত হঠাত দেখা হয়ে যায় যদি সেই ভাল।
অংকশিক্তার যে আনন্দ আছে, নিয়ন্ত্রিত করতার মধ্যে তা থাকে না।

সামনে শুক্রবার আমার জন্মদিন—প্রতি বছরই তোমাকে নিমন্ত্রণ করি, তুমি আসনি
আজ পর্যন্ত—শুক্রবার আসবে ?

গেলে তুমি খুশি হবে ?

খুশির আমার অস্ত থাকবে না।

বেশ যাবো।

সত্ত্ব বলছ ?

হাঁ, যাবো।

আজ শুক্রবার আমার জন্মদিন ছিল।

সজল আর সুহাস বাদে সবাই এসে হৈ-হৈ করে চলে গেল। সজল আসতে পারবে না জানি, সে দিল্লীতে ট্রেইনিং-এ আছে—কিন্তু সুহাস কেন কথা দিয়েও কথা রাখলো না!

শেষ পর্যন্ত রাত নটা নাগাদ সুহাস এলো—হাতে একগোছা রজনীগঙ্গা।

এতক্ষণে সময় হলো?

কি করি বলো, টিউশনী সেরে আসতে হলো। রাগ করেছো?

না। আজকের দিনটি টিউশনী না হয় নাই করতে।

ছেলেটার ক্ষতি হতো—সামনে তার ফাইন্যাল পরীক্ষা।

সুহাসকে রেট ভরে থাবার দিলাম—সব সে খেল। যাবার সময় আমার হাতে একটা মুখবন্ধ থাম দিয়ে বললে, পারে পড়ো।

বুকটার মধ্যে সে আমার কি ধূকপুকুনি। সুহাস চলে যাবার পর কম্পিত হাতে খামটা খুললাম। এক টুকরো সাদা কাগজে লেখা—রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন :

স্বপন-পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি

কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি॥

নয়তো সেথায় যাবার তরে নয় কিছু তো পাবার তরে,

নাই কিছু তার দাবি—

বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি॥

গান্টা আমার জন। ওনওনিয়ে উঠল যেন সুর আর কথাওলো আমার বুকের মধ্যে।

চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে,

দিশেহারা গকে তারি আকাশ ভরে ওঠে।

রাত্রি বারোটা—আমার জন্মদিন। ঘুম কেন আসছে না চোখে—সুহাস-সুহাস—

॥ ঘোলো ॥

দিন দুই আর কিরীটী কোথাও বেরই হলো না। মিত্রানীর হত্যারহস্যটা যেন ত্রুটি জট পাকিয়ে পাকিয়ে জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠছে। সুত্রঙ্গলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ফোন এলো পর্যন্ত কিরীটী ফোন ধরে না। ফোনে কেউ ডাকলেও সাড়া দেয় না।

সারাদিন প্রচণ্ড গরমের পর কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ বাড়ো হাওয়ার সঙ্গে কয়েক ফেঁটা বৃষ্টি হাওয়ায় প্রথর তাপ-দাহ কিছুটা কমেছে।

কৃষ্ণ একটা সোফার ওপরে বসে একটা বই পড়ছে আর কিরীটী সোফার গায়ে হেলান দিয়ে সামনের ছোট টেবিলটার ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে!

বই পড়লেও কৃষ্ণের মনটা বইয়ের পাতার মধ্যে থিক ছিল না—সে মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিল।

বুবাতে পারছিল কৃষ্ণ, মিত্রানীর মৃত্যুরহস্যের কোন সমাধানে কিরীটী পৌঁছতে পারেনি—তাই তার ঐ নিঃশব্দতা। বইরের চেহারাটা যতই শাস্ত হোক, ভিতরে ভিতরে তার একটা আহিংসার আলোড়ন চলেছে।

চা খাবে? কৃষ্ণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে।

চা!

হ্যাঁ, চা করে আনি—

নিয়ে এসো!

কৃষ্ণ একপাশে বইটা রেখে ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই একটু পরে সুব্রত এসে ঘরে চুকল দরজা ঠেলে।

সুব্রতকে ঘরে চুকলে দেখে কিরীটী ওর দিকে তাকাল চোখ তুলে—আচ্ছা সুব্রত।
কি?

মিত্রানী সেদিন অকস্মাত আক্রান্ত হৰার পর নিশ্চয়ই চিংকার করে উঠেছিল—

দেটাই তো স্বাভাবিক। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ প্রতিরোধ যেমন মানুষ করে তেমনি শেষ একটা ভয়ার্ট চিংকারও সে করে ওঠে।

তাহলে—

কি তাহলে?

কাজল বোস নিশ্চয়ই সে চিংকার শুনেছিল—

কাজল বোস!

হ্যাঁ, সে যে ঠিক সেই মৃহূর্তে মিত্রানী ও আক্রান্তকারীর আশেপাশেই ছিল সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ—আর তার প্রমাণ হচ্ছে কাজলেরই ভাঙা চুড়ির কয়েকটি টুকরো মৃতদেহের অন্তিমের, যেগুলো সুশীল নন্দী পরের দিন কুড়িয়ে পেয়েছেন। কাজল বোস আমাদের কাছে সে কথা চেপে গিয়েছে—কিন্তু কেন? হোয়াট ইজ হার মোটিভ বিহাইন্ড? কি উদ্দেশ্যে?

হয়ত হত্যার ব্যাপারে জড়িয়ে যাবার ভয়ে সে মুখ খোলেনি—

হতে পারে—তবে এও হতে পারে—সে কাউকে শিল্প করবার চেষ্টা করছে।

তোমার তাই মনে হয়?

অনুমান—অনুমান মাত্র আমার—

অসম্ভব নয় হয়তো, কিন্তু সে কে। কাকে সে আড়াল করার চেষ্টা করছে—

কাজল বোসের একমাত্র ইন্টারেস্ট সুহাস মিত্র তার প্রেমাস্পদ—কিন্তু ঐখানেই আমার যোগফলটা মিলছে না সুব্রত—

কিন্তু সুহাসই যদি হত্যা করে থাকে মিত্রানীকে—একটা বলিষ্ঠ অ্যাথলেট মানুষ—

ঠিক, ঠিক। কিন্তু সে সত্যিই ভালবাসতো মিত্রানীকে। যোগফলটা ঐখানেই বিয়োগফলে দাঁড়াচ্ছে। দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ হয়ে চার হচ্ছে না—দুই থেকে বাদ গিয়ে শূন্য দাঁড়াচ্ছে। না—ঠিক মিলছে না।

সুব্রত বললে, তবে আর কে হতে পারে?

কেন, বিদ্যুৎ সরকার—

বিদ্যুৎ সরকার—

হঁা, তুই ভেবে দেখ—বিদ্যুৎ সরকারই সুহাসকে প্রথম আবিক্ষার করেছিল। এবং সুহাস যেখানে গাছের ডাল চাপা পড়েছিল তারই কাছাকাছি মিত্রানীর মৃতদেহটা আবিক্ষিত হয়—আর বিদ্যুৎই সেটা দেখতে পায় প্রথম। একমাত্র ঐ বিদ্যুৎ সরকারেরই যোগাযোগ ছিল মিত্রানীর সঙ্গে—

কিন্তু তাকে তো তুই প্রথম থেকেই বাদ দিয়েছিস—

কিরীটী বললে, দিয়েছি ঠিকই—কিন্তু যুক্তিরও সেটাই শেষ কথা নয়—হতেও পারে না তা।

কৃষ্ণ এই সময় দু'কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। সুব্রত দিকে তাকিয়ে বললে, কখন এলে?

এই—

কিরীটী ও সুব্রত দিকে দু'কাপ চা এগিয়ে দিল কৃষ্ণ।

তুমি খাবে না? সুব্রত শুধায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

তোমার জুতোর শব্দ আমি পেয়েছিলাম, কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললে, আর এক কাপ তৈরী করেছি, তোমরা শুরু কর, আমার আমি নিয়ে আসছি—

কিছুক্ষণ পরে, তখনো চায়ের কাপ কারো নিঃশেষ হয়নি—

সুব্রত এক সময় বললে, তোর কথায় মনে হচ্ছে কিরীটী, সুহাস মিত্র আর কাজল বোস মিত্রানীর হত্যারহস্যের মধ্যে বেশ জটিলভাবে জড়িয়ে আছে—যেহেতু ওরা দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে তখন খুবই কাছাকাছি ছিল—

শুধু তাই নয় সুব্রত।

তবে—

সুহাসকে মিত্রানী যেমন ভালবাসত, সুহাসও তেমনি ভালবাসত মিত্রানীকে। সেদিক থেকে একমাত্র সুহাসের প্রতি কিছুটা যে সন্দেহ জাগে না তা নয় কিন্তু মজা হচ্ছে কেউ কাউকে সে কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি—কিন্তু কেন? পরম্পরাকে পরম্পরারের ভালবাসা জানাবার সত্যিই কি কোথায়ও বাধা ছিল?

কৃষ্ণ বললে, হয়ত কোন তৃতীয় ব্যক্তি সজল চক্রবর্তীর মত মিত্রানীর দিক থেকে যেমন ছিল—সুহাসের দিক থেকেও তেমনি ছিল—

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাল, আশ্চর্য কৃষ্ণ, এই কথাটা তো একবারও আমার মনে হয়নি—ঠিক—তৃতীয় ব্যক্তি—তৃতীয় ব্যক্তি...

সুব্রত বললে, মিত্রানীর ব্যাপারে না হয় সজল চক্রবর্তী ছিল—কিন্তু সুহাসের বেলায় কে ছিল তবে?

কৃষ্ণ শাস্তি গলায় বললে, তোমার ঐ প্রশ্নের জবাব একমাত্র একজনই দিতে বোধ হয় পারে—

কিরীটী মনুকঠে বললে, তুমি বোধ হয় সুহাসের কথা বলছো কৃষ্ণ!

হ্যাঁ—

জংলী এসে ঐ সময় ঘরে চুকল।

বাবু—

জংলীর দিকে তাকিয়ে কৃষণ বললে, কে এসেছে?

সুহাসবাবু বলে এক ভদ্রলোক।

কৃষণ হেসে কিরীটির দিকে তাকিয়ে বললে, যাক—দেখো মেঘ না চাইতেই জল স্ফয়ৎ এসে হাজির একেবারে তোমার দরজায়।

কিরীটি মন্দু হেসে বললে, এখন জলটা ভালো ভাবে বর্ষিত হলেই হয়। এই জংলী যা, বাবুকে এই ঘরে নিয়ে আয়—

কৃষণ উঠে দাঁড়াল—সুব্রত, রাত্রে এখানে তুমি খেয়ে যাবে কিন্তু—

ঠিক আছে। সুব্রত জবাব দেয়।

কৃষণ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার একটু পরেই সুহাস মিত্র এসে কিরীটির ঘরে চুকল।

আসুন সুহাসবাবু—একটু আগে আপনার কথাই ভাবছিলাম।

সুহাস মিত্র বসতে বললে, জানি কেন ভাবছিলেন।

জানেন? কথাটা বলে কিরীটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুহাস মিত্রের মুখের দিকে তাকাল!

হ্যাঁ—আমি সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বাড়িতে ফেরা অবধি একটি কথাই ভেবেছি—আপনার কাছে তো অজ্ঞাত কিছুই থাকবে না কিরীটিবাবু, পেটের কথা আপনি ঠিকই বের করবেন, তার চাইতে যা সেদিন বলতে পারিনি—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, সেটা আপনার কাছে প্রকাশ করে দেওয়াই ভাল। কিন্তু তাহলেও বলবো কিরীটিবাবু, সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে যেন খুব একটা তেমন স্পষ্ট নয়—হয়ত সেই বড়ের শব্দের মধ্যে ভুল শুনেছি—

আমার অনুমান আপনি সেদিন কিছু শুনে থাকলে ভুল শোনেননি—ঠিকই শুনেছেন, বলুন এবারে ব্যাপারটা কি!

সুহাস মিত্র বলতে লাগল,—ঝাড় আর ধুলোর ঘূর্ণির অক্ষকারের মধ্যে প্রথমটা আচমকা এমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, কোথায় কোন্ দিকে এগোচ্ছি বুবতেই পারছিলাম না—তাছাড়া ঐ সময় আমার চোখ থেকে চশমাটা হঠাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ায় কোথায় ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, সেদিন আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার চোখে চশমা দেখে সত্যিই একটু খটকা লেগেছিল এবং আপনার চশমার লেসের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলাম—একটু যেন বেশীই মাইনাস পাওয়ারের চশমা আপনার—অথচ সুশীল নন্দীর রিপোর্টে আপনার চশমার কথা কিছুই ছিল না। ভেবেছিলাম হয়তো সেটা সুশীল নন্দীর আপনার বর্ণনায় একটা সাধারণ ‘অমিশন’ মাত্র।

না—চশমা ছাড়াই আমি ধানায় গিয়েছিলাম—যদিও দূরের সব কিছু দেখতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল।

চোখ কি আপনার অনেক দিন থেকেই খারাপ?

হ্যাঁ—ছোটবেলার একটা ইনজুরির জন্য বাঁ চোখের দৃষ্টিটা বরাবরই কিছুটা খারাপ কিরীটি অমনিবাস (১৩)—৫

ছিল—ডান চোখেও হায়ার সেকেন্ডারি দেবার আগে থাকতেই চোখের এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে দৃষ্টিশক্তির বিপর্যয় শুরু হয়—মানে দু চোখের দৃষ্টিই ক্ষীণ হয়ে আসে।

কি রোগ?

গ্র্যাজুয়াল অপটিক নার্ভ অ্যাট্রোফি—ডান চোখের দৃষ্টিবাহী ম্যায় আমার ক্রমশ শুকিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ চোখটাও আরও দুর্বল হয়ে আসছে—অনেকেই জানত না সে কথাটা—বি. এ.-তে ভাল রেজাল্ট করা সত্ত্বেও যে আমি আই. এ. এস. দিই না এটাই ছিল তার মুখ্য কারণ, মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট আমি পেতাম না। অবিশ্য বদ্ধ-বান্ধবরা ধরে নিয়েছিল আমার আঘাবিশ্বাসের অভাব—ভীরতা—কেউ বলেছে এসকেপিস্ট মেন্টালিটি—কাউকেই মুখ ফুটে আমি তবু বলতে পারিনি—আমার জীবনটাই ডুমড়—একদিন একটু একটু করে দু চোখের দৃষ্টির উপরে চিরঅন্ধকার নেমে আসবে—অন্ধকার—ছেদহীন অন্ধকার।

সুহাস মিত্র গলাটা যেন শেষের দিকে ঝুঁক হয়ে এলো।

সুহাস মিত্র একটু যেন খেমে বলতে লাগল আবার,—ভগবানই যে আমার জীবনের অগ্রগতির পথে কাঁটা দিয়ে সর শেষ করে দিয়েছেন—

আর কাউকে না বলেছিলেন—না বলেছিলেন সুহাসবাবু, মিত্রানীকে কেন বললেন না কথাটা, কিরীটী শাস্ত গলায় বললে।

কি হতো বলে কথাটা তাকে কিরীটীবাবু, কেবল দুঃখই দেওয়া হতো তাকে—মিত্রানী যে কি গভীর ভালবাসত আমায় আমি কি তা জানতাম না কিরীটীবাবু, জানতাম, আর জানতাম বলেই কথনো তার ডাকে সাড়া দিইনি—ভেবেছি আমার নীরবতায় যদি ক্রমশ একটু একটু করে ঘন্টা তার অন্যদিকে ঘুরে যায়—তাই যাক।

সুহাসবাবু, সত্যিকারের ভালবাসা কি অত সহজে ভিন্নমুখী হয়? হয় না—

আগে সে কথাটা একবারও মনে হয়নি—কিন্তু মিত্রানীর মৃত্যুর পর কেবলই কি মনে হচ্ছে জানেন?

কি?

সেদিন আমাকেই হয়ত যদি সে ধূলোর ঘূর্ণি ও ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে খুঁজতে খুঁজতে পাগলের মত না হয়ে উঠতো তবে হয়ত অমন করে আমার কাছে থেকেই মৃত্যুকে বরণ করতে হতো না—আমার সবচাইতে বড় দুঃখ কি জানেন কিরীটীবাবু, সে জানতেও পারেনি ঐ মুহূর্তে তার অত কাছে থেকেও চশমা হারিয়ে আল্লি একপ্রকার ব্রাইল্ড—অন্ধ—আমি নিরূপায়—

উত্তেজিত কঠে কিরীটী প্রশ্ন করে, তা হলে আপনি কারো গলা বা চিংকার শুনেছিলেন!

শুনেছিলাম—

কার—কার গলা শুনেছিলেন—চিনতে পেরেছিলেন সে কার গলা?

হ্যাঁ—

কার গলা?

মিত্রানীর গলা—

কি? কি বলেছিল সে?

কে? কে—আঃ ছাড়ো—সুহাস-সুহাস—তারপরই গো গো অস্পষ্ট একটা চাপা শব্দ—কিছু দেখতে পাচ্ছি না তখন তবু মরীয়া হয়ে সামনে এগুবার চেষ্টা করে দু'পাও এগোয়নি—একটা গাছের ডাল এসে মাথায হঠাৎ হড়মুড় করে পড়ল, আমি জ্ঞান হারালাম।

আর কারো গলা আপনি শোনেননি সুহাসবাবু? কিরীটী আবার শুধাল।
না।

॥ সতেরো ॥

সুহাসবাবু!

বলুন।

মিত্রানীর হত্যা-রহস্যের একটা 'জট' আমি কিছুতেই খুলতে পারছিলাম না—
আপনার স্বীকারেওভি সেই 'জট'টা খুলে দিল। আচ্ছা সুহাসবাবু, একটা কথা—

বলুন—

মিত্রানীর প্রতি সজলবাবু যে আকৃষ্ট ছিলেন সে কথাটা কি আপনি বুঝতে পেরেছিলেন
কখনো?

জানতাম—

জানতেন? কি করে জানলেন?

বিদ্যুৎ একদিন আমাকে বলেছিল—

বিদ্যুৎবাবু আপনাকে কথাটা বলেছিলেন?

হ্যাঁ। কথাটা শুনে আমি, বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, সুখীই হয়েছিলাম। সজল জীবনে
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—মিত্রানীকে সে বিয়ে করলে মিত্রানী সুখীই হবে।

আচ্ছা ঐ দুর্ঘটনার আগে এবং গার্ডেনে সকলে মিলিত হবার পূর্বে শেষ কার কার
সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল বন্ধুদের মধ্যে?

সকালে বাড়িতে এসেছিল সজল এবং বিদ্যুৎ—সে এসেছিল অফিসে আমায়
পিকনিকের কথাটা জানাতে পরের দিন দুপুরে।

ভাল কথা, কিরীটী বললে, দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল—১৪ মে, শনিবার—তাই না?

হ্যাঁ, তারিখটা আমার চিরকাল মনে থাকবে কিরীটীবাবু।

তারপর একটু থেমে বললে সুহাস, সেদিনটা—সরকারী এবং বেসরকারী অফিস সব
বন্ধ ছিল—তাই তো শনিবার পিকনিকের জন্য স্থির করেছিল বিদ্যুৎ—

আচ্ছা বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আপনি মিত্রানীকে ফোন করেছিলেন!

আমি মিত্রানীকে ফোন করেছি—কে বললে একথা!

মিত্রানীর ডাইরীতেই কথাটা লেখা আছে—

মিত্রানী তার ডাইরীতে লিখেছে, আমি বৃহস্পতিবার সকালে তাকে ফোন করেছিলাম?

হ্যাঁ—

আশচর্য! আমি তাকে জীবনে কখনো ফোন করিনি—

আপনি জানতেন তার বাড়িতে ফোন ছিল?

জানতাম বৈকি।

কি করে জানলেন?

মিত্রানীই কলেজে একদিন আমাকে কথাটা বলেছিল।

তাহলে ১২ই মে সকালে আপনি মিত্রানীকে ফোন করেননি সুহাসবাবু?

না।

সকাল সাতটা থেকে আটটার্ব মধ্যে সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন?

দোতালায় আমাদের বাসাবাড়ির বাড়িওয়ালার ছেলেকে পড়াছিলাম। মন্দল, বৃহস্পতি হপ্তায় দুদিন তাকে আমি পড়াই কিন্তু সত্যিই অবাক লাগছে, মিত্রানী তার ডায়েরীতে ঐ কথা লিখলো কেন? মিত্রানী তো কখনো মিথ্যা বলতো না—

হয়ত এমনও হতে পারে—

কি?

আপনার নাম করে অন্য কেউ তাকে ফোন করেছিল?

কিন্তু তাই বা কেউ করতে যাবে কেন?

আপনার এ প্রশ্নের জবাব হয়ত কয়েক দিনের মধ্যেই আমি দিতে পারবো সুহাসবাবু—কারণ অঙ্ককার অনেকটা কেটে গিয়েছে—

কি বলছেন আপনি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিরীটিবাবু—

কিরীটী হেসে বললে, কথামালা পড়েছিলেন ছেটবেলায়?

পড়েছি—

কথামালায় সেই নীলবর্ণ শৃগালের গল্পটা নিশ্চয়ই মনে আছে?

আছে—

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। ধোপার গাম্ভায় পড়ে সেই ধূর্ত শৃগালের গায়ে যে রং
লেগেছিল—তার সেই নীলবর্ণ বনের অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের মনের মধ্যে প্রথমটায়
একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও অন্তিকাল পরে অকশ্মাৎ দৈবচক্রে তার কঠের চিরাচরিত
হৃক্ষিত্যা ধ্বনিই তার আসল স্বরূপটি উন্ধাটিত করে দিয়েছিল। তবে হাঁয়া, এ শৃগালের
ব্যাপারটা ছিল আকশ্মিকই একটা ঘটনা মাত্র কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা আকশ্মিক নয়, সম্পূর্ণ
পূর্বপরিকল্পিত এবং স্থির মন্তিক্ষের কাজ।

কতকটা বোকার মতই যেন সুহাস কেমন অসহায় ভাবে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে
থাকে।

কিরীটী শ্বিতহাস্যে বললে, বুবালেন না তো সুহাসবাবু?

না—মানে—

আমি বলতে চাই, কিরীটী শাস্ত গলায় বললে, নো ড্রাইম ইজ পারফেক্ট!

কিছুক্ষণ হলো সুহাস মিত্র বিদায় নিয়েছে।

কিরীটী সুরত ও কৃষ্ণ দ্বিতীয় প্রস্থ চা নিয়ে বসেছিল। সুরত এতক্ষণ নির্বাক শ্রোতা

ছিল, একটি কথাও বলেনি। চাঁয়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এক সময় সুব্রত বললে, কিরীটী, মনে হচ্ছে কাজল বোসের ভূতটা বোধ হয় তোর কাঁধ থেকে নেমে গেছে—

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল, না, না—আদো নয়—মোক্ষম তিনটি জটের একটি জট যেটা সুহাস মিত্রকে নিয়ে ছিল সেই জটটিই মাত্র খুলেছে, কিন্তু এখনো দুটো জট রয়ে গিয়েছে—

তার মধ্যে একটি বোধ হয় কাজল বোস!

হ্যাঁ—

আর বাকীটা?

সেটা হত্যাকারীকে চিহ্নিত করবার মধ্যে শেষ জট। তোকে বলেছিলাম সেদিন সুশীল নন্দীর ওখান থেকে গাড়িতে আসতে আসতে—একটা কথা নিশ্চয়ই তোর মনে আছে— মিত্রানীকে কেন্দ্র করে একটি জটিল ত্রিকোণের সৃষ্টি হয়েছিল দুটি পুরুষের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে—

মনে আছে।

আমি বলেছিলাম মিত্রানীর হত্যার মূলে ঐ আকর্ষণ ও বিকর্ষণই—

হ্যাঁ—এবং এও বলেছিলাম, আপাতদৃষ্টিতে ভালবাসা ও ঘৃণা দুটি বিপরীত বস্তু হলেও ভালবাসা থেকে যেমন ঘৃণার উচ্চ হতে পারে তেমনি ঘৃণার মূলে অনেক সময় থাকে ভালবাসা।

তুই ঠিক কি বলতে চাস কিরীটী?

বলতে চাই ঐ জটটি এখনো আমার কাছে খুলে যায়নি—আর সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ হত্যাকারীর চেহারাটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে না।

তবে কি এখনো—

না সুব্রত, হত্যাকারী এখনো কিছুটা ঝাপসা—কিছুটা ধোঁয়া—তাই ভাবছিলাম, দেখি যদি কাজল বোসের কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য পাই—

কৃষ্ণ! ঐ সময় বলে উঠল, কিছুই পাবে না।

কেন?

ভুলো না, সুহাস মিত্রের মতো পুরুষ নয় সে—নারী।

সুব্রত বললে, ঠিকই বলেছে কৃষ্ণ—ওদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

কিরীটী মন্দ হেসে বললে, ঠিক—তবে যুধিষ্ঠিরের সেই তার মাকে অভিশাপ, কোন নারীর পেটে কোন কথা থাকবে না। তাছাড়া আমার তৃণে আছে মোক্ষম অস্ত্র—

যথা? প্রশ্নটা করে সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

আমাদের সুহাস মিত্র—

সুহাস মিত্র?

হ্যাঁ—ভুলে যাচ্ছিস কেন সুব্রত, সুহাসের জন্য কাজল প্রাণও দিতে পারে—

কিরীটীর কথার সঠিক তাৎপর্যটা ঐদিন সুব্রত ঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি— পেরেছিল দিন দুই বাদে।

সুহাসের সাহায্যেই কিরীটী কাজল বোসকে তার বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল। সুব্রত

বুঝতে পারেনি কিরীটীর প্ল্যানটা।

কিরীটী পরের দিন দুপুরে নিজেই গিয়েছিল সুহাস মিশ্রের অফিসে,

সুহাস মিত্র কিরীটীকে দেখে আবাক।

কিরীটীবাবু আপনি!

একটা কাজ করতে হবে আপনাকে সুহাসবাবু—

বলুন কি কাজ?

আপনাদের বান্ধবী—কাজল বোসের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই—

সে তো আপনিই তাকে ডেকে পাঠিয়ে—মানে সুশীলবাবুকে বললেই তিনি ব্যবহা
করে দিতে পারবেন।

তা পারবেন জানি, আমি তা চাই না। আমার ইচ্ছা আপনি তাকে কাজ বা পরশু
আমার ওখানে একটিবার যদি আসতে বলেন—

আমাকেই বলতে হবে?

হ্যাঁ—কারণ আপনাকে দিয়ে বলানোর মধ্যে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে—

সুহাস যেন কি ভাবলো, তারপর বললে, বেশ তাই হবে—তবে আজ তো হবে না—
কাজ শনিবার আছে, দুটোয় অফিসের ছুটির পর আমি তার ওখানে যাবো—রবিবার
আসতে বলবো—

খুব ভালো।

॥ আঠারো ॥

রবিবার সকালের দিকে কাজল বোস এলো।

কিরীটী কাজল বোসের অপেক্ষাতেই ছিল—এবং জংলীকে বলে বেরখেছিল কাজল
বোস এলে যেন সে তাকে তার ঘরে পৌঁছে দেয়।

জংলীর সঙ্গে কাজল বোস ঘরে ঢুকতেই কিরীটী বললে, আসুন, মিস
বোস—কতকঙ্গে ব্যাপার আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চাই, তাই আপনাকে
কষ্ট দিতে হলো, বসুন।

কাজল কিরীটীর কথার কোন জবাব দিল না—অন্ন দুরে সুরত চুপচাপ বসে একটা
পিকটোরিয়ালের পাতা উল্টাচ্ছিল, সেদিকে একবার তাকিয়ে একটা খালি সোফায়
কিরীটীর মুখোমুখি বসল।

কাজলের মুখটা গন্তব্য—যেন একটা বিরক্ত-বিরক্ত ভাব।

আপনি হয়ত বিরক্ত বোধ করেছেন মিস বোস, আপনাকে আমি বেশীক্ষণ আটকাবো
না।

কাজল বোস নীরব।

মিস বোস সেই দুর্ঘটনার দিন আপনি কি ধূলোর বাড়ে বিভ্রান্ত হয়ে হঠাতে পড়েটডে
গিয়েছিলেন?

না তো!

তবে আপনার হাতের চূড়ি ভাঙ্গল কি করে ?

আমার হাতের চূড়ি—কেন আপনাকে তো সেদিন আমি বলেছিলাম, আমার ছেট
ভাইবি আমার হাতের চূড়ি টানাটানি করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে।

হ্যাঁ বলেছিলেন মনে আছে—তবে কথাটা ঠিক আমার বিশ্বাস হয়নি—

কেন ? বিশ্বাস হয়নি কেন আপনার—কেন, আপনার মনে হয়েছে যে আমি মিথ্যা
বলছি !

মিথ্যা বলেছেন তা আমি বলিনি— ;

তবে ?

আপনার বাঁ হাতে ঠিক কভির কাছে একটা ‘অ্যাব্ৰেশন’,—মানে কিছুটা ছড়ে
যাওয়ার মত সেদিন দেখেছিলাম এবং তার চিহ্ন এখনো আছে, মনে হয় ওটা কিছুতে
কেটে গিয়েছে—কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে হয়েছে—

কি মনে হয়েছে আপনার কিরীটিবাবু ?

আপনি হয়ত সেদিন পড়ে গিয়েছিলেন বা কোন কারণে হাতে আঘাত পেয়েছিলেন,
যার ফলে আপনার বাঁ হাতের দু-একগাছি চূড়ি ভেঙে গিয়েছিল ও কভির কাছে ছড়ে
গিয়েছিল সেই আঘাতে।

না, সে সব কিছুই হয়নি—আপনি যা ভাবছেন !

তবে আপনার বাঁ হাতের কভির কাছে ঐ আঘাতের চিহ্নটা কি করে এলো ?

তা ঠিক মনে নেই—হয়ত কোন সময়ে কিছু হয়েছে—

মিস বোস, যে সত্যকে আপনি ঢাকবার চেষ্টা করছেন, তাকে আপনি দেকে রাখতে
পারবেন না। শুনুন, আমি যদি বলি, সেদিন বড় ও ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে কারো সঙ্গে
আপনার ধাক্কা লেগেছিল !

ধাক্কা ?

হ্যাঁ, কিংবা কারো সঙ্গে আপনার হাতাহাতি হয়েছিল—সেই সময়ই আপনার হাতের
চূড়ি ভেঙে যায় ।

কি পাগলের মত যা তা বলছেন ?

আমি যে পাগলের মত যা-তা বলছি না মিস বোস—তার উপযুক্ত প্রমাণ থানা
অফিসার সুশীল নন্দীর কাছে আছে—কিছু ভাঙ্গা চূড়ির অংশ—যে অংশগুলো আপনার
হাতের ঐ চূড়ির সঙ্গে ছবছ মিলে যাবে—আর আদালত যখন সেই প্রশ্ন আপনাকে
করবে—

আদালত প্রশ্ন করবে ? কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে মনে হলো যেন কাজল বোসের
গলার স্বর কেঁপে গেল একটু ।

নিশ্চয়ই। আদালতে যখন মিত্রানীর হত্যা-মামলা উঠবে—এবং ঐ চূড়ির ব্যাপারে
আপনাকে ক্রস করবে সরকারী উকিল—

আপনি—আপনি কি বলতে চান কিরীটিবাবু ?

কিছুই না, কেবল সেদিন সত্য যা আপনার ঝাতসারে ঘটেছিল সেইটুকুই আপনার
কাছ থেকে জানতে চাই—বলুন—

আ—আমি কিছু জানি না।

জানেন। বলুন কার সঙ্গে সেদিন আপনার ধাক্কা লেগেছিল—কে সে?

আমি বলতে পারবো না—পারবো না।

আপনি বলতে পারবেন না কিন্তু আমি বলছি—তিনি সুহাসবাবু, তাই না?

না, না—তাকে আমি চিনতে পারিনি—বিশ্বাস করুন, তাকে আমি চিনতে পারিনি—চিনেছিলেন—তাকে আপনি চিনেছিলেন মিস বোস, কিরীটীর গলার স্বর ঝজু ও কঠিন, বুঝতে পারছেন না কেন একজনকে বাঁচাতে গিয়ে ফাঁসির দড়ি আপনার দিকে এগিয়ে আসছে!

ফাঁসি! একটা আর্ত অস্ফুট চিংকার যেন কাজল বোসের কষ্ট চিরে বের হয়ে এলো। তার দুই চোখে ভয়াত্ত দৃষ্টি।

একজনকে হত্যার অপরাধে ইন্ডিয়ান পেনাল কোর্ডের ৩০২ ধারায় সেই দণ্ডই দেওয়া হয়ে থাকে—কাজেই সুহাসবাবু—

না, না—আপনি বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, সুহাস নির্দোষ—সম্পূর্ণ নির্দোষ, সে মিত্রানীকে হত্যা করেনি—

তাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাবার একটি মাত্র উপায় আছে মিস বোস—অকপটে সেদিন যা যা ঘটেছিল সেইটুকু আমার কাছে প্রকাশ করে দেওয়া। কিরীটীর গলার স্বর শাস্ত কিন্তু দৃঢ়। বলুন—সেদিন ঠিক কি ঘটেছিল আপনার দৃষ্টির মধ্যে ধূলোর ঘূর্ণিঝড় ওঠাবার পর—

সত্যি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু—

আমার প্রশ্নের জবাব দিন যদি সুহাসবাবুকে বাঁচাতে চান। কেন বুঝতে পারছেন না আপনি মিস বোস—সুহাসবাবুর বাঁচাবার আর কোন রাস্তা নেই বলেই আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য!

আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন?

সত্য বললে কেন বিশ্বাস করবো না!

কাজল বোস অতঃপর নিজেকে যেন একটু গুছিয়ে নিলো। তারপর বলতে শুরু করল, হঠাৎ ধূলোর ঘূর্ণিঝড় ওঠাবার পর আমরা প্রত্যেকেই সেই ধূলোর অন্ধকারে ছিটকে পড়েছিলাম—

জানি। তারপর?

ঝড়ের ঝাপটা থেকে বাঁচাবার জন্য এলোমেলো ভাবে যে কোথায় চলেছি প্রথমটায় যেমন বুঝতে পারিনি তেমনি এও বুঝতে পারিনি কতদূর এগিয়েছি ঐ সময়—

একটা কথা মিস বোস, মিত্রানী আপনার কত দূরে ছিল?

ঠিক জানি না, তবে মনে হয়—

সুহাসবাবু—

হ্যাঁ, বোধ হয় আমার ঠিক আগেই ছিল সুহাস—কাজল বোস থামল।

কিরীটী বললে, বলুন, থামলেন কেন?

হঠাৎ যেন কার সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগলো—

ধাক্টা লেগেছিল সামনে না পিছন থেকে, না পাশ থেকে? কিরীটীর প্রশ্ন।

মনে হয়েছিল যেন পাশ থেকেই—একটু থেমে আবার কাজল বললে, ভেবেছিলাম বুঝি সুহাসই, তাই তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠি—কে, সুহাস—কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না—বরং যাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম সে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো—আমি সামলাতে পারিনি নিজেকে—পড়ে যাই—

লোকটাকে আপনি ভাল করে দেখতে পাননি?

না।

তারপর?

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অস্ফুট চিংকার শুনতে পাই, আমি পড়ে গিয়ে ততক্ষণে আবার উঠে দাঁড়িয়েছি—একটা বাটাপটির শব্দ—তারপরই—

কেউ কি সুহাস বলে ডেকেছিল?

না, না। তারপরই একটু থেমে কাজল বোস বলতে লাগল, এগুতে যাবো কোন-মতে—একটা গাছের ডাল এসে সামনে আছড়ে পড়ল, আবার একটা অস্ফুট চিংকার কানে এলো। সুহাসই গাছের ডালের তলায় চাপা পড়েছিল, পরে বুঝেছিলাম। আর মিত্রানীকে আরো কিছুটা দূরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল—কাজেই সুহাস নয়, সে মিত্রানীকে হত্যা করতে পারে না। বলা শেষ করে কাজল যেন কিছুটা হাঁপাতে থাকে।

একটা কথা বোধ হয় আপনি জানেন না—

কি কথা?

কখনো হয়ত আজ পর্যন্ত চিন্তাও করতে পারেননি—

কি কথা? পুনরায় প্রশ্ন করলে কাজল বোস।

আপনি গত বছর সুহাসবাবুর জন্মদিনে তাঁকে সবুজ সুতোর নাম তুলে যে সিক্কের রুমালটা প্রেজেন্ট করেছিলেন, মিত্রানীকে সেই রুমালটার সাহায্যেই হত্যা করা হয়েছে—কে—কে বললে?

যে রুমালটা মিত্রানীকে পেঁচিয়ে গলার ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, সেটা সুহাসবাবুরই—তিনি ঐ কথা বলেছেন পুলিসের কাছে।

কাজল বোস যেন একেবারে বোবা। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে কিরীটীর মুখের দিকে।

সামান্য একটা রুমাল নিশ্চয়ই চুরি যায়নি—এক যদি না হত্যাকারী কৌশলে তার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেটা হাতিয়ে থাকে কিংবা সুহাস মিত্রই নিজে সেটা ব্যবহার না করে থাকেন!

কাজল বোস যেন পাথর।

কিরীটীর শেষ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কাজল বোস যেন এলিয়ে পড়ল সোফটার ওপরে অসহায় ভাবে। কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, কি—কি হলো মিস বোস—সুব্রত, ভদ্রমহিলার চোখমুখে একটু জল দে—বোধ হয় সংজ্ঞা হারিয়েছেন!

সুব্রত বুঝতে পেরেছিল কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়, তাই সে তাড়াতাড়ি উঠে পাশের টিপ্প থেকে জলের ফ্লাস্টা তুলে নিয়ে হাতে ফ্লাসের জল ঢেলে কাজল বোসের চোখেমুখে

বাপটা দিতে থাকে।

মিস বোস!

চোখের পাতায় তখনো জনের কণাগুলো লেগে আছে, কাজল বোস কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুহাস মিত্র এসে ঘরে ঢুকল।

কাজল বোস উঠে দাঁড়াল।

তুমি—তাহলে তুমই—কাজল বললে।

কাজল! ডাকল সুহাস।

তাকে যেন একটা থাবা দিয়ে থামিয়ে দিয়ে কাজল বললে, তুমি—তুমি এত নীচ—
এত ছেট সুহাস?

কাজল—শোনো, শোনো—

এখনো—এখনো তুমি বলতে চাও—

কাজল!

শুনেছি—সব শুনেছি—কিরীটীবাবু আমাকে সব বলেছেন এইমাত্র, মিত্রানীকে হত্যা করবার আর কিছু তুমি খুঁজে পেলে না—শেষ পর্যন্ত আমারই দেওয়া রুমালটা দিয়ে—
কাজল, এসব কি বলছো তুমি!

ঠিক বলছি—তুমই সেদিন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে—

আমি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম! কি বলছো—তুমি কি ক্ষেপে
গেলে?

সুহাস, পাপ কখনো চাপা থাকে না—

কাজল বোস আর দাঁড়াল না—টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ঘর থেকে
বের হয়ে যেতে কেউ তাকে বাধা দিল না। সুহাস তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে বিছুল
দৃষ্টিতে—তারপর বললে, কি বলে গেল কাজল কিরীটীবাবু?

নিজের কানেই তো শুনলেন আপনি ও কি বলে গেল—

শুনেছি, কিন্তু আপনি ওকে কি বলেছেন?

রুমালটার কথা বলেছি মাত্র—

কিন্তু ধাক্কা দেওয়ার কথা কি ও বলে গেল?

সেদিন কে নাকি ওকে ধাক্কা দিয়েছিল ধুলোর ঘূর্ণিবড়ের মধ্যে। তারপরই একটু হেসে
কিরীটী বললে, ওর কাছে আমার যা জানবার ছিল জানা হয়ে গিয়েছে—কাজল বোসকে
নিয়ে যে জটটা ছিল সেটা খুলে গিয়েছে, বাকী এখন শেষ জটটি—

কিসের জট? প্রশ্ন করে সুহাস।

মিত্রানীর হত্যারহস্যকে যিরে তিনটে জট ছিল—তার মধ্যে একটি খুলে দিয়েছেন
সেদিন আপনি—আজ কাজল বোস খুলে দিয়ে গেল একটি—বাকী এখন শেষ জটটি।
আশা করছি সেটাও খুলতে আর দেরি হবে না—

কিরীটীবাবু! সুহাস ডাকল।

বলুন।

সত্যিই কি আপনি মনে করেন—সুহাস ইতস্তত করে থেমে গেল।

কি, আমি!

সত্ত্বিই কি আপনি মনে করেন—দলের মধ্যে আমিই সেদিন মিত্রানীকে হত্যা করেছি?

সে কথা থাক—আপনি আগে বলুন, সেদিন কি কাজলের সঙ্গেই আপনার ধাক্কা লেগেছিল অথচ সাড়া দেননি তার ডাকে?

না, সে কাজল নয়—

তবে কে? আমার অনুমান আপনি হয়ত তাকে চিনতে পেরেছিলেন—চোখের দৃষ্টিতে নয়, হয়ত অনুভবে—স্পর্শের মধ্যে দিয়ে—

বিশ্বাস করুন তাকে আমি চিনতে পারিনি—

সুহাসবাবু, আপনারা এখনো একটা কথা জানেন না—কারণ বলা হয়নি কাউকে আপনাদের—

জানি না—কি জানি না?

মিত্রানী ওয়াজ রেপড—

সে কি! একটা অধিষ্ঠুট চিংকার যেন বের হয়ে এলো সুহাসের কষ্ট চিরে।

হ্যাঁ—এবং খুব সন্তুষ্প প্রচণ্ড ঘৃণা ও আক্রমণের বশে হত্যাকারী প্রথমে তাকে রুমালের ফাঁস গলায় দিয়ে হত্যা করে, তারপর তাকে রেপ করে—

আমি—আমি কথাটা এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না কিরীটিবাবু!

হয়ত হত্যাকারীর মিত্রানীকে যিরে দৌঘন্ডনের অমিত লালসা শেষ পর্যন্ত তাকে পশুর পর্যায়ে টেনে এনেছিল, তাকে হিতাহিত ঝানশূল্য করে ফেলেছিল—

কিরীটিবাবু!

বলুন।

এখনো আপনার ধারণা সে আমাদেরই একজন?

না বলতে পারলেই আমি খুশি হতাম সুহাসবাবু কিন্তু তা পারছি না—এখনো সন্দেহের জালটা যেন আপনাদেরই কাউকে যিরে আছে—

সুহাস আর কোন প্রতিবাদ জানাল না। কেমন যেন মুহ্যমানের মত সোফার উপরে বসে রইলো। কারো মুখেই কোন কথা নেই, যেন একটা পাষাণ-স্তুতা বিরাজ করছে ঘরের মধ্যে—তারপরই যেন হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়াল সুহাস মিত্র এবং কোন রকম কিছু না বলে শ্বেত পায়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে গেল।

সিঁড়িতে সুহাস মিত্রের পায়ের শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর সুব্রত বললে, বেচারা মনে হলো যেন অত্যন্ত কঠিন আঘাত পেয়েছে।

কিরীটী শাস্তি গলায় বললে, ঐ আঘাতটা না দিতে পারলে—যাকে বলে অ্যাসিড টেস্ট সেটা হতো না এবং আসলে সত্যটাও প্রকাশ পেত না।

তুই তাহলে সুহাস মিত্রকে মুক্তি দিলি?

আপাতত।

আপাতত মানে?

কিরীটী সুব্রতের কথার কোন জবাব না দিয়ে উঠে গিয়ে ফোন ডায়েল করতে লাগল।

বার-দুই এনগেজ টেন হলো, তারপর অন্য প্রাণে শোনা গেল, ও. সি. শিবপুর পি. এস.—

সুশীলবাবু আমি কিরীটী—কোন খবর আছে?

আছে তবে ফোনে বলবো না—কাল আসুন না একবার—

যাবো—আচ্ছা মৃতের জামা ও শাড়ি—

এখনো থানাতেই আছে—একজিবিট হিসাবে—কেন বলুন তো?

ওগুলো আমি একবার দেখতে চাই—আর এ সঙ্গে স্পটটাও একবার ঘুরে দেখে আসবো ভাবছি। আচ্ছা তাহলে সেই কথাই রইলো।

কিরীটী অতঃপর রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

কিরীটী ফিরে এসে সোফায় বসতেই সুব্রত শুধালো, স্পটটা একবার দেখবার কথা গত দু'দিন ধরে আমিও ভাবছিলাম!

॥ উনিশ ॥

কিরীটীর ওখান থেকে বের হয়ে সুহাস মিত্র একটু অন্যমনক্ষ হয়েই যেন বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগুতে থাকে। মিত্রানীর কথাই সে ভাবছিল বোধ হয়, হঠাতে বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি আসতেই কাজলের ডাক শুনে সুহাস থমকে দাঁড়াল।

সুহাস—

কে! ও তুমি! বাড়ি ফিরে যাওনি—

না। তোমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ—

আমার অপেক্ষায়! কেন?

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—

কথা! কি কথা—

এই রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কথা হতে পারে না।

কিন্তু রাত অনেক হয়েছে—তোমাকে তো আবার ফিরতে হবে ট্রেনে—

সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না—

কথাটা কি খুব জরুরী? ডিঙ্গোসা করলো সুহাস।

জরুরী না হলে প্রায় এক ঘণ্টা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করতাম না। চল, এ পার্কটায় গিয়ে বসা যাক—

সুহাস একটু চুপ করে থেকে বললে, বেশ চল—

দশ পনেরো গজ দূরেই রাস্তাটা যেখানে সামান্য একটু বেঁকেছে—সেখান থেকে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে—একটা যাওয়ার একটা আসার—মাঝখানে ট্রামের লাইন—

একটা ট্রাম উল্টো দিকে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে চলে গেল, একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছে—এই সময়ও যাত্রীতে একেবারে যেন ঠাসাঠাসি।

দুজনে ট্রাম-রাস্তা পার হয়ে একটা পার্কের মধ্যে এসে চুকল। গ্রীষ্মের সময় বলেই হয়ত তখনো পার্কের মধ্যে বেশ কিছু মানুষজন রয়েছে। দুজনে এগিয়ে গেল আরো কিছুটা—একটা খালি বেঞ্চ দেখে দুজনে পাশাপাশি বসলো।

কিছুটা সময় দুজনেই চুপচাপ, দুজনেই যেন যে যার ভাবনার মধ্যে তলিয়ে আছে।

সুহাস—হঠাতে কথা বললো কাজল, এতদিনে আমি বুঝতে পারছি—

কি বুঝতে পারছো কাজল !

আই ওয়াজ এ ফুল—নচেৎ কথাটা আমার আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কি বলতে চাও তুমি কাজল স্পষ্ট করে বল।

বলবার তো আর কিছু নেই—

কিছুই যদি নেই তো এভাবে এখানে আমাকে টেনে নিয়ে এলে কেন ?

কাজল বলতে লাগল, অবিশ্য ব্যাপারটা যে আমি একেবারে অনুমান করতে পারি নি তা নয়—কিন্তু মনকে সাস্তনা দিয়েছি—না, হতে পারে না। তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম—মিত্রানীর মনটা অন্য জায়গায় বাঁধা আছে—ওরা পরম্পরাকে ভালবাসে যখন তখন আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত—

কি বলছো তুমি কাজল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। মিত্রানী কাকে ভালবাসত—আর কেই বা মিত্রানীকে ভালবাসত—

কিন্তু সে ভুল আজ আমার ভেঙে গেছে। বুঝতে পারছি মিত্রানীর আরো অ্যাডমায়ারার ছিল—তাকে ভালবাসার জন্য আরো কেউ ছিল।

কাজল, সত্যিই বলছি তোমার হেয়োলি আমি একটুও বুঝতে পারছি না—

এই রকম কিছু যে আজ তোমার কাছ থেকে আমায় শুনতে হবে আমি জানতাম—কাজল, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে—আমাকে বাসায় ফিরতে হবে—আমি চললাম—যাবে তো নিশ্চয়ই—তোমাকে আমি আঢ়কাবো না—কিন্তু মন তোমার অনেক আগেই অন্য জায়গায় বাঁধা পড়েছে কথাটা আমাকে এতকাল জানতে দাওনি কেন ! কেন আমাকে নিয়ে তুমি খেলা করেছো ?

বৃত্তিভূক্ত কঠিন সুহাস বললে, খেলা তোমাকে নিয়ে আমি কোনদিনই করিনি কাজল, বোঝবার শক্তি থাকলে তুমি অনেক আগেই সেটা বুঝতে পারতে—

তা পারতাম হয়ত কিন্তু এও তুমি জেনো সুহাসবাবু, তোমার মুখ্যেশ্টা আমি খুলে দেবো—

কাজল !

হ্যাঁ—আমি যতটুকু জানি সব কিরীটিবাবুকে বলবো।

কি বলবে ?

আদালতে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেই সেটা বুঝতে পারবে—একটা বিষাক্ত জালায় যেন কথাগুলো উচ্চারণ করে কাজল উঠে পড়ে হন হন করে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

আর সুহাস যেন কেমন বিমুক্ত হয়ে বেঞ্চটার উপরে বসে রইলো।

সকাল সকালই পরের দিন কিরীটি আর সুব্রত বের হলো। থানায় যখন ওরা এসে পৌছাল, তখন সোয়া আটটা মত হন—গ্রীষ্মের তাপদাহ তখনো শুরু হয়নি। থানাতেই অপেক্ষা করছিলেন সুশীল নন্দী।

কিরীটি বললে, সুশীলবাবু, চলুন আগে বটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে স্পটটা ঘুরে আসি।

বেশ চলুন—সুশীল নন্দী উঠে দাঁড়ালেন।

উইক ডে—বটানিক্যাল গার্ডেনে তেমন লোকজন বড় একটা নেই। কয়েকজন আমেরিকান টুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছিল—হাতে তাদের ক্যামেরা দুজনের।

সুশীল নন্দীই সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ওদের ঠিক যেখানে মিত্রানীর মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটা ঝোপের মত—তারই সামনে খানিকটা খোলা জমি—কিরীটী তাকিয়ে দেখে। তারপর এক সময় সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে যায়—জায়গাটা গঙ্গার ধার থেকে প্রায় চলিশ পঞ্চাশ গজ দূরে হবে। এবং গঙ্গার ধার থেকে বিশেষ করে ঐ ঝোপটার জন্য জায়গাটা নজরে পড়ে না।

কিরীটী ঘড়ি দেখে একটু দ্রুতই গঙ্গার ধার থেকে জায়গাটায় এগিয়ে গেল—ঠিক জানবার জন্য কতক্ষণ আন্দাজ লাগতে পারে ঐখানে পৌঁছাতে।

সুশীলবাবু—

বলুন!

বায়নাকুলারটা আর বেতের টুপিটা কোথায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল জানেন?

সুশীল নন্দীই জায়গা দুটো দেখিয়ে দিলেন।

ইঁ। ভাঙা চুড়ির টুকরোগুলো?

ঐ যে বায়নাকুলারটা যেখানে পাওয়া যায় সেইখানেই—

কিরীটীর মনে হলো মৃতদেহটা যেখানে আবিষ্কৃত হয়, সেখান থেকে জায়গাটা হাত দশেক দূরেই হবে।

ইঁ। চলুন, এবার থানায় যাওয়া যাক।

গাড়িতে উঠে সুশীল নন্দী বললেন, জায়গাটা দেখে কিছু অনুমান করতে পারলেন?

একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে—

কি বলুন তো!

হত্যাকারী বুঝতে পেরেছিল ঐ ঝোপের দিকে আসতে হলে গঙ্গার ধার থেকে এ পথটাই সহজ হবে এবং সেই অনুমানেই—কিরীটী থেমে গেল হঠাতে এ পর্যন্ত বলে।

সুশীল নন্দী বললেন, কিন্তু তাতে কি এসে গেল—ওরা অন্য পথও তো ধরতে পারত—

তা পারত, তবে এটাই সামনে ছিল। আর সহজ পথ ছিল। কি জানেন সুশীলবাবু, সেদিনকার যাবতীয় ঘটনাই একটা অ্যাকসিডেন্ট বলতে পারেন—

মানে!

মানে অ্যাকসিডেন্টালি সব কিছুই যেন সেদিন খুনীর ফেবারে এসে গিয়েছিল—

সুব্রত কাছে ঐ মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা যেন অকস্বার্থ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কিরীটীর আগের কথায়—সে নিঃশব্দে কিরীটীর কথা শুনতে থাকে।

কিরীটী বলতে লাগল, প্রথমত ধৰুন, সেদিনকার ধূলোর ঘূর্ণিঝড়, আবহাওয়া অফিসের সেদিনের সকালের ফোরকাস্টে অবিশ্য ছিল বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ একপশলা ঝড়বৃষ্টি হবে—যদিও সেটা সেদিন ঠিক হয়েছিল—কিন্তু নাও তো হতে পারত—সেদিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে খুনী জাস্ট টুক এ চাঙ—এবং চাঙটা

সে পেয়ে গেল ফোরকাস্ট মতো আবহাওয়া ঠিক মুহূর্তে তার ফেবারে পেয়ে। দ্বিতীয়ত ঐ ঘূর্ণিষ্ঠ হবার দরুন তাকে, মানে খুনীকে আর কষ্ট করতে হলো না—মিত্রানী নিজেই তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। তৃতীয়ত ওরা স্থির করছিল চাঁদনী রাত আছে, কাজেই সন্ধ্যা উত্তরাবার পর তারা ওখান থেকে ফিরবে—যেমন করে হোক খুনী সেটা অনুমান করতে পেরেছিল—এবং তাই যদি শেষ পর্যন্ত হতো তো সন্ধ্যার আবছা অঙ্ককারে গঙ্গার ধার থেকে ফেরার পথে তাকে কার্যসূচি করতে হতো—

তাহলেই ভেবে দেখুন সুশীলবাবু—যদিও খুনীর সবটাই ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত—এবং তার ডিটারমিনেশন—তবু সব কিছু ঘটনাচক্রে তার ফেবারে আসায় ব্যাপারটা সহজই হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত তার কাছে—অ্যাকসিডেন্টালি সে হত্যা করবার চাঙ্গটা পেয়ে গিয়েছিল। ভাল কথা, কাউকে এই ক'দিন ঐ জায়গাটার আশেপাশে দেখা গিয়েছে কি?

হ্যাঁ—গতকাল দুপুরে আমার লোকেরা যারা পালা করে সর্বক্ষণ নজর রাখছিল নির্দেশমত—একজনকে দেখেছে—

কি রকম দেখতে লোকটা, বয়স কত—

বয়স হবে লোকটার তেব্রিশ-চৌক্রিশের মধ্যে—পরনে একটা সাদা প্যান্ট ও সিক্কের শার্ট—চোখে রঙিন কাঁচের চশমা—একটা ট্যাক্সি করে এসেছিল লোকটা—কয়েক মিনিট জায়গাটার আশেপাশে ঘুরে আবার সে ট্যাক্সি করে চলে যায়—

ট্যাক্সি—ট্যাক্সির নম্বরটা রেখেছিল কি আপনার লোক?

না—

পালিয়ে গেল—আপনার নাকের ডগা দিয়ে সুশীলবাবু!

কে পালিয়ে গেল নাকের ডগা দিয়ে—

হত্যাকারী। মিত্রানীর ঘোষালের হত্যাকারী—

বলেন কি?

হ্যাঁ—কিন্তু থাক—একটা ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম সুশীলবাবু—
হত্যাকারী ওদেরই একজন।

গাড়ি ইতিমধ্যে থানার সামনে পৌঁছে গিয়েছিল।

সুশীল নন্দী একটা সীল করা কাগজের প্যাকেট কিরীটীর সামনে টেবিলের ওপর এনে নামিয়ে রাখল। বললে, এর মধ্যে মিত্রানীর শাড়ি-সায়া-ব্রেসিয়ার-ব্লাউজ সব কিছু আছে।

প্যাকেটটা খুলতে খুলতে কিরীটী বললে, সেই বেতের টুপিটা ও বায়নাকুলারটাও আনুন—আর একবার দুটো বস্ত্র ভাল করে দেখবো।

সুশীলবাবু সেগুলো আলমারি থেকে বের করে এনে টেবিলের ওপর রাখলেন।

মিত্রানীর পরনে ছিল সেদিন একটা নীল রঙের মুর্শিদাবাদী সিক্কের শাড়ি। শাড়ির কিছুটা অংশ মনে হয় টানা-হ্যাঁচড়াতে ফেঁসে গিয়েছে, শাড়িটা পুরোনো বলেই বোধ হয়।

ব্লাউজের বোতামগুলো একটা বাদে বাকী নেই—ব্লাউজটা দেখতে দেখতে একটা কি যেন টেনে তুললো ব্লাউজ থেকে কিরীটী।

একটা মাঝারী সাইজের কর্কশ চুল, রঙটা কটা—

চুলটা পকেট থেকে একটা ছোট লেপ্সের ম্যাগনিফাইং প্লাস বের করে তারই সাহায্যে
পরীক্ষা করতে করতে কিরীটী বললে, এক টুকরো কাগজ দেখি সুশীলবাবু—

সুশীল নন্দী একটা প্যাডের কাগজ ছিঁড়ে দিলেন।

সেই কাগজের মধ্যে সফ্যালে চুলটা রেখে কিরীটী ওদের দিকে তাকিয়ে বললে,
হত্যাকারী খুবই সর্তর্কতা অবলম্বন করেছিল সুরত, এবং সব কিছু সেদিন তার ফেবারে
থাকলেও নির্মম নিয়তি তাকে ফেবার করেনি শেষ পর্যন্ত।

সুরত হাসতে হাসতে বললে, সে তো তখনি আমি বুঝেছিলাম কিরীটী, যখন তুই
ব্যাপারটা হাতে নিয়েছিস।

সুশীলবাবু!

কিরীটীর ডাকে সুশীল নন্দী কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে সাড়া দিলেন, বলুন—
আপনার কিছু সক্রিয় সাহায্য চাই এবার আমার—

বলুন কি করতে হবে?

আপনি আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসুন, তখন বলবো কি সাহায্য আপনার
নিকট আমি চাই—তবে এইটকু আমি বলতে পারি—মিত্রানীর হত্যাকারী আর এখন
অস্পষ্ট নেই—এবং মনে হয় রহস্যের শেষে জটটাও খুলে যাবে সহজেই—

সুরত বললে, কিছুটা বোধ হয় আমি অনুমান করতে পেরেছি কিরীটী। কিন্তু আমি
ভাবছি—

কি?

তাহলে কি সবটাই অভিনয়—

না—অভিনয় নয়, সত্য। চল এবার ওঠা যাক।

সুরত বুঝালো এখনো মীমাংসার শেষ সূত্রটি কিরীটী তার হাতের মধ্যে পায়নি। যদিও
হত্যাকারী একটা স্পষ্ট আকার নিয়েছে তার মনের মধ্যে, কিরীটী মুখ খুলতে চায় না।

॥ কুড়ি ॥

বাড়িতে ফিরে সারাটা দিন কিরীটী পেসেন্স খেলেই কাটিয়ে দিল একা একা আপন
মনে—কেবল মধ্যে দু'চার জায়গায় ফোন করেছিল।

সুরত আর বাড়িতে ফিরে যায়নি, সে ঐখানেই ছিল। আহারাদির পর কিরীটী যখন
তাসের প্যাকেট নিয়ে বসলো, সে একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিল।

বেলাশেষের আলো ইতিমধ্যে একটু একটু করে মুছে এসেছে যেন কখন—বাইরে
বোধ হয় মেষ করেছে—বাড়ি-বৃষ্টি হতে পারে।

কৃষ্ণ জংলীর হাতে চায়ের টেবিলে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

চা—কৃষ্ণ প্রথম সুরতকে একটা কাপ দিয়ে দ্বিতীয় কাপটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিল।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললে,
আচ্ছা কৃষ্ণ, তোমার কি মনে হয়—মিত্রানী জানতে পারেনি কখনো যে কাজল বোসও
সুহাসকে ভালবাসত?

আমার মনে হয়—কৃষ্ণ বললে, কাজল বোস যেমন জানত মিত্রানী সুহাসবাবুকে ভালবাসে, তেমনি মিত্রানীও বুঝতে পেরেছিল তারই মত কাজলও সুহাসবাবুকে ভালবাসত—

তাই যদি হতো—তার ডাইরীর মধ্যে কোথাও সেই সম্পর্কে এতটুকু ইঙ্গিতমাত্রও নেই কেন?

তার কারণ হয়ত—

কি?

মিত্রানীর নিজের ভালবাসার উপর এতখানি স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সে ওটা চিন্তা করবারও প্রয়োজনবোধ করেনি—অথবা সুহাসবাবুর দিক থেকে তার কোন উদ্বেগের কারণ আছে বলেই মনে করেনি—

কিরীটি কি যেন বলতে উদ্যত হয়েছিল জবাবে—কিন্তু বলা হলো না, ঠিক ঐ সময় ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

কিরীটি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলো—কিরীটি রায়—

রায়সাহেব, আমি নাইডু, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর—

নমস্কার। যা জানতে চেয়েছিলাম জানতে পেরেছেন?

হাঁ—ঐ নামে কোন প্যাসেঞ্জার সেদিনের মর্নিং ফ্লাইটে বা নুন ফ্লাইটে ছিল না রিজার্ভেশন লিস্টে।

কিছুক্ষণ অতঃপর দুজনের মধ্যে মিনিট পমেরো ধরে টেলিফোনে কথা হলো। সুব্রত লক্ষ্য করে, কিরীটির চোখে-মুখে যেন একটা আনন্দের আভাস।

থ্যাংকু মিঃ নাইডু—থ্যাংকু—বলে কিরীটি টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

কিরীটি ফিরে এসে সোফায় বসতেই জংলী এসে ঘরে ঢুকল।

বাবু, সেদিন যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, তিনি এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান—

সুব্রত বললে, নাম বলেনি?

জবাব দিল কিরীটি, যা, এ-ঘরে পাঠিয়ে দে। তারপর সুব্রত দিকে তাকিয়ে বললে, কাজল বোস।

সত্যিই কাজল বোস। কিরীটির অনুমান মিথ্যা নয়। কাজল বোস এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন মিস বোস—

সেদিন একটা কথা আপনাকে আমি গোপন করে গিয়েছি কিরীটিবাবু—কাজল বোস বললে।

বসুন। দাঁড়িয়ে কেন। কিরীটি বললে।

কাজল বোস বললে, আপনি সেদিন আমার চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে কোনদিনই হয়ত আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুলটা ভাঙতো না। তারপরই একটু থেমে কাজল বললে, আশ্চর্য! আমি এত বছর ধরে বুঝতেই পারিনি যে, ওর সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে আর একজন—ছিঃ ছিঃ, আর আমি কিনা হ্যাংলার মত ওর পিছনে পিছনে এতদিন ছুটে বেড়িয়েছি—

কিরীটী শাস্ত গলায় বললে, এ আঘাতটা আপনার প্রয়োজন ছিল বলেই কালকে ইঙ্গিত আমি আপনাকে দিয়েছিলাম মিস বোস। হ্যাঁ—সত্য যে সুহাসবাবু মিত্রানীকে ভালবাসতেন, কিন্তু সে ভালবাসা জানবেন কোনদিনই তার প্রকাশ পেতো না—

না, না—আপনি জানেন না। ও, এত ছোট—এত নীচ।

না মিস বোস—মানুষ হিসেবে অস্ত আমি তাকে ঐ বিশেষণগুলো দিতে পারছি না—আপনি জানেন না একটা কথা—ওর দুটো চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং একদিন তার দু'চোখে চির অন্ধকার নেমে আসবে—

কি বলছেন আপনি—

তার চশমার পুরো লেন্স দেখেও কি কখনো আপনার কথাটা মনে হয়নি—

না—

হওয়া কিন্তু উচিত ছিল। আমি জানি, কোন কথাটা আমাকে আজ বলবার জন্য আপনি ছুটে এসেছেন—

জানেন! বিস্ময়ে তাকাল কাজল বোস কিরীটীর মুখের দিকে।

যার সঙ্গে আপনার ধাক্কা লেগেছিল—সেদিন ধুলো-ঘূর্ণির ঝড়ের মধ্যে—কে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল—

সে সুহাস—এখন আমি বুঝতে পেরেছি সে সুহাস—

না। মিস বোস—তিনি সুহাসবাবু নন। শাস্ত অথচ দৃঢ় গলায় কিরীটী প্রতিবাদ জানাল।

হ্যাঁ আমি বলছি—সে সুহাস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না—আর কেউ হতেই পারে না—তবু বলে কাজল বোস।

না। আমি বলছি শুনুন, তিনি সুহাসবাবু নন মিস বোস।

তবে—তবে সে কে?

আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়—সে-ই হত্যা করেছিল সেদিন মিত্রানীকে।

কে! কে হত্যা করেছিল সেদিন মিত্রানীকে?

যার সঙ্গে আপনার ধাক্কা লাগবার পর তাকে আপনি দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং যে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল—

কে সে?

পূর্ববৎ শাস্ত গলায় কিরীটী বললে, এইমাত্র বললাম আপনাকে সে-ই মিত্রানীর হত্যাকারী—

তাহলে সে সুহাস নয়?

না। তবে আপনাদের মধ্যেই একজন।

কাজল বোস অতঃপর কিছুক্ষণ স্তুক হয়ে বসে রইলো মাথা নীচ করে। তারপর যখন মুখ তুললো, কাজলের দু'চোখে জল টল-টল করছে। কাজল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল তারপর বললে, আমি তাহলে যাই কিরীটীবাবু—

আসুন—

মাথাটা নীচ করে উপচীয়মান অঙ্গকে যেন রোধ করতে করতে কাজল বোস ক্রান্ত

পা দুটো টেনে টেনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটি মৃদু কঢ়ে বললে, পুওর গার্ল!

সুব্রত একশ্বণ চুপচাপ বসেছিল, সে এবার বললে, কিরীটি, তাহলে সুহাস মিত্র নয়? না।

যুক্তি দিয়ে আমি যেটা খাড়া করেছিলাম, তাহলে সেটা দেখছি ভুল। তাহলে কি সেই চোখে চশমা—দাঢ়িওয়ালা ব্যক্তিটি—

কিরীটি মৃদু মৃদু হাসতে থাকে সুব্রতের কথার কোন জবাব না দিয়ে।

কিন্তু একজন ছাড়া সেই ব্যক্তি আর কে হতে পারে বুঝতে পারছি না। আচ্ছা ইত্যান এয়ার লাইসের মিঃ নাইডু কার কথা বলছিলেন তোকে ফোনে—প্যাসেঞ্জার লিস্টে কার নাম ছিল না?

সজল চক্ৰবৰ্তী।

মানে।

দুঃটিনার দিন সকালের ফ্লাইটে তো নয়ই—নুন ফ্লাইটেও সজল চক্ৰবৰ্তীর নাম কোথাও পাওয়া যায়নি—কাজেই এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, তিনি আদৌ সেদিন কলকাতা ছেড়ে তাঁর কর্মসূলে ফিরে যাননি—

তবে ভদ্রলোক পিকনিক পার্টিতে সেদিন ওদের সঙ্গে যোগ দিল না কেন?

সে প্রশ্নের জবাব একমাত্র সজল চক্ৰবৰ্তীই দিতে পারে। আসলে তুই সেই বেতের টুপি আৱ বায়নাকুলার নিয়েই বেশী মাথা ঘামিয়েছিস সুব্রত—

কিন্তু—

ওই বস্তু দুটির কোন মূল্যই যে একেবারে মিত্রানীর হত্যা-রহস্যের মধ্যে নেই তা আমি বলছি না—কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান সূত্র দুটি হয়ত তোর মনের মধ্যে ততটা রেখাপাত করেনি—

কোন দুটি সূত্রের কথা বলছিস?

এক নম্বৰ হচ্ছে মিত্রানীর ডাইরীর মধ্যে যে ফোনের সংবাদটি আছে, যেটা সে মনে করেছিল সুহাসের ফোন—সেটা এবং দু'নম্বৰ—যেটা হচ্ছে বর্তমান হত্যা-মামলার প্রধানতম সূত্র—

কি সেটা?

একটা চশমা।

চশমা!

হ্যাঁ চশমা—হ্যাঁ সুহাসবাবুর চশমা—যে চশমাটা তার চোখ থেকে ছিটকে আশেপাশেই অকুস্থানের কোথাও পড়েছিল, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেটা আৱ পাওয়া যায়নি। এবং ঐ চশমার পিছনের ইতিহাসটা হচ্ছে সুহাসবাবুর ক্ষীণদৃষ্টি—যার অ্যাডভান্টেজ বা সুবিধা ব্যাপারটা জানা থাকায় হত্যাকারী পুরোপুরি নিতে পেরেছিল।

কি রকম?

সুহাসবাবুর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ না থাকলে হত্যাকারী তার ক্রমালটা অনায়াসেই সরিয়ে পকেটস্টু কৱতে পারত না ও হত্যার সন্দেহটা পুরোপুরি তার কাঁধে চাপিয়ে দিতে এত

সহজে বোধ হয় পারত না। যাক—কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী সহসা দেওয়াল
ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, রাত নটা প্রায় বাজে—

মনে হচ্ছে কারো অপেক্ষা করছিস ?

হ্যাঁ—

কার, সুশীলবাবুর ?

না। সজল চক্রবর্তীর।

॥ একুশ ॥

কিন্তু সে রাত্রে সজল চক্রবর্তী এলোই না।

এলো পরের দিন সকাল সাড়ে-আটটা নাগাদ।

সুব্রত গতরাতে বাড়ি চলে গিয়েছিল, এখনো ফেরেনি—কিরীটী চা-পানের পর
ঐদিনকার সংবাদপত্রটা নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে দেখেছিল।

জংলী এসে ঘরে ঢুকল—বাবু, সুশীলবাবু আর একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

এ ঘরে পাঠিয়ে দে—

আসুন সুশীলবাবু—

সুশীল নন্দী বললেন, সজলবাবুকে একেবারে তাঁর বাসা থেকেই ধরে নিয়ে এলাম—

বসুন—বসুন সজলবাবু, কিরীটী বললে।

আমাকে আজই নুন ফ্লাইটে ফিরে যেতে হবে কিরীটীবাবু, কাজেই আপনার যা বক্তব্য
তা যদি একটু তাড়াতাড়ি সেরে নেন—বসতে বসতে সজল চক্রবর্তী বললে।

নিশ্চয়ই—বেশী সময় নেবো না—কয়েকটি প্রশ্নের আমি জবাব চাই মাত্র—

বলুন।

মিত্রানীদের পিকনিকের বাবস্থা আপনারই আগ্রহে করা হয়েছিল বিশেষ করে, তাই
না ?

হ্যাঁ—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার পিকনিকে যাওয়া হয়নি—

এবং মর্নিং ফ্লাইটে আপনার যাওয়া হয়নি; তাই না ?

হ্যাঁ—মানে—বিশেষ একটা কাজে সেক্রেটারিয়েটে আটকা পড়ে—

কি কাজ হঠাতে পড়েছিল সেদিন আপনার সেক্রেটারিয়েটে এবং কার সঙ্গে কাজ
ছিল—

ঐ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারছি না—আই অ্যাম সরি।

খুব গোপনীয়—সিক্রেট বুঝি ব্যাপারটা ?

ধরে নিন তাই—

পরের দিনও আপনি যাননি সকালে, তাই না—

না—যেতে পারিনি—

তাহলে নিশ্চয়ই মিত্রানীকে হত্যা করা হয়েছে, সে সংবাদটা আপনি পেয়েছিলেন ?

না—না—

কিন্তু সংবাদপত্রে খবর বের হয়েছিল—একদল তরঙ্গ-তরঙ্গী বটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে এক তরঙ্গী রহস্যজনকভাবে নিহত হয়েছে।

হবে—আমার' চোখে পড়েনি—

হ্যাঁ—আপনি কবে প্রথম সংবাদটা পান?

পরশুর আগের দিন—সজল চক্রবর্তী বললে।

কি করে পেলেন? মিত্রানীদের বাড়িতে ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ—ফোন করতেই প্রণবেশবাবুর মুখ থেকে সংবাদটা পাই।

তা হঠাতে সেখানে ফোন করতে গিয়েছিলেন কেন?

ওদের পার্টি কেমন হলো সেটা জানবার জন্য—

কিরীটী মৃদু হেসে বললো, কিন্তু আমি যদি বলি মিঃ চক্রবর্তী, ব্যাপারটা আপনি ঘটনার দিনই জানতে পেরেছিলেন—

না, না—কি বলছেন আপনি!

হ্যাঁ—কারণ ছদ্মবেশে পিকনিকের দিন ইউ ওয়্যার প্রেজেন্ট অন দি স্পট।

আপনি কি পাগল হয়েছেন কিরীটীবাবু? সারাদিন আমি চীফ সেক্রেটারির কাছে ব্যস্ত ছিলাম, তাঁর ঘরেই আমি লাঞ্চ পর্যন্ত করেছি—

একটা কথা আপনাকে আমার জানানো করব্য—আপনাদের বর্তমান চীফ সেক্রেটারী আমার বিশেষ বন্ধু—

আ—আপনি—

হ্যাঁ—কাজেই ব্যাপারটা সত্য-মিথ্যা এখনি আমার কাছে যাচাই করা হয়ত খুব একটা অসুবিধা হবে না—নাউ টেল মি—বলুন কোথায় ছিলেন আপনি সারাটা দিন—

ক্ষমা করবেন—আমি বলতে পারবো না।

পারবেন না! ঠিক আছে—তবে জানবেন আপনার ঐ ইচ্ছাকৃত গোপনতা হয়ত আপনাকে ফাঁসির দড়ির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

সজল তথাপি মুখ খুললো না। চুপ করে রইলো সে।

আর একটা প্রশ্নের জবাব দিন?

সজল চক্রবর্তী কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল নিঃশব্দে।—আপনি সেবার অনেক দিন পরে কলকাতায় এসে মিত্রানীর ওখানে গিয়ে তাকে বিয়ের প্রোপোজাল দিয়েছিলেন?

কে বললে আপনাকে?

মিত্রানীর ডাইরীতে তাই লেখা আছে।

হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। আমি জানতাম না যে সে সুহাসকে ভালবাসে মনে মনে—তাহলে কখনোই তাকে ঐ ধরনের প্রোপোজাল দিতাম না।

আপনি জানলেন কি করে সে কথা যে মিত্রানী মনে মনে সুহাসকে ভালবাসত?

জানতে পেরেছি—

কি করে জানলেন? মিত্রানী কি সে কথা আপনাকে বলেছিলেন সেদিন?

না।

তবে?

জেনেছিলাম।

তাকে ফোন করেছিলেন পরের দিন, তাই না?
ফোন?

হ্যাঁ। ফোন করেছিলেন আপনি তাকে—সুহাসের নাম করে—মানে যে সন্দেহটা
আপনার জেগেছিল সেটা মেটোবার জন্য।

সুহাসের নাম করে আমি তাকে ফোন করতে যাবো কেন?

করেছিলেন—তাই বলছি বলুন, কেন নিজের নাম না করে সুহাসের নাম
করেছিলেন—

বললাম তো—সুহাসের নাম করে তাকে আমি ফোন করিনি।

সজলবাবু, আপনি সাপ নিয়ে খেলা করছেন—

ভয় দেখাচ্ছেন?

না, ভয় না। আদালতে যা সত্য তা যখন প্রমাণ হবে—

আপনার আর কোন কথা আছে?

না। কিন্তু সজলবাবু এখনো আপনি ভেবে দেখুন, মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারে আপনি
বিশ্বিভাবে ভড়িয়ে পড়ছেন—এখনো যা সত্য, অকপটে তা বলুন—নচেৎ আপনার
চাকরি তো যাবেই—অপমানের চূড়ান্ত হবেন।

ঠিক আছে—ধরুন আমিই না হয় ফোন করেছিলাম—

আসল ব্যাপারটা জানার জন্য—

ধরুন তাই—

কোথা থেকে ফোনটা করেছিলেন—

পাবলিক বুথ থেকে—

না। আচ্ছা আর একটা কথা—

আমি আর আপনার কোন কথার জবাব দেবো না। দরকার যদি হয়েই তো আদালতেই
দেবো—

তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে—

আমি উঠলাম—বলে হাঁচাঁ উঠে দাঁড়াল সজল এবং আর দ্বিতীয় কোন বাক্য উচ্চারণ
না করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে একটা স্তুতি ভঙ্গ করে সুশীল নন্দীই কথা বললেন, আশচর্য! ভদ্রলোক
একজন দায়িত্বশীল অফিসার হয়ে এমন ব্যবহার করলেন কি করে—আগামেও
একেবারে যিথ্যাং স্টেটমেন্ট দিয়ে গিয়েছেন—

আরো কিছু আছে সুশীলবাবু, মিত্রানীর হত্যাকারীকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করাতে
গেলে আমাকে আরো কিছু প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।

আপনি মিত্রানীর হত্যাকারীকে তাহলে ধরতে পেরেছেন?

পেরেছি সুশীলবাবু। তবে প্রমাণ, আরো কিছু প্রমাণ চাই—কেবলমাত্র অনুমানের
উপর নির্ভর করে অত বড় অভিযোগটা একজনের উপর চাপানো যায় না। তাছাড়া
আপনি তো জানেন—আদালত অনুমান চায় না—চায় প্রমাণ—অকাট্য প্রমাণ।

আচ্ছা কিরীটীবাবু, আপনার কি ধারণা সেদিন গার্ডেনে সজলবাবু উপস্থিত ছিলেন?

শুধু উপস্থিত থাকলেই তো হবে না সুশীলবাবু—ঘটনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও সক্রিয় যোগাযোগ থাকা চাই—সে-রকম কিছু যতক্ষণ না আপনার হাতের মুঠোয় আপনি পাচ্ছেন, তাকে আপনি স্পর্শ করতে পারবেন না। আইনের ফাঁক দিয়ে তিনি গলে বের হয়ে যাবেন।

আমার কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিরীটীবাবু—সুশীল নন্দী বলতে গিয়ে যেন কেমন ইতস্তত করেন।

কি মনে হচ্ছে সুশীলবাবু?

সেই চোখে রঙিন চশমা, মুখে দাঢ়ি, হাতে বায়নাকুলার, মাথায় বেতের টুপি, পরনে কালো প্যান্ট ও স্ট্রাইপ দেওয়া হাওয়াই শার্ট—যাকে সুহাসবাবু সেদিন দেখেছিলেন গার্ডেনে তাঁদের কিছু দূরে—

আমি যদি বলি সুহাসবাবু যাকে সেদিন দেখেছিলেন গার্ডেনে অল্প দূরে, সে ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রানীর হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই—

সম্পর্ক নেই!

না।

কিন্তু তাহলে অকৃত্তানে ঐ বেতের টুপি ও বায়নাকুলার যা পাওয়া গিয়েছে—সেটা ব্যাখ্যা কি করবেন কিরীটীবাবু?

হয়ত ঘটনাচক্রে ঐ হঠাৎ ধূলোর ঘূর্ণিঝড়ে বায়নাকুলারটা তার হাত থেকে পড়ে যায় ও সেই সঙ্গে মাথার বেতের টুপিটা—

সুব্রত ঐ সময় বললে, কিন্তু এমনকি হতে পারে কিরীটী—

কি? কিরীটী সহস্রে সুব্রতের মুখের দিকে তাকাল—

সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি একজন সেদিন গার্ডেনে ওদেরই মত হাজির হয়েছিল, তারপর বিকেলের দিকে অক্ষমাং ধূলোর ঘূর্ণিঝড় ওঠায় দৈবক্রমে ঐ দলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে—

বল—থামলি কেন? তারপর?

তারপর হয়ত মিত্রানীর মৃত্যুর ব্যাপারটা জানতে পেরে চাচা আপন প্রাণ বাঁচাপলিসি নিয়েছে—কে চায় বামেলায় জড়িয়ে পড়তে বল?

আমারও অনুমান ঠিক তাই সুব্রত—কাজেই ঐ ব্যক্তিটির আদি মধ্য ও শেষ জানতেই হবে যেমন করে হোক এবং সেইটাই আমার তৃতীয় জট মিত্রানীর হত্যা-রহস্যের।

সুশীল নন্দী কোন কথা বলেন না। কেমন যেন একটু বিরতভাবেই চুপ করে বসে থাকেন।

সুশীলবাবু—

বলুন—কিরীটীর ডাকে সুশীল নন্দী ওর দিকে তাকালেন।

আমাদের দৃঢ় ধারণা ওদের মধ্যে কেউ না কেউ ঐ ব্যক্তিটির পরিচয় ও সমস্ত রহস্য জানেন—

তাহলে ওদের সকলকে ডেকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়—

হবে না। কোন ফল হবে তাতে করে—

তাহলে ?

তা হলেও ভয় নেই ! তাকে আমরা খুঁজে বের করবোই।

কেমন করে ?

আপাতত এই মুহূর্তে সেটা আপনাকে বলতে পারছি না। তবে একটা কথা এর মধ্যে আছে—একমাত্র সুহাসবাবু ছাড়া কেউ তাকে দেখেননি অথচ সুহাসবাবুর চোখের দৃষ্টি তেমন প্রথর ছিল না—তাঁর চোখের ব্যাধির জন্য—কাজেই আমার মনে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সুহাসবাবু নয়—অন্য কেউ সোকটিকে দেখেছিল—সেই এক সময় সুহাসবাবুকে কথাটা বলায় সুহাসবাবু হ্যত তাকিয়ে দেখেছিলেন—

কিন্তু কথাটা তাহলে সুহাসবাবু একবারও বললেন না কেন ?

সুহাসবাবুকে যতটুকু আমি স্টাডি করতে পেরেছি সুশীলবাবু, যাকে বলে সত্যিকারের ভদ্রলোক, তাই তিনি—তিনি হ্যত পরে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলক্ষ করতে পেরে মুখটা বক্স করে রেখেছেন, পাছে কেউ বিশ্রিভাবে জড়িয়ে পড়ে ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে। কিন্তু আমি বের করে নেবো তাঁর মুখ থেকে কথাটা—তারপর একটু থেমে বললেন কিরীটী, এই রুমাল-রহস্যটা আমার কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে—

রুমাল রহস্য ? শুধালেন সুশীল নন্দী।

হ্যাঁ, যে রুমালের সাহায্যে মিত্রানীকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল।

রুমালটা একমাত্র সুহাসবাবুকে কাজল বোস প্রেজেন্ট করেছিল, তারপর রুমালটা খোয়া যায়, এইটুকুই তো মাত্র আমরা জানতে পেরেছি আজ পর্যন্ত—

ঝটুকুই নয়—আরো কিছু আছে, যদি সেই ব্যক্তি ওদের কারো পরিচিত জনই হয় তাহলে আমাদের একান্তই জানা দরকার কেন সেদিন সে এখানে এসেছিল—তার আসার কি উদ্দেশ্য ছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন ত্রুণি আরো জটিল হয়ে উঠছে কিরীটীবাবু—সুশীল নন্দী বললেন।

ভয় নেই সুশীলবাবু, জটিলতা যাই হোক, আশা করছি সুহাসবাবুর সাহায্য আমরা পাবো। আপনি কাল বাদে পরশু আসবেন—বোধ হয় সে সময় এ রহস্যের ঘেননাদকে আপনার সামনে উপস্থাপিত করতে পারবো—

সুশীল নন্দী অতঃপর বিদায় নিলেন।

কিরীটী সুব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, শুভস্য শীত্রাম—চল সুব্রত একটু ঘুরে আসা যাক—

কোথায় যাবি ?

সুহাসবাবুর ওখানে—এখন হ্যত তাকে তার অফিসেই পাওয়া যাবে—

কিন্তু সেখানে—

সে একটা ব্যবস্থা হবে, চল—ওঠ।

॥ বাইশ ॥

সুহাস মিত্রকে তার অফিসে পাওয়া গেল না। সুহাস সেদিন অফিসেই আসেনি। কিরীটী
আর সুব্রত তখন সোজা তার কলুটোলার বাড়িতে গেল।

সুহাস বাড়িতেই ছিল। বাইরের ঘরে জানালা দরজা সব বন্ধ করে একটা টেবিল ফ্যান
চলিয়ে দিয়ে—পরনে একটা লুঙ্গি আর ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি—সুহাস শুয়ে ছিল।

বাচ্চা চাকরটা খবর দিতে তাড়াতাড়ি সে উঠে বসল—আসুন—কে!

চশমাটা চোখে ছিল না, পাশেই ছিল, তাড়াতাড়ি চশমাটা তুলে সুহাস চোখে পরে
নিল, কিরীটীবাবু, সুব্রতবাবু—আপনারা—

আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম সুহাসবাবু, কিরীটী বললে।

না, না, বিরক্তির কি আছে, বসুন। কিন্তু হঠাতে আমার কাছে—

কিরীটী আর সুব্রত বসলো চৌকিটার উপরেই, কারণ বসবার আর কোন জায়গা ছিল
না।

বলুন কি ব্যাপার?

সেই পুরোনো প্রশ্নটাই আবার করছি সুহাসবাবু, কিরীটী বললে, কার কাছে আপনি
শুনেছিলেন মিত্রানী অন্য কাউকে ভালবাসে? আপনাদের বন্ধু সজল চত্রবর্তী কি?

না।

তবে?

সে কথা আর কেন কিরীটীবাবু, যা চিরদিনের মতই চুকেবুকে গিয়েছে—যা অতীত,
তাকে আজ আর বর্তমানে টেনে এনে লাভ কি?

লাভ আপনার দিকে কিছু না হলেও, ব্যাপারটা জানতে পারলে আমার পক্ষে মিত্রানীর
হত্যা-রহস্যের শেষ জটিটি খুলতে হ্যাত অনেকটা সুবিধা হতে পারে। তাছাড়া মিত্রানীকে
তো আপনি সত্যিই ভালবাসতেন সুহাসবাবু, আপনি কি চান না তার হত্যাকারী শুধু
হত্যাকারীই নয়, যে তার মৃতদেহটার উপর জঘন্য অত্যাচার করতে পর্যন্ত এতটুকু দ্বিধা
বোধ করেনি সে ধরা পড়ুক!

সুহাস চুপ করে রইলো।

বলুন সুহাসবাবু, মিত্রানীর প্রতি আপনার ভালবাসার কি কোন দায়িত্বই নেই?

কিরীটীবাবু, আমাকে অনুরোধ করবেন না—

বেশ—একখণ্ড কাগজে আমি নামটা লিখে এনেছি সেটা দেখুন একটিবার—বলতে
বলতে কিরীটী পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ছোট কাগজ বের করে সুহাসের দিকে
এগিয়ে দিল, দেখুন তো নামটা—মেলে কিনা—

সুহাস কাগজের ভাঁজ খুলে নামটা পড়ে যেন একেবারে বোবা হয়ে বসে রইলো, তার
মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না। কাগজটা হাতেই ধরা থাকে তার।

বুঝেছি আর আপনাকে বলতে হবে না—দিন কাগজটা—বলে সুহাসের হাত কাগজটা
নিয়ে কিরীটী কাগজটা সুব্রতের দিকে এগিয়ে দিল, পড়ে দেখ সুব্রত নামটা—এই মিত্রানীর
হত্যাকারী—

সুব্রতও যেন নামটা পড়ে একেবারে বোবা হয়ে যায়।

সে শুধু অস্ফুট কঞ্চে একটি মাত্র শব্দই উচ্চারণ করলো, আশ্চর্য!

ভাবতেই পরিসনি বোধ হয় ব্যাপারটা—কিরীটী বললে—
না।

কিন্তু তিনটি কারণে তোরও সদেহ হওয়া উচিত ছিল—প্রথমত বড় ঠিক ওঠবার
মুখে ঐ লোকটি ছিল মিত্রানীর একেবারে কাছের জন—দুই রুমালটা—তিন ওরই
পরামর্শে সম্ভব সজল চক্ৰবৰ্তী সেদিন সুহাসের পরিচয়ে মিত্রানীকে ফোন করেছিল। আৱ
সৰ্বশেষ যেটা, কেউ ভাবেনি কখনো—মিত্রানীৰ প্রতি মানুষটার লোভ থাকতে পারে—সে
যে কথাটা প্রকাশ কৰেনি, কাৱণ সে ভাল ভাবেই জানত মিত্রানী সুহাসবাবুকে গভীৰভাবে
ভালবাসে—তাই নিজেকে কখনো প্রকাশ কৰেনি মিত্রানীৰ কাছে যেমন—তেমনি শেষ
চালে সুহাসবাবুকেও ধৰংস কৰতে চেয়েছিল।

সুহাস কথা বললে, সত্যি—সত্যি বলছেন আপনি কিরীটীবাবু!

হ্যাঁ।

আশ্চর্য—এখনো যেন কিছুতেই বিশ্বাস কৰতে পাৰছি না—

শুনলে ব্যাপারটা আপনাদেৱ মত সকলেই বিশ্বিত হৰে—কিন্তু জানেন তো ট্ৰুথ ইজ
স্ট্ৰেঞ্জাৰ দ্যান ফিকশন বলে একটি চলতি প্ৰবাদ আছে! কিন্তু সে যাই হোক, সত্যটা
জানবাৰ পৰ এখন তো বুৰতে পাৰছেন, আপনাদেৱ দুজনাৰ প্ৰতিই তাৰ প্ৰচণ্ড ঘণা কি
ভাবে এক নিষ্ঠুৰ আক্ৰমণে পৱিবত্তি হয়েছিল, যে আক্ৰমণেৰ জন্য মিত্রানীকে নিষ্ঠুৰ
মৃত্যুবৰণ কৰতে হয়েছে এবং আপনিও এগিয়ে এসেছিলেন ফাঁসিৰ দড়িৰ দিকে!

সুহাস স্তৰ হয়ে বসে রইলো।

কিরীটী আবাৰ বললে, এবাৱে বলুন তো সুহাসবাবু, আপনি কি সেদিন সত্যি সত্যিই
স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, সেই বেতেৰ টুপি মাথায়—মুখে দাঢ়ি—চোখে বঙিন চশমা
লোকটাকে, না কেউ আপনাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰায় সেদিকে আপনাৰ নজৰ পড়েছিল!

সুহাস চুপ কৰে থাকে।

আমাৰ অনুমান কিন্তু, আপনাৰ নজৰে আসেনি প্ৰথমে এবং আপনাৰ ঐ বন্ধুই সেই
দিকে আপনাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰেছিল—তাই নয় কি?

হ্যাঁ।

এখন তো বুৰতে পাৰছেন, সকলেৰ মধ্যে বিশেষ কৰে আপনাৰই তাৰ দিকে দৃষ্টি
আকৰ্ষণ কৰিবাৰ পিছনে তাৰ বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—

পাৰছি বৈকি! কিন্তু এখনো বুৰতে পাৰছি না—মিত্রানীকে তাৰ যদি প্ৰয়োজনই ছিল
তো সে অমন বাঁকা পথে গেল কেন?

আকৰ্ষণটা হ্যত ভালবাসা নয়—একটা জৈবিক আকৰ্ষণ মাৰ্গ—রিপুৰ তাড়না!

মনে হচ্ছে—সুহাস বললে, মিত্রাণীও বোধ হয় ব্যাপারটা কখনো এতটুকু আঁচ কৰতে
পাৱেনি!

আঁচ কৰতে পাৱলে তাৰ ডাইৱীতেই হ্যত থাকতো। কি জানেন সুহাসবাবু—
আপনাদেৱ ঐ বন্ধুটি কেবলমা৤্ৰ যে আপনাৰ বন্ধুত্বেৰই সুযোগ নিয়েছে তাই নয়—

আপনার চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিরও সুযোগ নিয়েছে—

কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি, এবং আপনার ঝুমালটার ব্যাপারেও আমার অনুমান—সেদিন অফিসে আপনাকে পিকনিকের কথা বলতে গিয়ে আপনার ঝুমালটা হাতসাফাই করেছিল—চোখের ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য হয়ত ব্যাপারটা আপনার নজরে আসেনি—

ঐ ঝুমালটা তাহলে—

হ্যাঁ সুহাসবাবু—আপনার প্রতি পুলিসের সন্দেহটা যাতে আরো বেশী ঘনীভূত হয়—সেই কারণেই ঝুমালটা হাতসাফাই করেছিল—

সুব্রত এতক্ষণে কথা বললে, সবই করেছিল—প্ল্যানটা তার সাকসেসফুলও হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য ভদ্রলোকের যে মিত্রানী কিরীটী রায়ের মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে—

কিরীটীবাবু—

বলুন—

এখন কি তাহলে ওকে আপনি পুলিসের হাতে তুলে দেবেন?

সমাজের মধ্যে বাস করে একজন দেশের নাগরিকের সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি তো তাই বলে সুহাসবাবু, তবে যে মুহূর্তে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে—তখনি মনে হয়েছে ফাঁসির দড়ি বোধ হয় ওর যোগ্য শাস্তি নয়—এক মুহূর্তেই তো সব শেষ হয়ে যাবে—এবং সেটা ওর প্রতি অনুকম্পাই প্রকাশ করা হবে—তা আমি ঠিক চাই না—

আপনি তাহলে—

দেখি, এখনো ঠিক ভেবে উঠতে পারিনি—

কিন্তু ফাঁসিই তো ওর যোগ্য শাস্তি কিরীটীবাবু—সুহাস বললে—

ঠিক—কিন্তু প্রমাণ করবেন কি করে যে ওই হত্যাকারী। আদালত চায় প্রমাণ—আইন চায় প্রমাণ, কাজেই ওর তখনি ফাঁসি হতে পারে যদি ওর স্বীকারেকি পাই আমরা! তা কি ও দেবে?

দেবে না সহজে জানি, কিন্তু তবু শেষ চেষ্টা আমি করবোই—আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ সুহাসবাবু—

বলুন—

ঘুণাক্ষরেও যেন ও নামটা কেউ না এখন জানতে পারে—

না কিরীটীবাবু, আমি কারো কাছে বলবো না।

ঠিক আছে—আমরা তাহলে এবার উঠবো।

সুহাস মিত্র কোন কথা বললো না। ওরা দুজনে উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দুঠো দিন তারপর কিরীটী আর কোথাও বের হলো না। তবে মধ্যে মধ্যে দু-একজনকে ফোন করল। কয়েক জায়গা থেকে ফোনও এলো।

সুব্রত আর ফিরে যায়নি—সর্বক্ষণ কিরীটীর পাশে পাশেই রয়েছে।

কিরীটীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি—নিজেও কোন কথা বলেনি। প্রতীক্ষা করেছে

কেবল কিরীটী কখন মুখ খুলবে!

তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে হঠাতে কিরীটী মুখ খুললো। বললে, পেয়েছি রে সুব্রত—পথ
খুঁজে পেয়েছি—

কি—সুশীল নন্দীকে সব জানাবি?

হ্যাঁ জানাবো, তবে—

তবে?

সোজাসুজি নয়—

কিভাবে তাহলে তাকে ব্যাপারটা জানাবি?

একটা চিঠি—

চিঠি! চিঠি সুশীল নন্দীকে?

না—সুশীল নন্দীকে নয়—

তবে কাকে?

হত্যাকারীকে একটা চিঠি দেবো—

হত্যাকারীকে চিঠি! কিন্তু সে চিঠি পাবার পর যদি লোকটা একেবারে উধাও হয়ে
যায়?

আমার বিশ্বাস যাবে না—আর যদি যাইই আমাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরিই সফল
হবে—

সফল হবে।

নিশ্চয়ই। সে-ই যে অপরাধী সেটা তার ঐ পলায়ন থেকে প্রমাণিত হয়ে যাবে—
তখনই পুলিস তাকে অন্যায়ে হত্যাকারী বলে চিহ্নিতও করতে পারবে।

কিন্তু চিঠি লিখবো বললেও কিরীটী ঠিক করে উঠতে পারে না—কিভাবে চিঠিটা
লিখবে—কোথায় তার শুরু, কোথায় তার শেষ।

মনে মনে অনেক মুসাবিদা করে কিরীটী কিন্তু কোনটাই যেন পছন্দ হয় না।

ঐদিনই মধ্যরাত্রে কিরীটী লেখার প্যাড ও কলম নিয়ে বসলো, তারপর শুরু করলো
তার চিঠি—

কি ভাবে আপনাকে সঙ্গেধন করবো চিঠির শুরুতে তা অনেক ভেবেও হির করতে
পারলাম না। প্রিয়বরেম্বুও লিখতে পারি না—সবিনয় নিবেদন দিয়েও শুরু করতে পারি
না—তবু লিখতেই হবে চিঠিটা আপনাকে—তাই কোন সঙ্গেধন না করেই শুরু করছি
চিঠি।

চিঠিটা আমি ডাকে দেবো না—কারো হাত দিয়ে পোঁছে দেবো, যাতে পথে না মারা
যায় চিঠিটা।

কিরীটী লিখতে লাগল।

॥ তেইশ ॥

চিঠিটা আমার পড়তে বসে চিঠির শেষে প্রেরকের নামটা যে আপনি শুরুতেই পড়ে দেখবার কৌতুহলটা দমন করতে পারবেন না সেটা আমি জানি বলেই নামটা শুরুতেই আমার জনিয়ে দিছি—আমি কিরীটী রায়।

এবারে বোধ হয় বুঝতে আর আপনার কোন অসুবিধা হবে না, হঠাৎ কিরীটী রায়ের আপনাকে চিঠি লিখবার কি এমন প্রয়োজন হলো! আর কেনই বা এই চিঠি!

চিঠির শুরুতেই আরো একটা কথা আপনার অবগতির জন্য জনিয়ে রাখি, এই চিঠির অন্য দুটি কার্বন কপির একটি শিবপুর থানার ও. সি. সুশীল নন্দী ও অন্যটি কলিকাতার পুলিস কমিশনারের কাছে একই সঙ্গে যাচ্ছে। অবশ্যই স্বীকার করবো, সুশীলবাবুর সক্রিয় সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি আপনাকে হয়ত চিহ্নিত করতে পারতাম না।

অঙ্গীকার করবো না, আপনার হত্যা করবার প্ল্যান বা পরিকল্পনাটা আপনি সুনিপুণভাবে নির্খুত করবার চেষ্টা করেছিলেন একই টিলে দুই পাখী মারতে। এক—মিত্রানীকে হত্যা করতে ও দুই—সেই হত্যার অপরাধটা সম্পূর্ণ নির্দেশ এক তৃতীয় ব্যক্তির কাঁধে চাপিয়ে দিতে। যদিও প্রধানত উদ্দেশ্য ছিল আপনার মিত্রানীকে হত্যা করা।

হত্যার উদ্দেশ্য বা মোটিভ কিন্তু পোস্টমর্টেম বা ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মৃতদেহের উপরে হত্যাকারী তার যৌন লালসা মিটিয়েছে যখনই জানতে পারলাম তখন আর বুঝতে আবার বাকী ছিল না—হত্যাকারীর মিত্রানীর দেহকে ঘিরে ছিল একটা দীর্ঘদিন ধরে যৌনলালসা—যেটা পরিত্বিষ্ণুর কোন পথ না খুঁজে পেয়ে তার বক্রের মধ্যে যেমন একটা ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়ে করেছিল তা নয়, সেই সঙ্গে ঐ নিষ্কলঙ্কতাকে ঘিরে জমেছিল একটা দুর্নির্বার আক্রমণ এবং ঐ দুটিরই বহিঃপ্রকাশ প্রথমে হত্যা ও পরে ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হয়তো আপনার পরিকল্পনা বা প্ল্যানটা এত সহজে বানচাল হয়ে যেতো না, যদি না আপনার ত্রুংয়েল ডেস্টিনির অলিখিত নির্দেশ আমাকে ঘটনাচক্রে টেনে না নিয়ে আসতো মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারে। মিত্রানীর বাবা আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই ক্রীযুক্ত অবিনাশ ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়েই আমি হত্যা-রহস্যের মীরাংসার ব্যাপারটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম।

আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না—সেই নিরীহ, একান্ত শাস্তিপ্রিয় অজাতশক্ত বৃক্ষ মানুষটির বুকে কি নির্মম আঘাতই না আপনি হেনেছেন, মিত্রানীর দেহকে ঘিরে আপনার দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত লালসা ও তাকে পরিত্বিষ্ণু করবার কোন পথ না খুঁজে পেয়ে সেই আক্রমণে অঙ্গ হয়ে।

আপনাকে আমি সত্যি বলছি, যে মুহূর্তে হত্যার মোটিভটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমি স্তুপ্তি হয়ে গিয়েছিলাম এই কথা ভেবে যে মানুষ তার গোপন লালসার

তাগিদে কোন্ গভীর ভয়াবহ অন্ধকারে নেমে যেতে পারে।

সত্যি আমার ভাবতেও দুঃখ লাগে, মিত্রানীর মত অমন একটি মেয়ের মধ্যে আর কিছুই আপনি খুঁজে পেলেন না—পেলেন কেবল তার দেহটাকে ঘিরে একটা জগন্য ‘কুৎসিত যৌনলালসা দীর্ঘদিনের পরিচয়ে! একবারও কি আপনার মনে হয়নি, তার দেহের স্থূল যোন আকর্ষণের চাইতে তার সুন্দর পবিত্র মনের আকর্ষণ অনেক বেশী—সুষমাকে ছেড়ে আপনি নরকের দুর্গন্ধি কাদা নিয়ে ঘাঁটলেন।

যখনই ভাবি মানুষ কোন্ স্তরে নামলে ঐভাবে একজনের কোমল গলায় ঝুমালের মৃত্যু-ফাঁস দিতে পারে, আমি যেন ক্ষমার কথাই ভুলে যাই।

মিত্রানীকে যে আপনি কেনাদিনই পাবেন না, সে সুহাসকে ভালবাসে এবং সুহাসও তাকে ভালবাসে বুঝতে পেরেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন—

কিন্তু সেই সঙ্গে যখন ভাবি নিরপরাধ সুহাসকে আপনি ফাঁসিকাঠের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন, একটা প্রায় দৃষ্টিহীন লোককে আপনি কি চরম দুর্গতির দিকে ঠেলে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন—তখন আপনার যোগ্য বিশেষণ কি খুঁজে পাই না—

(১) আপনি ভেবেছিলেন সুহাস জীবনে যখন কখনো মিত্রানীকে ফোন করেনি, সে সুনিশ্চিত তার গলাটা চিনতে পারবে না—অন্যের গলাকে ফোনে সুহাসের গলা বলেই ভুল করবে—তাতে করে আপনার উদ্দেশ্যও সফল হবে—সজলকে দিয়ে মিত্রানীকে ফোন করালে।

অস্থীকার করবো না—সফল হয়েছিলেন—মিত্রানীও ভুলই করেছিল, কিন্তু অমন সুষ্ঠু প্ল্যানটা বানচাল হয়ে গেল মিত্রানীর ডাইরী থেকে। সে ডাইরীতে ঐ ফোনের কথা লিখে রাখবে আপনি কল্পনাও করতে পারেননি। আর সেই ডাইরীটা আবার একদিন আপনার মৃত্যুবাণ হয়ে আমারই হাতে আসবে—

(২) তারপর ঐ সিঙ্কের ঝুমালটা। সুহাসবাবুর যে ক্ষীণদৃষ্টির স্ময়েগ নিয়ে সেদিন তাঁর অফিসে পিকনিকের কথা বলতে গিয়ে নিঃশব্দে হাতসাফাই করেছিলেন—আপনি কল্পনাও করতে পারেননি সুহাসবাবুর সেই ক্ষীণদৃষ্টিই আপনার মৃত্যুবাণ হয়ে আপনার দিকেই ফিরে আসবে। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

(৩) সুহাসবাবুর দুঃখের ঐ ক্ষীণদৃষ্টি আপনার পরিকল্পনার বা সুষ্ঠু প্ল্যানের আরো একটা ব্যাপার বানচাল করে দিয়েছে—সেটা হচ্ছে সেই চোখে চশমা, মুখে দাঢ়ি, মাথায় বেতের টুপি পরা ভদ্রলোকটি—যাকে আপনাই সাজিয়ে এনেছিলেন ঐদিন বটানিক্যাল গার্ডেনে এবং সম্ভবত আপনার ইচ্ছা ছিল সেই লোকটির প্রতি সুহাসবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কানের কাছে কথাটা বলে করেছিলেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ।

কেবলমাত্র দলের মধ্যে সুহাসবাবুকেই সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পিছনে আপনার প্ল্যান ছিল—পুলিসের দৃষ্টি যাতে সেই অজ্ঞাত পরিচয়নামার প্রতি পড়ে। সকলকে সে কথা বলেননি—বামেলা এড়াবার জন্য—আপনার কথামতই সুহাসবাবু পুলিসের কাছে লোকটির বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাও প্রথমটায় নয়, আমার প্রশ্নের জবাবে সেদিন থানায়। কাজেই বুঝতে পারছেন সুহাসবাবুর ব্যাপারটা মনে ছিল না—মনে থাকবার কথাও নয়।

কিন্তু আপনি আবারও ভুল করে বসলেন—মারাওক ভুল, যেটা আমার কাছে অস্পষ্ট

থাকেনি—সুহাসবাবুর দৃষ্টি এত ক্ষীণ ছিল যে দূর থেকে সেই আপনার সাজানো ব্যক্তিকে দেখে তার নিখুঁত একটা বর্ণনা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না—তিনি যা বলেছেন আমার কাছে সেটা আপনারই লোকটির সম্পর্কে বিবরণের কেবল পুনরাবৃত্তি মাত্র। তারপর সেই টুপি ও বায়নাকুলার—আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় সেও আপনিই লোকটিকে সাপ্লাই করেছিলেন। আপনি একজন ফিল্মের নামী ডিরেক্টরের প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট—অনেক একস্তা নিয়ে আপনার কাজ-কারবার যেমন, তেমনি অনেকেই ফিল্মে একটু চাল পাওয়ার জন্য হয়ত আপনার আশেপাশে ঘুরঘূর করে তোষামোদ করে, তাদেরই একজনকে ঐভাবে সেদিন মেকআপ দিয়ে বেগার দেওয়াতে আপনার অসুবিধা হবার কথা নয়—কিন্তু সেখানেও আবার ভুল করলেন আপনি, অকৃত্তানে তার টুপি ও বায়নাকুলারটা তাকে দিয়ে ফেলে রেখে। সে আপনার কথা মতই কাজ করেছে—সেগুলো ফেলে পালিয়েছে—আর অন্য দিকে আপনার তৈরী ফাঁদে আপনিই আটকা পড়ে গেলেন।

তার নিজের যদি ঐ বায়নাকুলারটা হতো—তাহলে সে অত দামী জিনিসটা ঐভাবে ফেলে পালাত না—তাছাড়া লোকটা পরে নিজের বিপদের সম্ভাবনা দেখেই থানায় সুশীলবাবুর কাছে অকপটে সেদিনকার কথাটা প্রকাশ করে দিত না, বুঝেছেন তো—আবার সেই ভাগের পরিহাস!

(৪) এবারে আসবো সেই মুহূর্তের ঘটনায়। এ কথা সত্যি, আপনি একটা সুযোগ পেয়ে তা ব্যবহার করেছেন এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুই বলবো আপনার—সেদিনকার সংবাদপত্রের ফোরকাস্ট-মত ঠিক সময়ে ধূলোর ঘড় উঠলো—আপনার হাতের মধ্যে এসে গেল সুযোগ—আপনি হত্যা করলেন মিত্রানীকে।

(৫) কিন্তু আপনার প্রতিদিনকার লালসা, মিত্রানীকে ঘিরে যা আপনাকে ক্ষিপ্ত করেছিল—সেই লালসাতেই আপনি সেই মৃতদেহের উপরই বাঁপিয়ে পড়লেন। মার্ডারার সাধারণত দুই রকমের হয়—একটা হয় হ্যাবিচুয়াল মার্ডারার—যারা কোন স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে হত্যা করে—আর এক শ্রেণীর খুনী হচ্ছে যারা লুনাটিক ম্যানিয়াক—আপনি শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর—লালসা আপনাকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

(৬) প্রোবাবিলিটি ও চাঙ্গের দিক দিয়ে আপনাকেই আমি চিহ্নিত করেছি, কারণ আপনিই ছিলেন ধূলোর ঘূর্ণিঘড় ওঠবার পূর্বমুহূর্তে মিত্রানীর একেবারে ঠিক পাশেই এবং মোটিভের কথা তো আগেই বলেছি আপনার। তবু অদৃষ্টের পরিহাস আপনাকে দিয়ে মোক্ষম ভুলটি করিয়ে নিয়েছিল—আপনার মাথার চুলই দলের মধ্যে একমাত্র কটা—সেই রকম একটি চুলই নিহত ও পরে ধর্ষিতা মিত্রানীর ব্লাউজের মধ্যে আটকে ছিল। কাজেই হত্যা করবার পর যদি তাকে না ধর্ষণের চেষ্টা করতেন, ঐ চুলটা তার ব্লাউজে যদি না আটকে থাকতো—আপনাকে সনাক্ত করা কিছুটা কঠিন হতো। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তো, ধর্ষণটা আপনার কত বড় মারাত্মক ভুল হয়েছিল এবং যেটা আপনার আসল এবং আদি ও অকৃত্ম চেহারাটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছে!

॥ চরিত্র ॥

থানায় বসে সুশীল নন্দীও ঐ রাত্রেই কিরীটির লোক মারফৎ প্রেরিত চিঠিটা পড়ছিলেন। চিঠি যত এগিয়ে চলেছে ততই যেন তাঁকে কি এক আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলছে।

বস্তুত কিরীটি যে জোর গলায় বলেছে অনেকবার, মিত্রানীর হত্যাকারী তাদের দলেরই একজন—পরিচিতদেরই একজন—তিনি যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি, কিন্তু আজ কিরীটির চিঠিখনা পড়তে পড়তে বিশ্বয়ের সঙ্গে যেন বিশ্বাস তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠছে।

সুশীল নন্দী পড়তে লাগলেন—

তবে এই সঙ্গে এও আমি স্থীকার করবো, সেদিনকার ফোরকাস্ট আবহাওয়া সম্পর্কে ঠিকমত সত্য হয়ে যাওয়ায় আপনি যে সুযোগটা পেয়েছিলেন সেটা আপনার নির্দেশিতার পক্ষেই গিয়েছিল। আকাশের চাঁদ হঠাতে ঢাকা পড়লে অন্ধকার হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু পরমুহূর্তেই মেঘ অপসারিত হলে যেমন আবার আলো দেখা দেয়—আপনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ধূলোর ঘূণিঘড় ওঠা সত্ত্বেও আপনার অপকীর্তি চাপা থাকেনি। আপনার ভুলগুলো—যা মরা পাখীর পালকের মত চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল, সেগুলোই আপনার মিত্রানীকে হত্যার সাক্ষী দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলোর কথা আগেই বলেছি, এবার শেষ কথায় আসছি।

(৭) আমার প্রথম থেকেই ধারণা হয়েছিল এবং আপনাদেরও বলেছি যে আপনাদের মধ্যেই কেউ সেদিন ঐভাবে মিত্রানীকে হত্যা করেছেন—কিন্তু কেন—কেন আমার এ ধারণা হলো! প্রথমত আপনারা যে সেদিন গার্ডেনে পিকনিক করতে যাবেন—বাইরের কেউ সে কথা জানত না একমাত্র আপনারা কজন ছাড়া—বিতীয়ত সেই চশমাধারী দাঢ়িওয়ালাকে দিয়ে যে গোলকধারার সৃষ্টি করেছিলেন—সেটা তাহলে একমাত্র ক্ষীণদৃষ্টি সুহাসবাবুরই নজরে পড়তো না এবং সেটা পড়েছিল আপনিই সে কথাটা একসময় সুহাসবাবুকে বলায়—আর আপনি জানতেন সুহাসবাবুর ক্ষীণদৃষ্টির কথা। তৃতীয়ত ঝড় ওঠার সঙ্গে আপনি মিত্রানীকে অনুসরণ করেন এবং যেতে যেতে দুজনকে আপনি ধাকা দিয়ে সরিয়ে দেন—সুহাসবাবু ও কাজল বোসকে। চতুর্থত আপনিই মিত্রানীর মৃতদেহটার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—যেহেতু আপনিই একমাত্র ব্যাপারটা তখন পর্যন্ত জানতেন। এবং সেটা অবিলম্বে প্রকাশ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

(৮) আপনার এটাও নিশ্চয়ই ভুল হবে না—মিত্রানীর মৃত্যুটা যে স্বাভাবিক নয় তখনো সেটা কেউ জানতে পারেনি এবং মৃতদেহ তোলবার সময় আপনিই তার গলায় কুমালের ফাঁসটা প্রথমে দেখতে পেয়ে অস্ফুট চিকার করে ওঠেন সকলের জবানবন্দী মতো।

দেখুন কেমন করে আবার অদ্বিতীয়ের পরিহাস আপনাকে দিয়েই আপনার পাপাচারের কথাটা ঘোষিত করালো! একবারও তখন আপনার মনে হয়নি বিদ্যুৎবাবু—

ধৰ্ক করে উঠলো যেন সুশীল নন্দীর এতক্ষণ পরে চিঠির মধ্যে ঐ নামটা পড়ে। বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ সরকারই তাহলে?

কয়েকটা মুহূর্ত বিহুল বিষম্বয়ে স্তুত হয়ে থাকেন সুশীল নন্দী। তারপর আবার পড়তে শুরু করেন—

হ্যাঁ একবারও আপনার ঐ মুহূর্তে মনে হয়নি সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তার গলায় চেপে বসা রুমালের ফাঁসটা অত সহজে কারো চোখে পড়ার কথা নয়, তাছাড়া আপনিই মাথার দিকটা ধরেছিলেন তার ইচ্ছা করে—ঐ কথাটা সকলকে জানাবার জন্য—আবার সেই অদ্বিতীয়ের পরিহাস, আপনি টর্চের আলোয় ব্যাপারটা সকলের দৃষ্টিগোচর করলেন! আপনি একবারও হয়ত ভাবেননি বিদ্যুৎবাবু, হত্যা মানেই পুলিস অনুসন্ধান ও সর্বশেষে আদালতের কাঠগড়া!

যাক—আমার যা বলবার ছিল বললাম। এবার আপনি কি করবেন না করবেন নিজেই ভেবে দেখবেন—তবে জানবেন—ভোর হওয়ার আগেই হয়ত পুলিস আপনার ওখানে হানা দেবে, কারণ আমি তো আগেই বলেছি—আপনাকে লেখা এই চিঠির আরো দুটো কপি একটি সুশীল নন্দীকে ও অন্যটি পুলিস কমিশনারকে একই সঙ্গে পাঠালাম।

আমার কাজ শেষ।

আপনাদের কিরীটী রায়।

তখনো ভাল করে প্রথম ভোরের আলো ফুটে উঠেনি—শেষ রাতের আকাশে তখনও চাঁদের আলোর খানিকটা আভাস লেগে আছে।

পর পর দুখানা পুলিসের জীপ সেই বিরাট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল।

বাড়ির লোকজনদের জাগিয়ে পুলিস অফিসারদের ভিতরে চুক্তে কিছুটা সময় লাগলো। বাড়ির লোক সকলে স্তুতি—বিমৃঢ়।

দোতলার একটা ঘর বাড়ির লোকেরা অফিসারদের দেখিয়ে দিল—দরজাটা বন্ধ ছিল—

ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও যখন ভিতর থেকে কেউ খুললো না—দরজা ভেঙে ফেলল। এবং ঘরে পা দিয়েই ওরা থমকে দাঁড়াল।

মানুষটি বসে আছে চেয়ারে—হাতে ধরা তার কিরীটির চিঠির শেষ পৃষ্ঠাটা ও বাকী দুটো পায়ের কাছে পড়ে আছে।

বিদ্যুৎবাবু—আমরা থানা থেকে আসছি!

কেমন যেন শূন্য বোবা দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ তাকাল অফিসারের মুখের দিকে।

ନଗରନଟୀ

॥ এক ॥

আজকাল আর সুরজিং সন্ধ্যার কিছু পরেই ঠিক বাঁধা টাইমে আসছে না—আগে তো নয়ই বরং আধ ঘটা তিন কোয়ার্টার কখনো কখনো এক ঘটা পরেও আসে। তবে আসে ঠিকই। একদিনও আসা তার বাদ যায় না।

আর সেই কারণেই সন্ধ্যা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মালঞ্চকে প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়—এই সময়টা কোথাও সে বেরতে পারে না।

মালঞ্চ শোবার ঘরে বড় আয়নাটার সামনে একটা ছোট টুলের উপর বসে সাদা হাতীর দাঁতের চিরনিটা দিয়ে চুল অঁচড়াচ্ছিল।

দীর্ঘ কেশ মালঞ্চর। এত দীর্ঘ যে কোমর ছাড়িয়ে যায়। একসময় কেশের দৈর্ঘ্য তার আরো বেশী ছিল—এখন অনেকটা কম। চুল অঁচড়াতে অঁচড়াতে অন্যমনক্ষভাবে মালঞ্চ সামনের মসৃণ আরশির গায়ে প্রতিফলিত তার নিজের চেহারাটার দিকে তাকাচ্ছিল।

নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে ভাল লাগে বেশ মালঞ্চর, বয়স তার যাই হোক—দেহের বাঁধুনি আজও তার বেশ আঁটসাঁটই আছে। গালে ও কপালে অবিশ্য দু'চারটে বক্ররেখা পড়েছে, তা সেগুলো ফেন্স ক্রিমের প্রলেপ পড়লে চট্ট করে তেমন ধরা যায় না। মালঞ্চ অবিশ্য বুঝতে পারে, তার বয়স হচ্ছে আর সেই কারণেই বোধ হয় নিজের দেহচর্চা সম্পর্কে সর্বদাই সজাগ থাকে।

কিছুক্ষণ আগে শহরের বুকে সন্ধ্যা নেমেছে তার ধূসর আঁচলখানি বিছিয়ে। জুন মাস শেষ হতে চলল—এখনও বৃষ্টির চিহ্নই নেই। সারাটা দিন ভ্যাপসা গরম। দুপুরে এখানে ওখানে খানিকটা মেঘ জমেছিল, মনে হয়েছিল বুঝি বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামতে পারে, কিন্তু নামল না।

সুরজিতের আজকাল আসার কোন সঠিক নির্দিষ্ট সময় নেই, তাহলেও সে আসবেই একবার, আর সেই কারণেই প্রতি সন্ধ্যায় মালঞ্চকে সেজেগুজে প্রসাধন করে প্রস্তুত থাকতে হয়।

অনেক সময় মালঞ্চর নিজেকে যেন কেমন ঝোস্ত লাগে।

আজকাল কিছুদিন ধরে মালঞ্চ যেন লক্ষ্য করছে সুরজিতের মধ্যে একটা পরিবর্তন। কেমন যেন একটু গন্তীর-গন্তীর মনে হচ্ছে—বালিগঞ্জের বনেদী পাড়ায় দোতলার একটা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা চুলের মধ্যে সাদা হাতীর দাঁতের চিরনিটা চালাতে চালাতে ভাবছিল মালঞ্চ। একঘলক মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল মালঞ্চর।

মালঞ্চর বুঝতে কষ্ট হয় না, ওটা বেলফুলের গন্ধ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভীরু গলায় ডাক ভেনে এলো পশ্চাত থেকে—মালা!

মালঞ্চ গলা শুনেই বুঝতে পেরেছে কার গলা। মালঞ্চ ফিরেও তাকাল না। যেমন চিরনিটা দিয়ে চুল অঁচড়াচ্ছিল তেমনি তাপন মনে আঁচড়াতেই লাগল।

মালা! আবার সেই ভীরু ডাক।

এবারও মালংশ ফিরে তাকাল না এবং আগের মতই আরশির সামনে চুলে চিরন্তি
চালাতে চালাতে সাড়া দিল, কি চাই?

যে লোকটি একটু আগে হাতে একটা বেলফুলের মালা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল সে এবার
কৃষ্ণত ভাবে বললে, খুব ব্যস্ত, না?

না, বল কি বলবে? মালংশ বললে।

তোমার জন্যে একটা বেলফুলের মালা এনেছি, গলায় পরবে!

পিছনে ফিরে না তাকিয়েই মালংশ নিরাসক কঠে বলল, রেখে যাও ঘরের মধ্যে।

কোন সাড়া এলো না অন্য দিক থেকে।

দরজার উপরেই দাঁড়িয়ে লোকটি, বয়স ৪৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে। সমস্ত শরীরটাই
মানুষটার কেমন বুড়িয়ে গিয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। ভাঙা গাল, সরু চোয়াল, কোটরগত
দুটি চক্ষু। পরিধানে একটা ময়লা পায়জামা, গায়ে একটা হাফ-হাতা সস্তা দামের শার্ট,
মুখে খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি, দু'তিন দিন বোধ হয় লোকটা ক্ষোরকর্ম করে নি।

লোকটা নিঃশব্দে অঙ্গদূরে দাঁড়িয়েই আছে।

কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন! মালংশ বলল, বললাম তো মালাটা ঘরে রেখে যাও।

দাও না গলায় মালাটা, মোড় থেকে দু'টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এলাম!

কে বলেছিল তোমাকে দু'টাকা খরচ করে বেলফুলের মালা আনতে?

কেউ বলেনি, আমারও তো ইচ্ছা যায়—

তাই নাকি! ফিরে তাকাল মালংশ এতক্ষণে।

হ্যাঁ, তাছাড়া সে-সব দিনগুলো ভুলতে পারি কই, রোজ অফিস থেকে ফেরার পথে
তোমার জন্যে এমন দিনে মালা নিয়ে আসতাম, তুমি ঝৌপয় জড়াতে।

—দেখ সুশাস্ত, বাজে কথা রেখে তোমার আসল কথাটা খুলে বল তো এবার।

—আসল কথা আবার কি—সুশাস্ত মৃদু গলায় বলল।

—কি ভাবে তুমি যে, আমি এতই বোকা, কিছু বুঝি না?

নির্ণজর মত হাসতে থাকে সুশাস্ত।

—বোকার মত হেসো না, তোমার ঐ হাসি দেখলে আমার গা জুলে যায়—ঘেঁঘা
করে—ভনিতা রেখে আসল কথাটা বলে ফেল।

সুশাস্ত কোন জবাব দেয় না।

—আমি জানি তুমি কেন এসেছ, কেন ঐ মালা এনেছ।

—কেন?

—টাকা চাই, তাই না?

—না, মানে—

—পরশু চাঞ্চিল টাকা দিলাম, এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল? আমার আজ স্পষ্ট কথা,
টাকা তুমি পাবে না।

—পাবো না! কেমন যেন একটা করুণ আর্তি সুশাস্তের কঠে বেজে উঠল। হাসিটা
নিভে গেল।

—না, তোমার মদের খরচা রোজ রোজ আমি দিতে পারব না। লজ্জা করে না

তোমার, এ বাড়িতে নিচের তলায় চাকরের মত পড়ে আছ, আর একজনের দু'মুঠো
কৃপার অম্বে ফুমিরূপি করছ, গলায় দড়ি জোটে না তোমার—

—দড়ি ঝুটলে সে দড়ি গলায় দেবার সাহস হত না—তা না হলে সুরজিতের
রক্ষিতার কাছে আমি হাত পাতি—

—যেৱা পিণ্ডি বলে একটা সাধারণ বস্তু, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকে, তাও কি
তোমার নেই?

—সব—সবই ছিল মালা, ঐ যে তোমার ঘেমা, পিণ্ডি, লজ্জা, সবই ছিল—কিন্তু
তুমিই আমার বন্ধুহরণ করেছ—

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি—তুমি ছাড়া আর কে?

—থাম! ঘৃণা-মিশ্রিত একটা গর্জন করে ওঠে মালংশ।

—একটু আগে গলায় দড়ি দেবার কথা বলছিলে না মালা—অন্য কেউ হলে হয়তো
এতদিনে দিত, কিন্তু আমি—

—তুমি দিতে পারলে না। তাই না?

—প্রশ়টা যে নিজেকেও নিজে অনেকবার করিনি তা নয়। জানি সব দোষ আমা—

—সেটা বোঝ?

—হয়তো বুঝি বা প্রাপ্তবার চেষ্টা করি, ভাবি—

—আর বুঝবার চেষ্টা করো না! বুঝেছ?

—একটা কথা বলব মালা?

—জানি কি বলবে, আমি শুনতে চাই না।

—আচ্ছা—আবার কি আমরা আমাদের পূর্বের জীবনে ফিরে যেতে পারি না?

—কি বললে?

—জানি তা আর কোন দিনও সম্ভব নয়—আজকের মালংশ আর মালা হতে পারে
না। অনেক পথ হেঁটে আমরা দুজনা দুজনার থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। আজ
তোমায় দেওয়া সুরজিবাবুর এই বাড়িটা, এর সব দামী দামী আসবাব-পত্র, এই প্রাচুর্য
জানি আমার ঘরে থাকলে এসব কিছুই তোমার হত না, কিন্তু—

—বল। থামলে কেন?

—সেদিনও বোধহয় আমি তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই যথাসাধ্য রাখা-র চেষ্টা
করেছি—

—কি বললে, স্বাচ্ছন্দ্য! একটা ভাল কাপড়—একটা গয়না কখনো তুমি দিতে
পেরেছ?

—তবু তুমি একদিন আমার সবকিছু জেনে শুনেই আমার ঘরে এসে উঠেছিলে—

—ভুল—ভুল করেছিলাম। নিত্য ভাত ভাল আর চচড়ি—মাসাস্তে একটা মিলের
শাড়ি—

—তুমি তো জানতে আমার মাইনে কি ছিল—কিছুই তোমার অঙ্গাত ছিল না—কিন্তু
তাহলেও বোধহয় তোমার সম্মান ছিল, ইজ্জত ছিল। সেদিন কারো রক্ষিতা হতে হয়নি
তোমাকে।

জেঁকের মুখে যেন নুন পড়ল, আর কোন কথা বলতে পারে না মালঞ্চ।

—তুমি বুবাবে না মালা, মানুষ কত বড় অপদার্থ হলে তার নিজের স্ত্রীকে অন্য এক পুরুষের রাক্ষিতা হয়ে থাকতে দেয়,—কথাগুলো বলে মালাটা সামনের টেবিলের ওপর রেখে সুশাস্ত ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে ঝগিঝে যায়।

—দাঁড়াও, কত টাকার দরকার তোমার। শ'দুই হলে চলবে?

সুশাস্ত থমকে তাকায় স্ত্রীর মুখের দিকে। হাত পেতে চাইলেও যে কখনো চলিশ-পঞ্চাশটার বেশী টাকা দেয় না, সে কিনা আজ দুশো টাকা দিতে চায়!

—শোন, আমি তোমাকে আরো বেশি টাকা দিতে পারি, তবে একটি শর্তে—

—শর্তে?

—হ্যাঁ। এ বাড়ি ছেড়ে তুমি চলে যাবে, আর কখনো এ বাড়িতে আসবে না। লেখাপড়া তো শিখেছ, একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারো না আবার—

—একবার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, তাও আজ পাঁচ বছর, তাছাড়া বয়সও হয়েছে, এ বয়সে আর কে চাকরি দেবে!

—বল তো আমি সুরজিতকে বলে দেখতে পারি। সে অত বড় অফিসের ম্যানেজার—

—জানি মালা, সুরজিতবাবু হয়তো চেষ্টা করলেই তার রাক্ষিতার প্রাক্তন স্বামীকে যে কোন একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু না, থাক মালা, তোমাকে আমার জন্যে কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি চললাম।

—টাকা নেবে না—এই যে টাকা চাইছিলে?

—না মালা, আচ্ছ চলি। সুশাস্ত ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

বারান্দা পার হয়ে মোজেইক করা সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করে নিঃশব্দে নেমে এলো। কোনদিকেই আর তাকাল না, সোজা গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে শুরু করে সুশাস্ত। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে, পথের দু'পাশে আলোগুলো যেন সেই অন্ধকারকে যতটা তরল করা উচিত ততটা পারছে না।

তবে কি আকাশে মেঘ নামছে? সত্যি কি মেঘ জমছে, এবার বৃষ্টি নামবে—বাতাসে একটা ঠাণ্ডা ভাব, ভিজে ভিজে ভাব!

নামে—নামুক বৃষ্টি।

হঠাৎ যেন যে ফেঁপা বা লজ্জা এতদিন তার মনের মধ্যে জাগেনি সেটাই যেন তার সারা মনকে এই মুহূর্তে আচম্ভ করে ফেলছে।

সত্যিই তো—সে কি মারা গেছে? একটা মৃত মানুষ সে? নচেৎ নিজের স্ত্রী আর একজনের রাক্ষিতা হয়ে যেখানে আছে সেখানে সে কেমন করে পড়ে আছে! শুধু পড়ে থাকাই নয়—দু'বেলা আহার করছে আর নেশার টাকা হাত পেতে নিচ্ছে। হ্যাঁ, মালঞ্চ ঠিকই বলেছে—তার গলায় দড়ি দেওয়াই উচিত ছিল।

বৃষ্টিটা বোধ হয় সত্যি সত্যিই নামবে। নামলে ভিজতে হবে—যে বাড়ি থেকে এই মাত্র সে বের হয়ে এলো! সেখানে বোধ হয় আর সে ফিরতে পারবে না।

একটু মদ হলে বোধ হয় সে অনেকটা সুস্থ বোধ করতে পারত।

ଆଗେ କୋନ ଦିନ ମଦ ସ୍ପର୍ଶର୍ତ୍ତ କରେନି ସୁଶାସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଲଥି ଏକଦିନ ତାର ହାତେ ମଦେର ହୀମ ତୁଳେ ଦିଯେଛିଲ ।

—ନା । ସୁଶାସ୍ତ ବଲେଛିଲ ।

—ଥାଓ, ଦେଖ ତୋମାର ମାଥାର ଭୂତଟା ନେମେ ଯାବେ । ନିଜେକେ ଅନେକଟା ହାଲକା ମନେ କରତେ ପାରସ୍ତେ ।

—ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ଆମି ଥାଇ ?

—ହଁଁ, ଥାଓ ।

—ବେଶ, ଦାଓ—

ଦେଇ ଶୁରୁ—ତାରପର ଚଲେଛେ—ଏଥନ ଆର ନା ହଲେ ଚଲେ ନା ।

ଆବାର ଭାବେ ସୁଶାସ୍ତ, ଆର ସେ ହିନ୍ଦୁହାନ ରୋଡ଼େର ବାଡ଼ିତେ ଫିରେ ଯାବେ ନା । ପାଁଚ ପାଁଚଟା ବଚର ସେ କେମନ କରେ ଛିଲ ବାଲିଗଙ୍ଗେର ହିନ୍ଦୁହାନ ରୋଡ଼େର ଏ ବାଡ଼ିଟାଯ ? ସତିଯିଇ ତାର ମନେ କୋନ ଘ୍ଣା ନେଇ, ଲଜ୍ଜା ନେଇ ।

ସୁରଜିତେର ରକ୍ଷିତାର ବାଡ଼ିତେ ଏକଟା ଘରେ କେମନ କରେ କଟାଲ ସୁଶାସ୍ତ ଏତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଓ ରାତ୍ରିଗୁଲୋ ? ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଲେ ମାଲଥର କାହିଁ ଥିକେ ପଞ୍ଚଶ-ତିରିଶଟା ଟାକା ନିଯେ ବେର ହେଁ ପଡ଼ିବ; ତାରପର ଢାକୁରିଯା ବ୍ରୀଜେର ନିଚେ ଯେ ଲିକାର ଶପଟା ଖୁଲେଛେ ମେଖାନ ଥିକେ ଏକଟା ରାମେର ବୋତଳ କିମ୍ବେ ଲେକେର କୋନ ନିର୍ଜନ ଜାଯଗାଯ ଗିଯେ ବସନ୍ତ ।

ବୋତଳଟା ଶେଷ ହଲେ ଅନେକ ରାତ୍ରେ ଟଲାତେ ଟଲାତେ ସୁରଜିତେର ରକ୍ଷିତାର ବାଡ଼ିର ସାମନେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାତ । ନୀଚେର ତଳାର ଜାନାଲାଟାର ସାମନେ ଭୁଦୁକଟେ ଡାକତ—ରତନ, ଏହି ରତନ, ଦରଜାଟା ଖୋଲୁ ବାବା ।

--ଦାଁଡ଼ାଓ ଖୁଲଛି । ବଲେ ରତନ ଦରଜାଟା ଖୁଲେ ଦିତ । ତାରପର ପ୍ରତି ରାତ୍ରେ ମତନ ବଲତ, ବାବୁ, ମାନଦା ତୋମାର ଥାବାର ତୋମାର ଘରେ ଢାକା ଦିଯେ ରେଖେ ଗିଯେଛେ । ବଲେଇ ରତନ ତାର ଘରେ ଚଲେ ଯେତ । ଆର ସେଇ ତାର ଘରେ ଗିଯେ ଚୁକତ ।

ବୈଶୀର ଭାଗ ରାତ୍ରେଇ ଥେତ ନା ସୁଶାସ୍ତ, କେନ ଯେନ ଗଲା ଦିଯେ ଭାତ, ଡାଳ, ମାଛ, ଦୁଧ, ମିଷ୍ଟି ନାମତେ ଚାହିତ ନା ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ରତନେର କେମନ ଯେନ କୌତୁଳ ହତ ସୁଶାସ୍ତ ସମ୍ପର୍କେ—କେ ଲୋକଟା ? କିନ୍ତୁ ନା ପାରତ ଗିନ୍ଧିମାକେ ଶୁଧୋତେ, ନା ପାରତ ବାଡ଼ିର ଅନ୍ୟ କାଉଁକେ ଶୁଧାତେ ।

ବାବୁ ଆଦେନ ରୋଜ ବିକେଳେ, ରାତ ଏଗାରୋଟା ସାଡେ ଏଗାରୋଟା ନାଗାଦ ଆବାର ତାର ଗାଡ଼ିତେ ଚେପେ ଚଲେ ଯାନ । ଝକ୍କବକ୍କୁକେ ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛୁ ପୂର୍ବେ ବାଡ଼ିର ସାମନେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଯ । ଉର୍ଦ୍ଦି ପରା ଡ୍ରାଇଭାର ନେମେ ଗାଡ଼ିର ଦରଜା ଖୁଲେ ଦେଇ । ସୁରଜିଃ ଘୋଷାଲ ଗାଡ଼ି ଥିକେ ନେମେ କୋନ ଦିକେ ନା ତାକିଯେ ସିଁଡ଼ି ବେଯେ ଦୋତଳାୟ ଉଠେ ଯାନ । ଜୁତୋର ଶବ୍ଦଟା ସିଁଡ଼ିର ମାଥାଯ ମିଳିଯେ ଯାଯ ।

ଆବାର ରାତ ସାଡେ ଏଗାରୋଟା ନାଗାଦ ଜୁତୋର ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଯାଯ । ରତନ ବୁଝିତେ ପାରେ ସୁରଜିଃ ଘୋଷାଲ ବେର ହେଁ ଯାଚେନ । ଡ୍ରାଇଭାର ଗାଡ଼ିର ଦରଜା ଖୁଲେ ଦେଇ । ସୁରଜିଃ ଘୋଷାଲ ଗାଡ଼ିତେ ଉଠେ ବସଲେ ଗାଡ଼ିଟା ହସ କରେ ବେର ହେଁ ଯାଯ ।

ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଜୀବାବ ଏକଦିନ ଗିନ୍ଧିମାର କି ମାନଦାଇ ଦିଯେଛିଲ । ରତନ ପ୍ରଶ୍ନ କରେଛିଲ, ହଁ ଗା ମାନଦା, ରୋଜ ରାତ୍ରେ ବାବୁ ଚଲେ ଯାନ କେନ ବଲତେ ପାରୋ ?

ফিক্ক করে হেসে ফেলেছিল মানদা। বলেছিল ওসব লোকেরা তাদের মেয়েমানুষের
ঘরে রাত কাটায় নাকি! আসে চলে যায়।

—কি বলছ! মেয়েমানুষ! উনি তো বাবুর স্ত্রী, গিন্নীমা—

মৃদু হেসে মানদা বলেছিল, এ পাড়ার সকলে তাই জানে বটে, তবে উনি তো কর্তার
বিয়ে করা ইঞ্জী নন—

রতন কল্পনাও করতে পারেনি, যে, গিন্নীমা সুরজিৎ ঘোষালের বিয়ে করা স্ত্রী নয়।
তাই সত্যিই অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল মানদার মুখের দিকে।

—সত্যি?

—তবে কি মিথ্যে!

—কি করে জানলে? কে বললেন?

—কে আবার বলবে, আমি জানি। উনি বাবুর রক্ষিতা, রক্ষিতাকেই বাবু এ বাড়ি
করে দিয়েছেন।

—বল কি! ভদ্রপাড়ায় বাবু তার রক্ষিতাকে রেখেছেন! পাড়ার লোকেরা কেউ কিছু
বলে না?

—এই কলকাতা শহরে পাশের বাড়ির লোকও পাশের বাড়ির খৌজ রাখে না। আর
রাখলেই বা কি, জানলেও কেউ উচ্চবাচ্য করে না। এনারা সব সভ্য ভদ্রলোক যে গো।
তাছাড়া কে কার রক্ষিতা জানাটা এত সহজ নাকি! এ কি সেই সব পাড়ার মেয়েছেলে,
একেবারে চিহ্নিত করা—

সত্যি! রতনের যেন কথাটা শুনে বিস্ময়ের অবধি ছিল না প্রথম দিন।

মানদা তখনে বলে চলেছে, এ শহরে কত ভদ্রলোকের মেয়েদেরকেই তো দেখলাম,
কত যে অমন দেহ-ব্যবসা চালাচ্ছে তা জানবারও উপায় নেই—

মানদার কথাগুলো শুনলেও কিন্তু সেদিন পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি
রতন। তবে তা নিয়ে আর বেশী মাথাও ঘামায়নি। ঘামাতেই বা যাবে কেন, চাকরি করতে
এসেছে সে, চাকরিই করবে। কন্তা-গিন্নীর ইঁড়ির খবর দিয়ে তার প্রয়োজন কি।

কিন্তু যেদিন রতন জানতে পেরেছিল নীচের তলার ঐ বাবুটি গিন্নীমার স্বামী, রতন
যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল সেদিন। ঐ সংবাদটিও মানদাই পেশ করেছিল তার
কাছে।

—আচ্ছা মানদা, নীচের তলায় যে বাবুটি থাকেন, উনি কে? মধ্যে মধ্যে দেখি
গিন্নীমার ঘরে যান—

মুচকি হেসে মানদা বলেছিল, উনিই তো আমাদের গিন্নীমার স্বামী—

—উনিই গিন্নীমার স্বামী!

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, সুরজিৎ ঘোষালই এ বাড়ির আসল মালিক হলেও গিন্নীমার স্বামী হচ্ছে ঐ
নীচের তলার বাবুটি। এ পাড়ার সবাই জানে ওটা সুশাস্ত মল্লিকের বাড়ি।

সুশাস্ত মল্লিক ব্যবসা করেন। পাড়ার লোকেরা মধ্যে মধ্যে আসে, গল্পগুজবও করে।
সুশাস্ত মল্লিক হেসে হেসে তাদের সঙ্গে কথাও বলে। কিন্তু তারা কেউই অনুমান করতে
পারে না ভিতরের ব্যাপারটা।

॥ দুই ॥

সুশাস্ত হাঁটতে হাঁটতে এনে লোকে ঢুকল। এখন আর লোকে অত মানুষজনের ভিড় নেই, জলের ধার যেঁয়ে গাছতলার নীচে অঙ্ককার একটা বেঁকে বসল সুশাস্ত।

বুকের ভেতরটা আজ এত বছর পরে যেন কি এক ঝুলায় জুলে যাচ্ছে। নিরপায় আক্রোশে যেন নিজেকে ফতবিক্ষিত করে ফেলতে চায়।

এত বড় লজ্জাটা সে বহন করছে এই সাত বছর ধরে, হাঁ, সাত বছরই হবে— বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে আসার আগে যখন তারা হেদুয়ার কাছে একটা গলিতে ছোট দোতলা একটা বাড়ির একতলায় থাকত, তখন থেকেই তো মালঞ্চর অফিসের ম্যানেজার সুরজিৎ ঘোষাল সেখানে যাতায়াত শুরু করেছিল।

মালঞ্চ সুরজিৎ ঘোষালের অফিসে তার পার্সোন্যাল স্টেনো টাইপিস্ট ছিল। সেখান থেকেই দুজনের আলাপ।

বালিগঞ্জের বাড়িতে উঠে আসবার মাস দুই আগেই মালঞ্চ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। না, বাধা দেয়নি সুশাস্ত। সুরজিৎ ঘোষাল এলেই সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেত। আর বাধা দিয়েই বা সে কি করত, মালঞ্চ কি শুনত তার কথা।

স্বামী স্ত্রী, সুশাস্ত আর মালঞ্চ দুজনেই দুটো অফিসে চাকরি করত, হঠাৎ কেন যেন চাকরিটা ছেড়ে দিল সুশাস্ত। মালঞ্চ প্রথমটায় বুঝতে পারেনি যে তার স্বামী চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

আর বুঝবেই বা কি করে, সুশাস্ত সঙ্গে তখন তার সম্পর্কই বা কতটুকু। সুরজিৎ ঘোষালের অনুগ্রহে তখন তার নিয় নতুন দামী দামী শাড়ি আসছে, দু-একটা অলংকারও সেই সঙ্গে গায়ে শোভা পেতে শুরু করেছে।

সুশাস্ত নীরেট বোকা, তাই প্রথমটায় ধরতে পারেনি, ধরতে পেরেছিল অনেক দেরিতে, যখন সুরজিৎ ঘোষাল তাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছিল, তার আগে মধ্যে মধ্যে অফিস থেকে তার ফিরতে দেরি হলে মালঞ্চ সুশাস্তকে বলেছে, অফিসে কাজের চাপ।

নীরেট বোকা সুশাস্ত সরল মনেই কথাটা বিশ্বাস করেছে। চোখ থেকে পদ্মাটা সরে যাওয়া পর্যন্ত তাদের অস্তরন্দতা বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল একদিন।

—মালা, আমি অন্ধ নই, বলেছিল সুশাস্ত।

—অন্ধ হবার তো কোন প্রয়োজন নেই, আর দু'জোড়া চোখ থাকতে অন্ধ হতে যাবেই বা কেন—বলেছিল মালা।

—তুমি তাহলে সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতা হয়েই থাকতে চাও?

মালঞ্চ বোধহয় বুঝতে পারেনি কথাটা অমন স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে সুশাস্ত উচ্চারণ করতে পারে। মুহূর্তের জন্য সে স্তুক হয়ে থাকে, তারপর বলে, সুরজিৎকে আমি ভঙ্গি করি।

—তাই নাকি! তাহলে তোমার আজ প্রয়োজন ডিভোর্সের—কিন্তু শুনে রাখ
মালঞ্চ—তা আমি হতে দেবো না।

—বাধা দিতে পারবে?

—দেবো, আর আমি দেখব আমার এ বাড়িতে যেন সে আর না আসে—।

—তোমার বাড়ি! কিন্তু গত সাত মাস ধরে এ বাড়ির ভাড়া কে দিয়েছে জানো—ঐ
সুরজিং ঘোষালহাঁ।

—মালা!

—হ্যাঁ, আমারও স্পষ্ট কথা শোন, তোমার অসুবিধা হলে তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে
যেতে পারো।

কথাটা শুনে সুশাস্ত যেন কিছুক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বলে, কি
বললে?

—বললাম তো তোমার এখানে না পোষালে তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারো।

—আর যদি না যাই?

—তাহলে বুঝব লজ্জা যেমন বলে কিছুই তোমার নেই—

—তোমাকে আমি খুন করব—বেশ্যা—চরিত্রাহীন—

অতঃপর মালঞ্চ শাস্ত গলায় বলেছিল, Dont shout! আজ পর্যন্ত কি দিয়েছ তুমি
আমায়—আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর, কটা শাড়ি গয়না দিয়েছ বলতে পারো?
একটা অঙ্ককার গলির মধ্যে এই একতলার স্যাতসেতে ঘরে মানুষ কোন দিন সুস্থ থাকতে
পারে? এরই নাম জীবনধারণ! ভুলে যেও না, আমি চাকরি না করলে তোমার ঐ দুশো
টাকায় আজকের দিনে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াই ভুট্টে না। শোন, গোলমাল চেঁচামেচি
করো না, তোমার প্রাপ্য থেকেও তোমাকে আমি বঞ্চিত করছি না, তবে এত বড় সুযোগটা
যখন হাতে এসেছে ছেড়ে দেব কেন?

কি হল সুশাস্ত, তারপর আর একটি কথাও সে বলতে পারেনি। অফিস যাওয়া তার
বন্ধ হয়ে গেল অতঃপর, কেবল রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেটে গেল আরো দু'মাস—

একদিন মালঞ্চ বললে, সুরজিং বালিগঞ্জে আমাকে একটা বাড়ি করে দিয়েছে,
সামনের মাসে আমরা স্থানে উঠে যাব।

সুশাস্ত চাকরিটি তখন আর নেই, সে কেবল স্তৰীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে
চেয়ে থাকে।

মালঞ্চ উঠে এল একদিন বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে। আর আশ্চর্য,
সুশাস্তও সেই বাড়িতে এসে উঠল। মালঞ্চের সঙ্গে মদ্যপান করে করে সুশাস্ত তখন যেন
কেমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

দোতলায় ঘর থাকা সত্ত্বেও নীচের তলারই একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে নিল
সে। মালঞ্চ বলেছিল, নীচে কেন, ওপরের তলায় ঘর রয়েছে আরও। সুশাস্ত মল্লিক কোন
জবাব দেয়নি। মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে গেল সুশাস্তের, আর সে মদের খরচা মালঞ্চই দিত।

অঙ্ককার বেঞ্চের ওপরে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল সে খুন করবে
মালঞ্চকে, কিন্তু কেমন করে খুন করবে? কেন, বিষ দেবে সে। বিষ!

বি. এস.-সিতে কেমিস্ট্রি অনার্স ছিল তার, অনেক ইন্রিজীয় মেটালের নাম জানে সে, যার সামান্য ডোজই মৃত্যু আনে। মালঞ্চর আর বাঁচা চলে না, তাকে মরতেই হবে। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের বধূ আজ এক বারবধূর রূপ নিয়েছে। হ্যাঁ, ওর মরাই উচিত। মালঞ্চকে মরতেই হবে, মাথার মধ্যে সুশাস্ত্র আগুন জুলতে থাকে।

সে রাত্রে জানতেও পারেন মালঞ্চ, সুশাস্ত্র বাঢ়ি ছেড়ে চলে গেছে। জানতে পারল পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ, যখন রতন এসে খবর দিল, মা, নীচের বাবু সেই যে কাল সন্ধ্যার পর বের হয়ে গেছেন আর ফিরে আসেননি—

সোদিনও এল না, পরের দিন রাত্রেও ফিরে এল না সুশাস্ত্র। মালঞ্চ সত্যিই এবার যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, মানুষটা গেল কোথায়? চাকরিবাকরি করে না, হাতে পয়সা নেই, মাথা গোঁজবারও যে কোন ঠাঁই নেই তা সে ভাল করেই জানে, তবে গেল কোথায় মানুষটা? সত্যি সত্যিই তবে এ বাঢ়ি ছেড়ে চলে গেল নাকি!

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে দীর্ঘদিন আগেই চিড় ধরেছিল যেদিন থেকে মালঞ্চ সুরজিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে—তথাপি সুশাস্ত্র যেমন লজ্জা ও অপমান সহ্য করেও এই গৃহেই পড়েছিল তেমনি মালঞ্চরও রীতিমত একটা দুর্বলতা ছিল তাঁর স্বামীর প্রতি। শুধু দুর্বলতা কেন, মালঞ্চর মনের মধ্যে বোধহয় কিছুটা ম. ১. ৫ ছিল এই মানুষটার জন্য।

মালঞ্চ ভাবে এর আগেও তো সে মানুষটাকে কত রাত্তি কথা বলেছে, কিন্তু কখনও তো বাঢ়ি ছেড়ে চলে যায়নি সে, বরং পরের দিন সন্ধ্যাতেই আবার এসে তার কাছে হাত পেতেছে। অথচ সে রাত্রে টাকাও নিল না, তার ওপর ঘর থাকে বের হয়ে গেল।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে থেকে মালঞ্চ শূন্য দৃষ্টি মেলে। হঠাৎ মালাটার দিকে নজর পড়ল মালঞ্চর, যে মালাটা সুশাস্ত্র দুদিন আগে রেখে গিয়েছে। মালা দুটো মালঞ্চ স্পর্শও করেনি, মনেও ছিল না তার মালা দুটোর কথা। মালঞ্চ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ছোট টেবিলটার দিকে—মালা দুটো এখনও পড়ে আছে, কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে।

ঘরের ব্র্যাকেটের ওপর রক্ষিত টেলিফোন বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং করে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মালঞ্চ ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। ওপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো পূরুষ কষ্টে, হ্যালো—

—কে?

—মালঞ্চ? আমি দীপ্তেন।

—বল।

—তুমি কোথাও বেরচ্ছ নাকি?

—না।

—তাহলে আমি আসছি, বুঝলে, এখনি আসছি—

মালঞ্চ কোন সাড়া দিল না। অন্য প্রাণ্টে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হল—মালঞ্চ ফোনটা নামিয়ে রাখল।

অলস ভাবেই তাকাল দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে। সবে পৌনে সাতটা। বাইরে সন্ধ্যার ঘোর নেমেছে। সুরজিং এখন আসবে না, আজ দুদিন ধরেই মালঞ্চ লক্ষ্য করছে

সুরজিতের আসতে সেই নটা সোয়া নটা বাজছে।

সব বুরেই মালঞ্চ দীপ্তিনেকে আসতে মানা করল না।

॥ তিন ॥

আজ এক বছর ধরে দীপ্তিনের সঙ্গে মালঞ্চর আলাপটা জমে উঠেছে। গত বছর মার্টে সে আর সুরজিৎ পুরী গিয়েছিল কয়েক দিনের জন্যে, সেই সময়ই একদিন সীরীচে দীপ্তিনের সঙ্গে মালঞ্চর আলাপ হয়।

বছর বিশ্রিত বয়স হবে দীপ্তিনের, লম্বা চড়ু ধলিষ্ঠ চেহারা। এখনো বিয়েথা করেনি, ব্যাচেলর। বিলেত থেকে কি সব ম্যানেজমেন্ট না কি পড়ে এসেছে। একটা বড় ফার্মে বেশ মোটা মুইনের চাকরি করে।

দীপ্তিন ভৌমিককে দেখেই আকষ্ট হয়েছিল মালঞ্চ, দীপ্তিনও তার প্রতি আকষ্ট হয়েছিল। আলাপ ঘনীভূত হয় কলকাতায় এসে, আজ প্রায় মাস ছয়েক হল। দুপুরে মাঝে মধ্যে তার ওখানে আসতে শুরু করে দীপ্তিন।

একদিন দীপ্তিন হাসতে হাসতে বলেছিল, তোমার স্বামী যদি টের পেয়ে যান?

—এ সময় তো সে থাকে না।

—আরে সেইজন্যেই তো আমি এ সময় আসি, তাহলেও টের পেয়ে গেলে—

—সুরজিৎ আমার স্বামী নয় দীপ্তিন—

দীপ্তিন তো কথাটা শুনে একেবারে বোকা। বলেছিল, কি বলছ তুমি।

—ঠিকই বলছি—

—তবে সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

—We are friends. Just friends!

—ফ্রেন্ডস!

—হ্যাঁ।

—তাহলে তোমার স্বামী? তুমি তো বিবাহিতা?

—তাই, কিন্তু সে থেকেও নেই।

—এ বাড়িটা তবে কার?

—সুরজিৎ আমাকে কিনে দিয়েছে। আমার।

দীপ্তিন মৃদু হেসেছিল মাত্র, তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করেছিল, সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে?

—হয়ে গেল।

—কত দিন হবে?

—তা অনেক দিন হল। তারপরই মালঞ্চ বলেছিল, ও একটা ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ওর স্ত্রী আছে, দুটি ছেলে আছে। বড় ছেলে যুধাজিতের বয়সই তো প্রায় ছবিবিশ—কথাগুলো বলে হাসতে থাকে মালঞ্চ।

—যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—দীপ্তিন বলেছিল।

ଦୀପ୍ତନେର ଏକଟା ତୀର ଆକର୍ଷଣ ଆଛେ, ସେ ଆକର୍ଷଣକେ ଏଡ଼ାତେ ପାରେନି ମାଲକ୍ଷ । ତାହାଡ଼ା ମାଲକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଛିଲ ସୁରଜିଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାରଟା କିଛୁଠେଇ ଜାନତେ ପାରବେ ନା । ମାନଦା ବା ରତ୍ନ କିଛୁ ବଲବେ ନା, କାରଣ ଯାତେ ନା ବଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଲକ୍ଷ କରେଛିଲ ଆର ନୀଚେର ତଳାୟ ଥାକଲେଓ ସ୍ଵାମୀ ସୁଶାସ୍ତ କିଛୁଇ ବଲବେ ନା । କାରଣ ସୁରଜିତେର ସଙ୍ଗେ ସେ କଥାଇ ବଲେ ନା ।

ତବୁ ଦୀପ୍ତନେ ଏକଦିନ ହାସତେ ବଲେଛିଲ, ଏ ବୁଡୋ ଭାଲ୍ମୁକଟାକେ ତୁମି କି କରେ ମହ୍ୟ କର ମାଲକ୍ଷ ?

—ଛି, ଓ କଥା ବଲାତେ ନେଇ ।

—ଓ ତୋ ତୋମାର ବାପେର ବସ୍ତୀ ।

—ତାହଲେଓ ସବ କିଛୁ ଆମାକେ ସେ-ଇ ଦିଯେଛେ ।

—ଏ ସବ ଛେଡେ ଦାଓ, ଚଲେ ଏମୋ ତୁମି ଆମାର ପାଶେର ଫ୍ଲ୍ୟାଟ୍, ଫ୍ଲ୍ୟାଟ୍ଟା ଖାଲି ଆଛେ ।

—କେନ, ତୋମାର କି କୋନ ଅସୁବିଧା ହଛେ ଏଥାନେ ?

—ଅସୁବିଧା ହଛେ ବୈକି । ଆମି ତୋମାକେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ପେତେ ଚାଇ ମାଳା, ଏକମାତ୍ର ଆମାରଇ ହେଁ ଥାକବେ ତୁମି ।

—ସେଟା କି ନିଦାରଣ ଏକଟା ବିଶ୍ୱାସସାତକତା ହବେ ନା ଦୀପ୍ତନେ ? ଯେ ଲୋକଟା ଏତ ଦିନ ଧରେ ଆମାକେ ଏତ ସୁଖ, ପ୍ରାଚୂର୍ୟ ଓ ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦେର ମଧ୍ୟେ ରେଖେଇ, ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ସବ କିଛୁ ଦିଯେଛେ—

—ଆପାତତ ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ନା ଦିତେ ପାରଲେଓ, ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆର ଆରାମ ଆମିତେ ତୋମାକେ ଦିତେ ପାରବ ମାଲକ୍ଷ । ଚଲ ତୁମି ଆମାର ସଙ୍ଗେ, ଅବିଶ୍ୟ ସୁରଜିଂବାବୁକେ ବଲେଇ ଯାବେ, ନା ବଲେ ତୋମାକେ ଯେତେ ବଲାଇ ନା ଆମି ।

—ସେଟା କି ଭାଲ ହବେ ଦୀପ୍ତନେ ?

—କେନ ଭାଲ ହବେ ନା ? ଜାନି ନା କି ପେଯେଛ ତୁମି ଏ ବୁଡୋ ଭାଲ୍ମୁକଟାର ମଧ୍ୟେ ।

ଦୀପ୍ତନେ ଜାନନ୍ତ ନା ଏ ସଂସାରେ ଏମନ ମେଘେମାନୁୟ ଆଛେ ଯାଦେର କାହେ ଦୈହିକ ଆରାମ, ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ସାଚଲ୍ୟଟାଇ ସବ କିଛୁ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ୟେ ନିଜେଦେର ବିଲିଯେ ଦିତେଓ ସିଧା ବୋଧ କରେ ନା । ସ୍ଵାମୀର କାହିଁ ଥେକେ ସେଟା ପାବାର କୋନ ଆଶା ଛିଲ ନା ବଲେଇ ମାଲକ୍ଷ ସୁରଜିଂକେ ଆଁକଢ଼େ ଧରେଛିଲ । ଦେହ ଓ ରାପ ଯୌବନ ତାଦେର କାହେ କିଛୁଇ ନା, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପେଲେ ତାରା ସବକିଛୁଇ କରତେ ପାରେ ।

—ମିନିଟ କୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ଦୀପ୍ତନେ ଏଲୋ । ରାତ ତଥନ ପୌନେ ଆଟଟା ।

—ଏକଟା ପ୍ରେଜେନ୍ଟେଶନ ଏନେହି ତୋମାର ଜନ୍ୟେ—ଦୀପ୍ତନେ ହାସତେ ହାସତେ ବଙ୍ଗଳ ।

—ମାତ୍ର କି ?

—Just guess, ବଲ ତୋ କି ହତେ ପାରେ ?

—କେମନ କରେ ବଲବ ବଲ ।

ପକେଟ ଥେକେ ଦୀପ୍ତନେ ଏକଟା ମରକୋ ଲେଦାରେ ଛୋଟ ବାକ୍ଷ ବେର କରଲ । ବୋତାମ ଟିପତେଇ ବାକ୍ସେର ଡାଲାଟା ଥୁଲେ ଗେଲ—ଭିତରେ ଏକଟା ମୁକ୍ତୋର ନେକଲେସ୍ଟା ମାଲକ୍ଷର ଶଞ୍ଜେର ମତ ଶ୍ରୀବାୟ ପରିଯେ ଦିଲ ।

—ଦେଖି, ଦେଖି—how lovely ! ଦାଓ, ପରିଯେ ଦାଓ ।

ଦୀପ୍ତନେ ମୁକ୍ତୋର ନେକଲେସ୍ଟା ମାଲକ୍ଷର ଶଞ୍ଜେର ମତ ଶ୍ରୀବାୟ ପରିଯେ ଦିଲ ।

—You are really sweet ଦୀପ୍ତନେ । ମାଲକ୍ଷ ଦୁଃଖାତେ ଦୀପ୍ତନେକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରଲ । ଏ

ସମୟ ସୁରଜିତେର ଗାଡ଼ିର ହର୍ଷ ଶୋନା ଗେଲ ।

—সর্বনাশ! সুরজিতের গাড়ির হৰ্ণ! মালঞ্চ বলল, দীপ্তেন, শীত্রি তুমি বাথরুমের পিছনের দরজা খুলে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাও।

—আসতে দাও সুরজিংবাবুকে। তুমি তো পারবে না, আজ আমিই এর চূড়ান্ত ফয়সালা করে নেব—

—না না, তুমি যাও। কেন বুঝতে পারছ না দীপ্তেন, সুরজিং তোমাকে এখানে দেখলেই—

—দেখুক না। তোমার ওপর তারও যেমন অধিকার আছে, আমারও ঠিক তেমনি অধিকার আছে।

—দীপ্তেন, কি করছ? যাও প্লীজ।

—ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। কিন্তু একজনকে তোমাকে বেছে নিতে হবে মালঞ্চ—হয় সুরজিং ঘোষাল, না হয় দীপ্তেন ভৌমিক—দুজনের সঙ্গে তুমি খেলা চালিয়ে যাবে তা দীপ্তেন হতে দেবে না, বুঝে? কথাগুলো বলে দীপ্তেন বাথরুমের মধ্যে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় হাতের সিগ্রেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে ঘষে দিয়ে গেল। সিঁড়িতে তখন সুরজিতের জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মালঞ্চ সুরজিং সম্পর্কে একটু ভুল করেছিল। সে ভেবেছিল তার আর দীপ্তেনের গোপন মিলনের ব্যাপারটা সুরজিং ঘুণাফুণিরও জানতে পারবে না। জানবার একমাত্র উপায় মানদা আর রতন, কিন্তু টাকার লোভে তারা সুরজিতের কানে কথাটা তুলবে না।

কিন্তু তার ঐখানেই হিসেবে ভুল হয়েছিল। রতন বলেনি কিন্তু মানদা সুরজিতের কানে কথাটা আকারে ইঙ্গিতে তুলে দিয়েছিল, সুরজিতের ইদনীং ভাবাস্তরের কারণও তাই। সেটা মালঞ্চ অনুমানও করতে পারেনি।

কিন্তু সুরজিং মুখে কিছু প্রকাশ করেনি, তকে তকে ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। তবু দীপ্তেনকে ধরতে পারেনি সুরজিং, কারণ দীপ্তেন এমনই সময় আসত যখন সুরজিতের আসার সন্তাবনা নেই। দু-একবার তথাপি সে surprise visit দিয়েছে, তবু দীপ্তেনকে ধরতে পারেনি মালঞ্চেই সাবধানতার জন্য।

আজ ঘরে ঢুকেই সুরজিং থমকে দাঁড়াল। মালঞ্চ সুরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে মাদির কটাক্ষে মুখে মৃদু হাসি টেনে বলল, কি সোভাগ্য, আজ একেবারে নির্ধারিত সময়ের আগেই?

—আগে এসে পড়ে তোমার অসুবিধা ঘটালাম মালঞ্চ?

—কি যা-তা বলছ সুরজিং! জানো, আজ মাকেট থেকে মট্টন এনে আমি নিজে স্টু রেঁধেছি তোমার জন্যে, সঙ্গে কি খাবে বল—পরটা না লুচি? কি হল, অমন ভূতের মত দাঁড়িয়ে রাইলে কেন—পোশাক ছাড়বে না?

—বাঃ, তোমার হারটা তো চমৎকার—সুরজিং ঘোষাল বলে ওঠে।

—আমার গলায়! সঙ্গে সঙ্গে হারটার কথা মনে পড়ে যায় মালঞ্চের, মুখের হাসি তার উভে যায়।

—তা কিনলে বুঝি হারটা—না কোন প্রেমিকের প্রেমাপহার?

—ହିଂ ସୁରଜିଃ, ତୋମାର ମନ ଏତ ଛୋଟ ! ହାରଟା ଆମି ଆଜଇ କିନେ ଏନେହି ।

—କୋନ୍ ଦୋକାନ ଥିକେ କିନଲେ ? ସାଙ୍ଗା ମୁକ୍ତେ ବଲେଇ ଯେଣ ମନେ ହଚେ—ବଲତେ ବଲତେ ହଠାତ୍ ସୁରଜିତେର ନଜର ପଡ଼େ ସାମନେର ତ୍ରିପଯେ ଆୟଶଟ୍ଟୋଟାର ଓପର ।

ଏଗିଯେ ଗେଲ ସୁରଜିଃ—ଅର୍ଧଦଳ୍ଖ, ଦୁମଡ଼ାନୋ ସିଗ୍ରେଟ୍ଟା ଅୟଶଟ୍ଟ୍ରେ ଥିକେ ତୁଲେ ନିଲ । ତାରପର ଶାସ୍ତ ଗଲାଯ ସୁରଜିଃ ବଲଲ, ଦୀପ୍ତେମ ଭୌମିକ କଥନ ଏସେଛିଲ ମାଲକ୍ଷ ?

—ଦୀପ୍ତେମ ଭୌମିକ !

—ଆକାଶ ଥିକେ ପଡ଼ାର ଭାବ କୋରୋ ନା ମାଲକ୍ଷ, ବ୍ୟାପାରଟା ଆମାର କାହେ ଆର ଗୋପନ ନେଇ ।

—କି ଗୋପନ ନେଇ ।

—ତୁମି ଯେ ବେଶ କିଛୁକାଳ ଧରେଇ ଦୀପ୍ତେମ ଭୌମିକରେ ସଙ୍ଗେ ମାତାମାତି କରଛ—ଆମି ସେଟା ଜାନି ।

ହଠାତ୍ ସୋଜା ଝଜୁ ହେଁ ଦାଁଡ଼ାଳ ମାଲକ୍ଷ । ବଲଲ, ହୁଁ, ଏସେଛିଲ ।

—କେନ, କେନ ସେ ଏଥାନେ ଆସେ ?

—କୈଫିୟତ ଚାହିଁ ?

—ଚାଉୟାଟା ନିଶ୍ଚଯାଇ ଅନ୍ୟାଯ ନଯ ।

—କିନ୍ତୁ ଭୁଲୋ ନା ସୁରଜିଃ, ଆମି ତୋମାର ବିଯେ କରା ଦ୍ଵୀ ନଇ ।

—ଜାନି, ତୁମି ଆମାର ରକ୍ଷିତା ।

—ଭଦ୍ରଭାବେ କଥା ବଲ ସୁରଜିଃ ।

—ଭଦ୍ରଭାବେ କଥା ବଲବ କାର ସଙ୍ଗେ, ତୋମାର ସଙ୍ଗେ—ଏକଟା ହାର୍ଲଟେର ସଙ୍ଗେ ?

—Shut up !

—ହାରାମଜାଦୀ, ତୁଇ ଆମାରଇ ଖାବି, ଆମାରଇ ଘରେ ଥାକବି, ଆର—

—ବେର ହେଁ ଯାଓ—ମାଲକ୍ଷ ଚିକାର କରେ ଓଡ଼ି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଏ ବାଡି ଥିକେ ବେର ହେଁ ଯାଓ ସୁରଜିଃ—ଏଟା ଆମାର ବାଡି ।

ସୁରଜିତେର ବୋଧହୟ ମନେ ପଡ଼େ ଯାଯ ଯେ ବ୍ସର ଥାନେକ ପୂର୍ବେ ପାକାପୋକ୍ତିଭାବେ ବାଡ଼ିଟାର ଦଲିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରା ହେଁ ଗିଯେଛେ ମାଲକ୍ଷର ନାମେ ।

ତାଇ ବଲେ, ଠିକ ଆଛେ, ଆମି ଯାଚିଛ । କିନ୍ତୁ ତୋକେଓ ଆମି ଛେଡ଼େ ଦେବ ନା ହାରାମଜାଦୀ, ଗଲା ଟିପେ ତୋକେ ଆମି ଶେସ କରେ ଦେବ—ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସୁରଜିଃ ଘର ଥିକେ ହନହନ କରେ ବେର ହେଁ ଗଲ ।

ରାଗେ ମାଲକ୍ଷ ତଥନ ଫୁସଛେ ।

ଏକଟୁ ପରେଇ ମାନଦା ଏସେ ଘରେ ଚୁକଲ ।—କି ହେଁଛେ ମା, ବାବୁ ଚଲେ ଗେଲେନ ?

—ନୀଚେର ଦରଜାଯ ତାଲା ଦିଯେ ଚାବିଟା ଆମାୟ ଏନେ ଦେ ମାନଦା !

—କିନ୍ତୁ ନୀଚେର ବାବୁ ଯଦି ଫିରେ ଆସେନ ?

—ଠିକ ଆଛେ, ଯା । ଆର ହୁଁ, ଶୋନ, ଏଇ ନୀଚେର ବାବୁ ଏଲେ ଆମାକେ ଜାନାବି ।

॥ চার ॥

ব্যাপারটা পরে জানা যায়—আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবারের সন্ধ্যার ঘটনা।

পরের দিন শনিবার, মানদা সকাল পৌনে সাতটা নাগাদ চা নিয়ে এসে দরজা ঠেলে দেখে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ।

প্রথমে ডাকাডাকি করে মানদা, পরে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে মালপ্পর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। মানদা ভয় পেয়ে রতনকে ডেকে আনে। দুজনে তখন আরো জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দেয় আর চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করে, তবু কোন সাড়া নেই—

মানদা ভয় পেয়ে গিয়েছে তখন রীতিমত। কাঁপা কাঁপা গলায় রতনকে বলল, ব্যাপার কি বল তো রতন?

ঠিক এই সময় সিঁড়িতে স্যান্ডেলের শব্দ পাওয়া গেল।

মানদা বলল, এ সময় কে এলো আবার?

মালপ্পর স্বামী সুশাস্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। মাথার চুল ঝক্ষ, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি, পরনের প্যাট আর শাটটা আরো ময়লা হয়ে গিয়েছে।

মানদা সুশাস্তকে দেখে বলে, বাবু, মা ঘরের দরজা খুলছে না।

—খুলবেও না আর কোন দিন—

—সে কি বাবু! কি বলছেন আপনি।

—আমি জানি, শেষ হয়ে গেছে—আমি চললাম—থানায় খবর দাও—তারাই এসে দরজা ভেঙে ঘরে চুকবে—বলে যেমন একটু আগে এসেছিল সুশাস্ত, তেমনি ভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সুশাস্ত কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল না, সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের তলায় নিজের ঘরে গিয়ে চুকল।

ঘণ্টা দুই পরে থানার অফিসার নীচের ঘরে চুকে দেখতে পেয়েছিলেন তঙ্গেপোমের ওপর সুশাস্ত গভীর নিদ্যায় আচ্ছম।

সুশাস্ত কথাগুলো বলে যাবার পর রতন কিছুক্ষণ ঘরের সামনে বারান্দাতে দাঁড়িয়েই থাকে, তারপর মানদার দিকে কেমন যেন বিহুল বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মানদাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তারও মুখে কোন কথা নেই।

কিছুক্ষণ পর রতনের যেন বিহুলতাটা কাটে। সে বলে, তুই কোথাও যাস নে মানদা, আমি থানাতে চললাম—

—থানায়, কেন রে?

—কি বোকা রে তুই। সতিই যদি মা মারা পড়ে থাকেন তাহলে ঘরের দরজা ভেঙে কি আমরা খুনের দায়ে পড়ব?

—খুন! অস্ফুট কঠে চিৎকার করে ওঠে মানদা।

—কে জানে! হতেও তো পারে! কাল এগোরাটা পর্যন্ত যে মানুষটা বেঁচে ছিল হঠাৎ

সে যদি রাত্রে ঘরের মধ্যে মরে পড়ে থাকে! উঁহু বাবা, আমার ভাল ঠেকছে না। নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে—আমি চললাম থানায় খবর দিতে—বলতে বলতে রতন সিঁড়ির দিকে এগুলো।

—এই রতন, আমাকেও তাহলে তোর সঙ্গে নিয়ে চল—মানদা চেঁচিয়ে ওঠে।

—আমাকে সঙ্গে নে! মানদাকে খিঁচিয়ে উঠল রতন, তুই কচি খুকীটি নাকি!

—মাইরি বলছি রতন, আমি এর কিছু জানি না।

—জনিস না তো থানার লোক এসে যখন জিজ্ঞাসা করবে তখন তাই বলবি।

—আমি কাল রাত এগারোটার সময় যখন নীচে চলে যাই মা তখন চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল। জলজ্যাস্ট মানুষটা—

—তাহলে তাই বলবি, আমি আসছি—বলে রতন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

হানীয় থানার দারোগা সুশীল চক্ৰবৰ্তীৰ বয়স খুব বেশী নয়, বছৰ চলিশেক হবে। রতনের মুখে সংবাদটা পেয়েই জনা-দুই সেপাই সঙ্গে নিয়ে তিনি হিন্দুস্থান রোডেৱ
বাড়িতে চলে এলেন।

মানদা তখনও বক্ষ দৱজাৰ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাৰ ঢোখমুখ ফ্যাকাশে। একটা অজ্ঞাত ভয় যেন মানদাকে আচছম কৰে ফেলেছে।

সুশীল চক্ৰবৰ্তী মানদাকে দেখিয়ে রতনকে জিজ্ঞাসা কৰলেন, এ কে?

—আজ্জে বাবু, ও এই বাড়িৰ যি, মানদা।

—ইঁ। কোন্ দৱজা?

—ঐ যে দেখুন না—

—সুশীল চক্ৰবৰ্তী দৱজাটা একবাৰ ঠেললেন—দৱজা ভিতৰ থেকে বক্ষ। জোৱে জোৱে দৱজাৰ গায়ে কয়েকবাৰ ধাক্কা দিলেন—ভিতৰ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

—বিক্ৰম সিং!

—জি হজুৱ!

—দৱজা ভেঙে ফেল।

কিন্তু ঘৰেৱ দৱজা ভাঙ্গ অত সহজ হল না। মজবুজ কাঠেৱ দৱজা, দৱজাৰ গায়ে ইয়েল লক সিস্টেম। অনেক কষ্টে প্ৰায় আধ-ঘণ্টা ধৰে চেষ্টার পৰ বিক্ৰম সিং আৱ হৱদয়াল উপাধ্যায় দৱজাটা ভেঙে ফেলল।

ঘৰেৱ মধ্যে চুকেই সুশীল চক্ৰবৰ্তী থমকে দাঁড়ালেন।

ঘৰেৱ মধ্যে আলো জুলছে তখনো, সব জানলা বক্ষ। মালঝ চেয়াৱেৱ ওপৰ বসে—মাথাটা দৈৰ্ঘ্য বুকেৱ ওপৰ ঝুঁকে আছে, আৱ হাত-পাঁচেক দূৰ থেকেই সুশীল চক্ৰবৰ্তী স্পষ্ট দেখতে পেলেন, একটা পাকানো ৰুমাল মহিলাটিৰ গলায় চেপে বসে আছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে উপবিষ্ট ঐ দেহটাৰ দিকে তাকিয়ে থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন সুশীলবাবু।

চোখ দুটো বিষ্ফারিত, মুখটা দৈবৎ হঁ হয়ে আছে, এবং মুখের ভিতর থেকে জিহুটা সামান্য বের হয়ে আছে। গায়ে হাত দিলেন—শরীর ঠাণ্ডা এবং শক্ত কাঠ। সুশীল চক্রবর্তীর বুঝতে কষ্ট হল না, মহিলাটি অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছেন।

মাথার কেশ বিপর্যস্ত কিছুটা। হাত দুটো দু'পাশে ছড়ানো। গলায় একটা সোনার হার, হাতে পাঁচগাছি করে বর্ফি প্যাটার্নের সোনার চুড়ি ঝক্কাক্ করছে, কানে নীল পাথরের দুটো টাব। পরনে একটা জামদানী ঢাকাই শাড়ি, বুক পর্যস্ত রাউজের বোতামগুলো ছেঁড়া, খালি পা—

হঠাৎ নজর পড়ল সুশীলবাবুর—ঘরময় কতকগুলো বড় বড় মুক্তো ছড়ানো, নীচু হয়ে মেঝে থেকে একটা মুক্তো তুলে নিয়ে হাতের পাতায় মুক্তোটা পরীক্ষা করলেন, একটা বড় মটরের দানার মত মুক্তোটা—ভিতর থেকে একটা নীলাভ দৃতি যেন ঠিকরে বেরচ্ছে। দামী সিংহলী মুক্তো মনে হয়।

স্পষ্ট বোঝা যায়, কেউ গলায় রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে ভদ্রমহিলাকে হত্যা করেছে। মানদা আর রতন তোকেনি, তারা বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুশীল চক্রবর্তী ডাকলেন, ওহে রতন না কি তোমার নাম, ভিতরে এসো।

রতন প্রায় কাঁপতে কাঁপতে এসে ঘরে ঢুকল আর ঢুকেই গৃহকর্ত্তাকে ঐ ভাবে চেয়ারে যসে থাকতে দেখে অস্ফুট একটা ভয়ার্ত চিকার করে উঠল।

—এ কে?

—আজ্জে উনিই আমাদের মা, এই বাড়ির কর্তা।

—তা তোমাদের বাবু—মানে কর্তাবাবু কই, তাকে ডাক তো একবার।

—বাবু তো এখানে থাকেন না আজ্জে।

—থাকেন না মানে?

—আজ্জে রেতের বেলায় থাকেন না। সন্ধ্যার পর আসেন আর রাত এগারোটা সোয়া এগারোটা নাগাদ চলে যান।

—দেখ বাপু, তোমার কথার তো আমি মাথামুণ্ডু' কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবু এখানে থাকেন না—মানে তোমাদের গিন্নীমা একা একা এ বাড়িতে থাকেন?

—আজ্জে একা না, মানদা আর আমি থাকি, আর নীচের ঘরে একজন বাবু থাকেন।

—বাবু! কে বাবু?

—তা তো জানি না আজ্জে, উনি তিনদিন ছিলেন না, আজ সকালেই আবার ফিরে এসেছেন। তিনিই তো বললেন আজ্জে, আমাদের মা বেঁচে নেই, তিনি মরে গেছেন।

সুশীল চক্রবর্তীর কেমন যেন সব গোলমাল ঠেকে। এবং বুঝতে পারেন ব্যাপারটার মধ্যে সত্যিই গোলমাল আছে।

—যাকে ওরা এ বাড়ির মালিক বা বাবু বলছে—তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসেন, আবার রাত্রি এগারোটা সোয়া এগারোটায় চলে যান, অথচ নীচে আর এক বাবু থাকে—মানে কি?

সুশীলবাবু প্রশ্ন করলেন, এ বাড়ির আসল মালিক কে?

—আজ্জে বললাম তো, তিনি এখানে থাকেন না!

- ତାର ନାମଟା ଜାନୋ? କି ନାମ ତାର?
- ଆଜେ ଶୁଣେଛି ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲ ।
- ଆର ନୀଚେ ଯେ ବାବୁ ଥାକେନ, ତାର ନାମ?
- ତା ତୋ ଜାନି ନା ।
- ମେ ବାବୁଟି କେ?
- ତା ଜାନି ନା ।
- ତବେ ତୁମି ଜାନଲେ କି କରେ ଯେ ଏ ବାଡ଼ିର ଆସଲ ମାଲିକ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲ ।
- ଆଜେ ମାନଦାର ମୁଖେ ଶୁଣେଛି ।
- ଡାକ ତୋମାର ମାନଦାକେ । ସୁଶୀଳବାବୁ ବଲଲେନ ।
- ଏହି ମାନଦା, ଘରେ ଆଯ, ଦାରୋଗାବାବୁ କି ଶୁଧାଚେନ । ରତନ ମାନଦାକେ ଡେକେ ଆନଳ ।
ମନେ ହ୍ୟ ମାଥାର ଚୁଲ ପରିପାଟି କରେ ଆଂଚଢାନୋଇ ଛିଲ, ଏଥନ ଏକଟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ପରନେ ଏକଟା
ଭେଲଭେଟପାଡ଼ ମିଳେର ମିହି ଶାଡ଼ି, ଗଲାଯ ଏକଗାଛା ସର୍ବ ହାର, ହାତେ ସୋନାର ରଙ୍ଗି ।
ଚୋଖମୁଖେର ଚେହାରଟା ବେଶ ସୁତ୍ରି ।
- ତୋମାର ନାମ ମାନଦା?
- ଆଜେ ବାବୁ ।
- ଇନି ତୋମାଦେର ଗିନ୍ଧିମା?
- ଆଜେ—କାଂପା କାଂପା ଗଲାଯ ବଲଲ ମାନଦା । ଘରେ ପା ଦେଓଯାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ବ୍ୟାପାରଟା
ନଜରେ ପଡ଼େଛିଲ ତାର ।
- ତୋମାଦେର କର୍ତ୍ତାବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଏର କି ସମ୍ପର୍କ ଛିଲ?
- ଆଜେ ଇନି ସୁରଜିଂବାବୁର ବିଯେ କରା ଇନ୍ଦ୍ରୀ ନନ ।
- ବିଯେ କରା ସ୍ତ୍ରୀ ନନ ।
- ଆଜେ ନା ।
- ଏବାର ସୁଶୀଳବାବୁ ବୁଝାତେ ପାରେନ ମହିଳାଟି ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲେର ରକ୍ଷିତା ଛିଲ । ବଲେନ,
ତାର ମାନେ ଉନି ସୁରଜିଂବାବୁର ରକ୍ଷିତା ଛିଲେନ?
- ହଁ ।
- ଏର କୌନ ଆଜ୍ଞାଯିଷ୍ଵଜନ ଆଛେ?
- ଆଛେ ।
- କେ?
- ଓର ସ୍ଵାମୀ ।
- ସ୍ଵାମୀ! କୋଥାଯ ଥାକେନ ତିନି? ତାର ନାମ ଜାନୋ?
- ଜାନି, ଶୁଶ୍ରାଵବାବୁ—ଏହି ବାଡ଼ିରଇ ନୀଚେର ତଳାଯ ଥାକେନ ।
- ଏଥାନେଇ ଥାକେନ?
- ହଁ ।
- କୋଥାଯ ତିନି?
- ବୋଧ ହ୍ୟ ନୀଚେ ।

- କାଳ ରାତ୍ରେ ବାଡ଼ି ଛିଲେନ ସୁଶାଙ୍କବାବୁ?
- ଆଜେ ତିନଦିନ ଛିଲେନ ନା, ଆଜ ସକାଳେଇ ଏମେହେଳ—
ବ୍ୟାପାରଟା ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର କାହେ ତଥାରେ ପରିଷକାର ହୁଯ ନା । ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆବାର
ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ, ସୁରଜିଂବାବୁ କି ରୋଜ ଆସନ୍ତେନ ଏଥାନେ?
- ତା ଆସନ୍ତେନ ବୈକି ।
- ଆର ଓର୍ଣ ସ୍ଵାମୀ?
- ଏହି ତୋ ଏକଟୁ ଆଗେ ବନ୍ଦୁ, ମେ ମାନୁଯଟାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏର କୋନ ସମ୍ପର୍କିଇ ଛିଲ ନା ।
- ଉନି ଓପରେ ଆସନ୍ତେନ ନା?
- ନା । ତବେ ମାଝେ-ମଧ୍ୟେ ଟାକାର ଦରକାର ହଲେ, ମାନେ ମଦ ଖାବାର ପଯସା ଚାଇତେ
ଆସନ୍ତେନ ।
- କତ ଦିନ ଏ ବାଡ଼ିତେ ଆଛ ତୁମି?
- ତା ବର୍ଷର ଚାରେର ବେଶୀଇ ହବେ ।
- ଆର ଉନି?
- ଉନି କତଦିନ ଏ ବାଡ଼ିତେ ଆଛେନ ଜ୍ଞାନି ନା ବାବୁ, ତବେ ଶୁନେଛି ଏହି ବାଡ଼ିଟା
ସୁରଜିଂବାବୁଇ ଓକେ କିମେ ଦିଯେଛିଲେନ ।
- ଗ୍ୟାରେଜେ ଏକଟା ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲାମ—
- ସୁରଜିଂବାବୁ ଗିଯାମାକେ ଓଟା କିମେ ଦିଯେଛିଲେନ ।
- ଡ୍ରାଇଭାର ନେଇ?
- ଆଜେ ନା, ମା ନିଜେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଲାନ୍ତେନ ।
- ରତନ କତଦିନ ଆଛେ?
- ଓ ଆମର ମାସ ଦୁଇ ପରେ ଆସେ । ତାର ଆଗେ ଏକ ବୁଡ୍ଜୋ ଛିଲ—ଭେରବ, ମେ କାଜ
ହେବେ ଦେବାର ପର ରତନ ଆସେ ।
- ସୁରଜିଂବାବୁ କୋଥାଯ ଥାକେନ ଜାନୋ?
- ଆଜେ କୋଥାଯ ଥାକେନ ଜାନି ନା, ତବେ ଫୋନ ନାହାରଟା ଜାନି ।
- ଶୁଶୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନଦାର କାହେ ଥେକେ ଫୋନ ନାହାରଟା ନିଯେ ଘରେର କୋଣେ ଦେଓୟାଲେର
ବ୍ୟାକେଟେର ଓପରେ ରକ୍ଷିତ ଫୋନଟାର କାହେ ଗିଯେ ରିସିଭାର ତୁଲେ ନିଯେ ନସର ଡାଯାଲ
କରଲେନ । ଏକଜନ ଭଦ୍ରମହିଳା ଫୋନ ଧରଲେନ ।
- ଏଠା କି ସୁରଜିଂବାବୁର ବାଡ଼ି?
- ହଁ ।
- ତିନି ବାଡ଼ିତେ ଆଛେନ?
- ଆଛେନ, ଘୁମୋଛେନ—ଆଧ ସଟ୍ଟା ବାଦେ ଫୋନ କରବେନ ।
- ତାଙ୍କେ ଏକଟିବାର ଡେକେ ଦିନ, ଆମର ଜରୁରୀ ଦରକାର ।
- କେ ଆପନି? କୋଥା ଥେକେ ବଲଛେନ?
- ଆପନି କେ କଥା ବଲଛେନ?
- ଆମି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ।
- ଶୁନୁନ, ବିଶେଷ ଜରୁରୀ ଦରକାର, ଆମି ପୁଲିସ ଅଫିସାର—ଏକବାର ତାଙ୍କେ ଡେକେ
ଦିନ ।

ଏକଟୁ ପରେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଥେକେ ଭାରି ଗଲା ଶୋନା ଗେଲା । ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଳ ବଲଛି!

—ଆମି ବାଲିଗଙ୍ଗ ଥାନାର ଓ.-ସି. ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆପନାଦେର ହିନ୍ଦୁଶାନ ରୋଡ଼େର ବାଡ଼ି ଥେକେ ବଲଛି, ଏଥୁନି ଏକବାର ଏଥାନେ ଚଲେ ଆସୁନ ।

—କି ବ୍ୟାପାର ?

—ଏ ବାଡ଼ିତେ ଏକଜନ ଖୁନ ହେଁଯେଛେ, ଯତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ପାରେନ ଚଲେ ଆସୁନ । ବଲେ ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଫୋନ ରେଖେ ଦିଲେନ ।

—ଓର୍ବ ସ୍ଵାମୀ ନୀଚେର ଘରେ ଥାକେନ ବଲଛିଲେ ନା ? ସୁଶୀଳବାବୁ ଆବାର ମାନଦାକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ ।

—ହଁ ।

—ଚଲ ତୋ ନୀଚେ ।

ଏକଜନ ସେପାଇକେ ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଦାଁଡ଼ କରିଯେ ରେଖେ ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନଦାକେ ନିଯେ ସିଂଡ଼ି ବେଯେ ନୀଚେ ନାମଲେନ । ବାଡ଼ିଟି ଦୋତଳା, ଓପରେ ତିନିଥାନା ଘର, ନୀଚେଓ ତିନିଥାନା ଘର, ଆର ଆଛେ ଦେଡ଼ତଳାୟ ଏକଟା ଘର, ତାର ନୀଚେ ଗ୍ୟାରେଜ ।

ସୁଶୀଳବାବୁ ଯଥିନ ଘରେ ଚୁକଲେନ ଶୁଶ୍ରାନ୍ତ ତଥନ ଘୁମେ ଅଚେତନ ।

ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏକବାର ଘରଟାର ଚାରଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲିଯେ ନିଲେନ । ଏକଟା ବେତେର ଚୟାର, ଏକଟା ଥାଟ । ଏକ କୋଣେ ଦିନିର ଆଲନାଯା ଥାନକ୍ରୟେ ମୟଳା ପ୍ରୟାନ୍ତ, ଶାର୍ଟ, ଲୁଙ୍ଗ ବୁଲଛେ ଆର ଏକ କୋଣେ ଛେଁଡ଼ା ମୟଳା କାବୁଲୀ ଚଙ୍ଗଳ, କାଚେର ପ୍ରାସ ଚାପା ଦେଓଯା ଏକଟା ଜଳେର କୁଞ୍ଜୋ । ଲୋକଟା ଶାର୍ଟ ଆର ପ୍ରୟାନ୍ତ ପରେଇ ଘୁମୋଛେ ।

—ଶୁନଛେନ, ଓ ମଶାଇ—

କର୍ଯ୍ୟକରାର ଡାକେଓ ଘୁମ ଭାଙ୍ଗନ ନା, ଶେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାକ୍କା ଦିଯେ ଶୁଶ୍ରାନ୍ତର ଘୁମ ଭାଙ୍ଗତେ ହଲ ।

ଚୋଥ ରଗଡ଼ାତେ ରଗଡ଼ାତେ ଶୁଶ୍ରାନ୍ତ ଉଠିଲେ ବସଲ, କେ ?

—ଆମି ଥାନା ଥେକେ ଆସଛି, କି ନାମ ଆପନାର ?

—ଆମାର ନାମ ଦିଯେ କି ହେବ ଆପନାର ?

—ଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରଛି ଜବାବ ଦିନ—ଧରିକେ ଉଠିଲେନ ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କି ନାମ ବଲୁନ ?

—ଶୁଶ୍ରାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ।

—ଏ ବାଡ଼ି ଆପନାର ?

—ଆଜେଇ ନା ?

—ତବେ ଏ ବାଡ଼ି କାର ?

—କେ ଜାନେ କାର ।

—ଜାନେନ ନା, ଅର୍ଥଚ ଏ ବାଡ଼ିତେ ଥାକେନ, ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୋ ! ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଳକେ ଚେନେନ ?

—ଚିନବ ନା କେନ ?

—କେ ଲୋକଟା ?

—ଓପରେ ଗିଯେ ମାଲକ୍ଷ ଦେବୀକେ ଶୁଧାନ ନା, ତିନିଇ ଆପନାର ସବ ପ୍ରଶ୍ନେର ଜବାବ ଦେବେନ ।

—ମାଲକ୍ଷ ଦେବୀ କେ ?

ହାସଲ ଶୁଶ୍ରାନ୍ତ, ବଲଲ, ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲେର ମେଯେମାନୁସ ।

—আপনি কে হল মালঞ্চ দেবীর ?

—কেউ না।

—মিথ্যে কথা বলছেন, মানুষ বলছিল উনি আপনার স্ত্রী।

—বাজে কথা, আপনি নিজেই গিয়ে শুধান না ওকে।

—কাকে শুধাব—she is dead.

—তাহলে সত্যি সত্যিই she is dead ! জানেন মশাই, ভেবেছিলাম আমিই ঐ মহৎ কর্মটি করব। অর্থাৎ একদিন হত্যা করব ওকে। কিন্তু তা আর হল না, দেখছি, মাঝখান থেকে হাল্টিটাকে আর একজন এসে হত্যা করে গেল। However I am really glad it is don !

—আপনিও এই বাড়িতেই থাকেন ?

—হ্যাঁ, মালঞ্চ দেবীর দয়ায়।

—এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন, মানে কে বা কারা তাঁকে হত্যা করতে পারে ?

—না মশাই, আমি আদীর ব্যাপারী, আমার জাহাজের সংবাদে কি প্রয়োজন। দেখুন স্যার, তিন রাত আমি ঘুমেইনি ঘুমে শরীর আমার ভেঙে আসছে, Please, আমাকে একটু ঘুমোতে দিন। বলতে বলতে সুশাস্ত আবার খাটের ওপর গা ঢেলে শুয়ে পড়ল।

ঠিক ঐ সময় বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। সুশীল চক্ৰবৰ্তী বাইরে এসে দেখলেন, সৌম্য, সুন্দর, হাস্টপুষ্ট এক প্রোট ভদ্ৰলোক বিৱাট একটা ইমপোর্টেড কার থেকে নামছেন। পৰনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল।

সুশীল চক্ৰবৰ্তী এগিয়ে বললেন, আপনি বোধ হয় সুৱজিৎ ঘোষাল ?

—হ্যাঁ। ফোনে বলেছিলেন কে যেন খুন হয়েছে। বীতিমত উৎকণ্ঠা বাবে পড়ল সুৱজিৎ ঘোষালের কঠে।

—হ্যাঁ, ওপৱে চলুন মিঃ ঘোষাল। আসুন।

সুশীল চক্ৰবৰ্তীৰ পিছনে পিছনে ওপৱে উঠে মালঞ্চৰ শয়নকক্ষে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন সুৱজিৎ ঘোষাল, এ কি ! মালা নেই !

—না মিঃ ঘোষাল, she is dead.

—সত্যি সত্যিই মৃত ?

—হ্যাঁ ঐ দেখুন, গলায় রুমাল পেঁচিয়ে ওঁকে নিষ্ঠুৱভাবে হত্যা কৰা হয়েছে।

—হত্যা কৰা হয়েছে!

—হ্যাঁ।

—কে—কে হত্যা কৰল ?

—সেটা এখনো জানা যায়নি ?

—মালঞ্চকে হত্যা কৰা হয়েছে ! সুৱজিৎ ঘোষাল যেন কেমন বিমুচ্য অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকেন মালঞ্চৰ মৃতদেহটোৱ দিকে।

—মিঃ ঘোষাল !

সুশীল চক্ৰবৰ্তীৰ ডাকে কেমন যেন বোবাদৃষ্টিতে সুৱজিৎ তাকালেন তাঁৰ মুখেৱ দিকে।

—ଏ ବାଡ଼ିଟା କାର ? ସୁଶୀଳ ଚତ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ପ୍ରଶ୍ନ ।

—ଏହି ବାଡ଼ିଟା—ଏଟା—

—କାର ଏ ବାଡ଼ିଟା ? ଏ ବାଡ଼ିର ମାଲିକ କେ ?

—ଏ ମାଲିଖ ।

—କିନ୍ତୁ ଆପନିଇ ଏ ବାଡ଼ିଟା କିନେ ଦିଯେଛିଲେନ ଏ ମାଲିଖ ମଞ୍ଜିକକେ, ତାଇ ନୟ କି ?

—କେ ବଲଲ ଆପନାକେ ?

—ଆମି ଜେନେଛି ।

ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲ ବୋବା ।

—ଆର ଉନି ଆପନାର keeping-ଯେ ଛିଲେନ, ଏଟା କି ସତ୍ୟ ?

—ହଁ—ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲ କୁଠାର ସନ୍ଦେ ମାଥା ନୀଚୁ କରେ ବଲଲେନ ।

—କତ ବଚର ଉନି ଆପନାର କାହେ ଛିଲେନ ? ସୁଶୀଳ ଚତ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ଆବାର ପ୍ରଶ୍ନ ।

—ତା ବୋଧ ହ୍ୟ ବଚର ସାତେକ ହବେ ।

—Quite a long period, ତା କଥନେ ମନୋମାଲିନ୍ୟ ବା ଝଗଡ଼ା-ଟଗଡ଼ା ହ୍ୟାନି ଆପନାଦେର ଦୁଜନେର ମଧ୍ୟେ ?

—ଝଗଡ଼ା ? ନା । ତବେ ଇଦାନୀଂ କିଛୁଦିନ ଧରେ ଆମି ଓ ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଙ୍ଗ ହ୍ୟେଛିଲାମ । She was playing double role with me !

—ଅନ୍ୟ କୋନ ପୁରୁଷ ?

—ହଁ !

—କି ନାମ ତାର ?

—ଦୀପ୍ଣେନ ଭୌମିକ ?

—ତିନି ବୁଝି ଏଥାନେ ଯାତାଯାତ କରତେନ ?

—ହଁ ଏବଂ ଆମାର ଅଗୋଚରେ ।

—କଥାଟା କି କରେ ଜାନତେ ପାରନେନ— if you don't mind ମିଃ ଘୋଷାଲ !

—Somehow first I smelt it. ଆମାର କେମନ ସନ୍ଦେହ ହ୍ୟ—ବୁଝାତେଇ ପାରଛେନ I became alert—ଏବଂ କ୍ରମଶ ସବହି ଜାନତେ ପାରି ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ।

—ଆଜ୍ଞା ଏହି ଯେ ଦୀପ୍ଣେନ ଭୌମିକ, ତିନି କି କରେନ, କୋଥାଯ ଥାକେନ ଜାନେନ ନିଶ୍ଚଯାଇ ?

—ହଁ, ଶୁନେଛିଲାମ ତିନି ବାଲିଗଞ୍ଜେଇ ଲେକ ରୋଡେ ଥାକେନ । ବିଲେତ ଥେକେ ମ୍ୟାନେଜମେନ୍ଟ ନା କି ସବ ପାସ କରେ ଏମେ ବଚର ତିନେକ ହଲ ଏକଟା ଫାର୍ମେ କାଜ କରଛେ । ମୋଟା ମାଇନେ ପାନ ।

—ତା ଦୀପ୍ଣେନବୁର ସନ୍ଦେ ମାଲିଖଦେବୀର ଆଲାପ ହଲ କୀ କରେ ?

—ବଲତେ ପାରେନ ଆମାରଇ ନିବୁଦ୍ଧିତାୟ ।

—କି ରକମ ?

—ଗତ ବଚର ଆମରା ପୁରୀ ବେଡ଼ାତେ ଯାଇ, ସେଥାନେଇ ଆଲାପ ।

—ତାର ବାଡ଼ିର ଠିକାନାଟା ଜାନେନ ?

—ଜାନି ।

ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲେର କାହିଁ ଥେକେ ଠିକାନାଟା ଶୁନେ ସୁଶୀଳ ଚତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲିଖେ ନିଲେନ ତାର ନୋଟିବ୍‌ଟେକ୍ସ୍‌ଟେ ।

—আচ্ছা মিঃ ঘোষাল, তিনি কি ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন?

—না, ওটা একটা মাল্টি-স্টেরিড বিলডিংয়ের চারতলার ফ্ল্যাট, মনে হয় ফ্ল্যাটটা তিনি কিনেছেন।

বিক্রম সিং এই সময় একটা কাগজে করে কতকগুলো মুক্তো এনে সুশীল চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে বলল, স্যার, ঘরের মধ্যে এই পঞ্চাশটা মুক্তো পাওয়া গিয়েছে। আর এই ছেঁড়া সিঙ্কের সুতেটা।

সুশীল চক্রবর্তী কাগজটা সবসমেত মুড়িয়ে পকেটে রেখে বললেন, আপনি কাল এখানে এসেছিলেন, মিঃ ঘোষাল?

—এসেছিলাম।

—কখন?

—রাত্রি সোয়া আটটা নাগাদ।

—তারপর কখন চলে যান?

—আধুনিক পরেই।

—অত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যে?

—কাজ ছিল একটা।

—আচ্ছা মালঝদেবীর স্বামী তো এই বাড়িতেই থাকেন। আপনি কোন আপত্তি করেননি?

—না।

—আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে?

—থাকবে না কেন—

—লোকটিকে কি রকম মনে হয়?

—Most non-interfering, শাস্ত্রশিষ্ট টাইপের মানুষ।

—Naturally!

—আমি কি এখন যেতে পারি মিঃ চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ পাবেন, তবে আপনাকে আমার হয়তো পরে দরকার হতে পারে।

—সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর ফোন করলেই আপনি আমাকে বাড়িতে পাবেন।

সুরজিং ঘোষালকে বিদায় দিয়ে রতনকে আবার ডাকলেন সুশীল চক্রবর্তী। প্রশ্ন করলেন—তোমার নাম রতন—কি?

—আজ্জে রতন সাঁপুই।

—তোমার দেশ কোথায়?

—মেদিনীপুর জেলায় আজ্জে—পাঁশকুড়ায়।

—আচ্ছা রতন, এই সুরজিংবাবু ছাড়া অন্য একজন বাবুও এখানে আসতেন, তাই না?

—আজ্জে হ্যাঁ, দীপ্তেনবাবু।

—কাল রাত্রে দীপ্তেনবাবু এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, সন্ধ্যার মুখেই এসেছিলেন।

—କଥନ ଚଲେ ଗେଲେନ ?

—ଆଜେ କଥନ ଗିଯେଛିଲେନ ବଳତେ ପାରବ ନା—ତାକେ ଆମି ଯେତେ ଦେଖିନି ।

—ହଁ । ଆଚ୍ଛା ଦୀପ୍ତନବାବୁ ଥାକତେ ଥାକତେଇ କି ସୁରଜିଂବାବୁ ଏମେଛିଲେନ ?

—ହଁ ।

—ତାହଲେ ତୋ ଦୁଇନେ ଦେଖାଓ ହାତେ ପାରେ—

—ବଳତେ ପାରବ ନା ଆଜେ—ଦେଖା ହେଯେଛିଲ କିନା—

—ହଁ । କାଳ କତ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମି ଜେଗେ ଛିଲେ ?

—ଆଜେ ମାଥାଯ ସ୍ତର୍ଣ୍ଣା ହେଛିଲ, ତାଇ ସଦରେ ତାଳା ଦିଯେ ଦଶଟା ନାଗାଦ ଶ୍ରେ ପଡ଼େଛିଲାମ । ତାରପରଇ ଘୁମିଯେ ପଡ଼େଛି ।

—ଆଜ ସକାଳେ କଥନ ଘୁମ ଭାଙ୍ଗିଲ ?

—ଭୋର ଛଟା ସାଡେ ଛଟାଯ ମା ଚା ଖେତେନ ଏବଂ ମାର ହାତମୁଖ ଧୋଯା ହେଯେ ଗେଲେଇ ରାନ୍ନା-ଘରେର ବେଳଟା ବେଜେ ଉଠିଲ, ତଥନ ମାନଦା ଚା ନିଯେ ଓପରେ ଯେତ ।

—ଏ ବାଡ଼ିତେ ରାନ୍ନାବାନ୍ନା କେ କରେ, ତୁମି ନା ମାନଦା ?

—ଆଜେ ଆମିଟି ।

—ତାରପର ବଳ—

—ସାତଟା ବେଜେ ଯେତେଓ ସଥିନ ବେଳ ବାଜିଲ ନା ତଥନ ମାନଦା ଚା ନିଯେ ଓପରେ ଯାଇ, ତାରପର ତୋ ଯା ଘଟେଇଁ ଆପଣି ସବ ଶୁଣେଛେମ ।

—ହଁ । ତୋମାର ମାଇନେ କତ—କତ ପେତେ ଏଥାନେ ?

—ଆଜେ ଏକଶୋ ଟାକା, ତାହାରେ ଦୁ-ତିନ ମାସ ପର ପର ଜାମାକାପଡ଼ ପେତାମ, ମାଝେ-ମଧ୍ୟେ ବକଶିମତ୍ତେ—

—ଦୀପ୍ତନବାବୁ ଯେ ଏଥାନେ ଯାତାଯାତ କରନେନ ମେ କଥାଟା ତୁମିଇ ବୋଧ ହ୍ୟ ସୁରଜିଂବାବୁକେ ଜାନିଯେଛିଲେ ?

—ଛିଃ ବାବୁ, ଚକଲି କାଟା ଆମାର ଅଭ୍ୟାସ ନଯ—ଏ ଏମାନଦାର କାଜ । ଏ ମାନଦାଇ ବଲେଇଁ, ବୁଝଲେନ ବାବୁ, ନଚେତ୍ ସୁରଜିଂବାବୁ ଜାନଲେନ କି କରେ, ଆର ତାଇତେଇ ତୋ ଏହି ବିଭାଟ ହଲ ।

—ତୋମାର ଧାରଣା ତାହଲେ ଦୀପ୍ତନବାବୁର ବ୍ୟାପାର ନିଯେଇ—

—ଠିକ ଜାନି ନା ବାବୁ, ତବେ ଆମାର ତୋ ତାଇ ମନେ ହ୍ୟ ।

—ହଁ । ଠିକ ଆଛେ, ଯାଓ । ମାନଦାକେ ଏ ସରେ ପାଠିଯେ ଦାଓ । ଆର ଶୋନ, ଏଥନ ଏ ବାଡ଼ିତେ ପାହାରା ଥାକବେ, ତୁମି କିନ୍ତୁ ଏ ବାଡ଼ି ଛେଡ଼େ ଯାବେ ନା ।

—ଆଜେ ଆମି ତୋ ଭେବେଛିଲାମ ଆଜଇ ଦେଶେ ଚଲେ ଯାବ ।

—ନା, ଏଥନ ତୋମାର ଯାଓଯା ହବେ ନା । ପାଲାବାର ଚେଷ୍ଟା କରଲେ କିନ୍ତୁ ବିପଦେ ପଡ଼ିବେ—ବୁଝେ ? ଯାଓ, ମାନଦାକେ ପାଠିଯେ ଦାଓ—

ମାନଦା ଏଲୋ ।

ଆର ଏକବାର ମାନଦାର ଆପାଦମନ୍ତ୍ରକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରଲେନ ସୁଶୀଳ ଚଞ୍ଚବତୀ, ତାରପର ଜେରା ଶୁରୁ କରଲେନ ।

—ମାନଦା, କାଳ ତୋମାର ସୁରଜିଂବାବୁ କଥନ ଏଥାନେ ଆମେନ ?

—তা ঠিক বলতে পারব না বাবু, ঘড়ি দেখিনি। তবে দীপ্তেনবাবু আসার ঘণ্টাখানেক
পরেই বাবুর গাড়ি এসে থামে।

—দীপ্তেনবাবু তখন কোথায় ছিলেন?

—এই ঘরে।

—তাহলে তোমার বাবুর সঙ্গে দীপ্তেনবাবুর কাল রাত্রে দেখা হয়েছিল বল?

—তা বলতে পারব না বাবু।

—কেন, দীপ্তেনবাবু তো তখন এই ঘরেই ছিলেন বলছ!

—ছিলেন, তবে দেখা হয়েছিল কিনা জানি না। কারণ পরে বাবু চেঁচামেচি করে যখন
বের হয়ে গেলেন তখন ঘরে ঢুকে আমি দীপ্তেনবাবুকে দেখতে পাইনি।

—এ বাড়ি থেকে বেরোবার আর কোন দ্বিতীয় রাস্তা আছে?

—না তো।

—বলছিলে বাবু চেঁচামেচি করছিলেন—কেন চেঁচামেচি করছিলেন তা জানো?

—বোধ হয় ঐ দীপ্তেনবাবুর বাপার নিয়েই—

—দীপ্তেনবাবু যে তোমার বাবুর অনুপস্থিতিতে এই বাড়িতে আসতেন তোমার বাবু
জানলেন কি করে—তুমি বলেছিলে?

—আজ্ঞে না। মা আমাকে মানা করে দিয়েছিলেন, আমি বলতে যাব কেন?

—মিথ্যে কথা। সত্যি বল, তুমই—

—মা কালীর দিবির বাবু, আমি চুকলি কঢ়িনি।

—তুমি মাইনে কত পেতে?

—দেড়শো টাকা।

—বল কি! তা মাইনেটা কে দিত?

—মা-ই দিতেন।

—হঁ। আচ্ছা তুমি যেতে পারো। আর একটা কথা শুনে রাখ, এ বাড়ি থেকে এখন
তুমি বা রতন কেউ কোথাও বেরবে না।

—বেশ, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

—ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।

মানদা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

মালঝর মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন সুশীল চক্রবর্তী, ঐখান থেকেই ফোন
করলেন।

মৃতদেহের ব্যবস্থা করে সুশীল চক্রবর্তী ঘরটা আর একবার ভালো করে পরীক্ষা
করতে শুরু করলেন।

বেশ বড় সাইজের ঘর, মেঝেতে সুন্দর ডিজাইনের টালি পাতা। একধারে একটি
খাটো মোটা ডানলোপিলোর গদির ওপর বিছানা পাতা। দামী একটা বেডকভার দিয়ে
তখনো শয্যাটি ঢাকা, বোঝা যায় গতরাত্রে ঐ শয্যা কেউ ব্যবহার করেনি।

একধারে একটা স্টীলের আলমারি, তারই গা ঘেঁষে বিরাট একটা ড্রেসিং টেবিল তার সামনে বসবার একটা গদি-মোড়া কুশন। ড্রেসিং টেবিলের উপর নানাবিধ দামী দামী প্রসাধন দ্রব্য সাজানো। সবই ফরেন গুডস্। প্রসাধন দ্রব্যগুলো দেখলে মনে হয় মালঞ্চ বীতিমত শৌখিন ছিল।

ঘরে অন্যদিকে একটা ওয়ারড্রোব, তার ওপরে সুন্দর সোনালী ফ্রেমে পাশাপাশি দুটো ফটোই বোধ হয় একসময় ছিল, এখন একটাই মাত্র দেখা যাচ্ছে—মালঞ্চের ফটো।

ফটো-ফ্রেমের সামনে একগোছা চাবিসমেত একটা রূপোর চাবির রিং, এবং তার পাশে রয়েছে একটা দামী লেডিজ রিস্টওয়াচ। ঘড়িটা তখনও চলছে।

ঘরের অন্য কোন সুদৃশ্য জয়পুরী ফ্লাওয়ার ভাসে একগোছা বাসী রজনীগন্ধার স্টিক। তার পাশে একটা মাঝারি সাইজের রেডিওগ্রাম।

ঘরটা দেখা শেষ করে সুশীল চক্রবর্তী ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দরজা ঠেলে বাথরুমে প্রবেশ করলেন।

দীপ্তেন ভৌমিক কাল সন্ধ্যায় এখানে এসেছিল, কিন্তু তাকে রতন বা মানদা কেউই এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে দেখেনি। তবে কোথা দিয়ে লোকটা বের হয়ে গেল কাল রাত্রে? প্রশ্নটা সুশীল চক্রবর্তীর মাথার মধ্যে তখনো ঘোরাফেরা করছে।

ঘরের দরজায় ইয়েল-লক্ করা ছিল, সেই দরজা ভেঙে ওঁরা ঢুকেছেন মালঞ্চের শোবার ঘরে। বাথরুমে দেখা গেল আর একটা দরজা আছে কিন্তু সে দরজাটা বন্ধ। সুশীল চক্রবর্তী আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন এ বাড়িতে ঢোকার সময়—সদরের দরজাতেও ইয়েল-লক্ সিস্টেম।

বাথরুমের দরজা বন্ধ, ঘরের দরজাও বন্ধ ছিল—তবে কোথা দিয়ে কোন পথে দীপ্তেন ভৌমিক এ বাড়ি থেকে গত রাত্রে বের হয়ে গিয়েছিল? তবে কি সকলের অঞ্জাতে এক সময় ঐ সদর দিয়েই বের হয়ে গিয়েছিল?

বাথরুমে দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না, বক্কাকে আয়না লাগানো, বেসিন, ব্র্যাকেটের সঙ্গে লিকুইড সোপ কেস লাগানো, গোটা দুই টুথব্রাশ, টুথ পেস্ট, একটা ট্যালকম পাউডারের কোটো, সাবানের কেস, তাতে সাবান রয়েছে। দেওয়ালের র্যাকে ঝুলছে একটা টাওয়েল আর সিঙ্কের নাইটি।

বাথরুমের পিছনের দরজাটা খুলে ফেললেন সুশীল চক্রবর্তী। একটা ঘোরালো লোহার সিঁড়ি নীচের গলিপথে নেমে গিয়েছে। মেথরদের যাতায়াতের ব্যবস্থায় ঐ সিঁড়ি। দরজাটা বন্ধ করে সুশীল চক্রবর্তী আবার ঘরে ফিরে এলেন।

মর্গে বড় নিয়ে যাবার জন্য একটা কালো ভ্যান এসে গিয়েছে।

ডেড-বড়ি নিয়ে যাবার পর সুশীল চক্রবর্তী ঘরের মধ্যেকার আলমারিটা খুললেন—ঐ চাবির রিংয়ের একটা চাবির সাহায্যে।

হ্যাঙ্গারে নানা রঙের সব দামী দামী শাড়ি ও ব্লাউজ সাজানো। চাবি দিয়ে আলমারির ড্রয়ার খুললেন—একটা চন্দন কাঠের বাক্স—বেশ ভারী—তালা লাগানো ছিল না বাক্সটায়, ডালা তুলতেই দেখা গেল অনেক সোনার গহনা—ডালা বন্ধ করে বাক্সটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন।

ড্রারের মধ্যে একটা প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যে একগাদা একশো টাকার নোট বাণিল বাঁধা, কিছু দশ টাকা ও পাঁচ টাকার নোট, খুচরো পয়সা। আন্দাজে মনে হল একশো টাকার নোট প্রায় হাজার দুই টাকার হবে। আলমারিটা বন্ধ করে, ঘরে ইয়েল-লক্ টেনে দিয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে এলেন সুশীল চক্রবর্তী।

বাইরে মানদা দাঁড়িয়ে ছিল। মানদাকে জিজেস করলেন, এই চাবি কি তোমার মার কাছেই থাকত?

—আজে একটা চাবি বাবুর কাছে আর অনাটা মার কাছে থাকত, মানদা বলল।

—সদরের চাবি তো তাহলে তাঁর কাছেও একটা থাকত?

—হ্যাঁ।

অতঃপর বিক্রম সিংকে বাড়ির প্রহরায় রেখে বাইরে এসে জীপে উঠে বসলেন সুশীল চক্রবর্তী। আসবার সময় আর একবার উকি দিলেন নীচের তলায় সুশাস্ত মল্লিকের ঘরে—সুশাস্ত মল্লিক ঘুমোচ্ছে।

আকাশ কানো হয়ে উঠেছে তখন। গতরাত থেকেই মধ্যে মধ্যে মেঘ জমেছে আকাশে কিন্তু বৃষ্টি নামেনি। পথে যেতে যেতেই ঘূর্মবাম করে বৃষ্টি নামল।

সুরজিংবাবুর বড় ছেলে যুধাজিং পরের দিন তার মার কাছ থেকেই সব ব্যাপারটা জেনেছিল। স্বামীর যে একটা রক্ষিতা আছে, আর তাকে বাড়ি গাড়ি করে দিয়েছেন সুরজিং তাঁর স্ত্রী স্বর্গলতা জানতেন। প্রথম প্রথম স্বামীকে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন স্বর্গলতা, অনেক কাঙ্গাকাটি ও করেছিলেন, কিন্তু স্বামীকে ঐ ডাইনীর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারেননি। অবশেষে চুপ করে গিয়েছিলেন।

ঐ দিন সুরজিংবাবু ফিরতেই স্বর্গলতা শুধালেন, কোথায় গিয়েছিলে এই সাত সকালে?

—কাজ ছিল?

—কি এমন কাজ যে ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটেছিলে গাড়ি নিয়ে?

—মালপঞ্চকে কে যেন খুন করে গিয়েছে—

—সে কি! অশ্বুট একটা আর্তনাদ স্বর্গলতার কঠ চিরে বের হয়ে এলো।

—হ্যাঁ। থানার লোক এসে দরজা ভেঙে তাকে মৃত অবস্থায় দেখেছে।

—তা কি ভাবে মারা গেল গো?

—গলায় ঝুমাল পেঁচিয়ে শাসরোধ করে মারা হয়েছে।

—কি সর্বনাশ! কে—কে করল?

—তা আমি কি করে বলব?

—তুমি জানো না কিছু? প্রশ্নটা করে সন্দিক্ষণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন স্বর্গলতা—সত্ত্ব সত্ত্বিই তুমি জানো না?

স্ত্রীর কঠস্থরে তাকালেন সুরজিং। কয়েকটা মুহূর্ত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর শাস্ত গলায় স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সুরজিং বললেন, কি বলতে চাও তুমি?

- তুমি তো কাল রাত্রেও সেখানে গিয়েছিলে ?
 —তাই কি ? স্পষ্ট করে বল, কি বলতে চাও তুমি ?
 —তুমি কিছুই জানো না ?
 —কি জানব ?
 —কে তাকে হত্যা করল ?
 —জানি না।
 —জানো না ! তাহলে কাল অত রাত করে বাড়ি ফিরেছিলে কেন ?

॥ ছয় ॥

শনিবার সকালে হিন্দুহান রোডের বাড়ির দোতলার দরজা ভেঙে মালঞ্চর মৃতদেহ পুলিস আবিষ্কার করল এবং পরের শুক্রবার মানে ঠিক পাঁচদিন পরে যেন সমস্ত ব্যাপারটা নাটকীয় একটা মোড় নিল। সুরজিং ঘোষাল যা স্বপ্নেও ভাবেননি তাই হল। সংবাদপত্র ব্যাপারটা ফ্লাশ করল।

“বালিগঞ্জ হিন্দুহান রোডের এক দ্বিতল গৃহে, কুমালের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এক মহিলাকে। শোনা যাচ্ছে এই মহিলাটি কোন একটা নামকরা ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নাকি রক্ষিতা ছিল। সেই রক্ষিতাকে ভদ্রলোকটি ওই বাড়িটি কিনে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক নিয়মিত সন্ধ্যায় ঐ রক্ষিতার গৃহে যেতেন এবং রাত্রি এগারোটা সাড়ে এগারোটা অবধি থেকে আবার চলে আসতেন।”

পুলিস বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে যে যেদিন রাতে হত্যা সংঘটিত হয়, সেই দিন সন্ধ্যায়ও অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধ্যাতেও ঐ ভদ্রলোক তার গৃহে গিয়েছিলেন। পুলিস জোর তদন্ত চালাচ্ছে। ঘরের মেঝেতে একটি বহুমূল্য মুক্তির মালা ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আরো সংবাদ যে, যে কুমালের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে ওই স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করা হয়েছে সেই কুমালের এক কোণে নাকি লাল সুতোয় ইংরেজী আদ্যক্ষরে ‘S’ লেখা আছে। এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।”

আগের দিন সন্ধ্যার কিছু পরে, অর্থাৎ সোমবার সুশীল চক্রবর্তী এসেছিলেন পার্ক স্ট্রীটে সুরজিং ঘোষালের গৃহে।

সুরজিং ঘোষাল সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরেছেন তখন। জামা কাপড়ও ছাড়েননি। ভৃত্য সনাতন এসে জানাল, বালিগঞ্জ থানার ও.-সি. সুশীলবাবু দেখা করতে এসেছেন।

সুশীল চক্রবর্তী। চমকে ওঠেন সুরজিং।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন স্ত্রী স্বর্ণলতা। তিনি উদ্বিগ্ন কঢ়ে শুধালেন, বালিগঞ্জ থানার ও. সি. আবার কেন এলো গো ?

—কি করে জানব ! দেখি—সুরজিং ঘোষাল উঠে পড়লেন।

নীচের পার্লারে সুশীল চক্রবর্তী অপেক্ষা করছিলেন। সুরজিং ঘোষাল নীচে এসে পার্লারে প্রবেশ করলেন।

—মিঃ ঘোষাল, এ সময় আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত।

—কি ব্যাপার মিঃ চক্রবর্তী?

—এই কুমালটা দেখুন তো—বলে কাগজে মোড়া একটা কুমাল পকেট থেকে বের করে সুরজিৎ ঘোষালের সামনে ধরলেন সুশীল চক্রবর্তী।

—কুমাল! কেমন যেন অসহায় ভাবে কাগজের মোড়কটার দিকে তাকালেন সুরজিৎ ঘোষাল!

—এই কুমালটার সাহায্যেই সেদিন মালঞ্চ মল্লিককে শাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল! দেখুন তো, এই কুমালটা চিনতে পারেন কি না—

সুরজিৎ ঘোষালের সমস্ত দেহটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেল। মুখে একটিও কথা নেই। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তিনি কুমালটার দিকে। কুমালটার এক কোণে লাল সুতো দিয়েই ইংরেজী ‘S’ লেখা।

—চিনতে পারছেন; কার কুমাল এটা?

—কুমালটা মনে হচ্ছে আমারই—

—এই কুমালটা সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে?

সুরজিৎ ঘোষাল একেবারে যেন বোবা, পাথর।

—আচ্ছা, সে রাত্রে আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে ঠিক কতক্ষণ ছিলেন?

—আধুগন্তা মত হবে।

—তারপর সেখান থেকে বের হয়ে আপনি কোথায় যান?

—কেন, আমি—আমি তো সোজা এখানেই, মানে বাড়িতেই চলে আসি—

—না, আপনি তা আসেন নি। রাত সাড়ে এগারোটার সময় আপনাকে বালিগঞ্জের হরাইজন ক্লাবে ড্রিংক করতে দেখা গিয়েছে।

—কে—কে বললে?

—আমরা সংবাদ পেয়েছি। আপনি যেখানে যেখানে যেতেন সব জ্যাগাতেই আমরা খোঝ নিয়েছি—আপনি হরাইজন ক্লাবে প্রায়ই যেতেন, আপনি সেখানকার মেম্বাৰ। সে রাতে আপনি পৌনে এগারোটা নাগাদ সেই ক্লাবে যান। সুতরাং রাত আটটা নাগাদ যদি আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে থাকেন তাহলে ঐ সময়টা—মানে রাত আটটা থেকে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

—I was feeling very much disturbed—মনটার মধ্যে একটা অস্থিরতা, তাই আমি গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘূরে বেড়াচ্ছিলাম।

—আপনার ড্রাইভার সঙ্গে ছিল?

—না, হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে বরাবর আমি নিজেই ড্রাইভ করে যেতাম। কিন্তু মিঃ চক্রবর্তী, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না—!

—নিহত মালঞ্চ মল্লিকের গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় এই কুমালটা পাওয়া গিয়েছে, আর আপনি স্থীকার করছেন এ কুমালটা আপনারই, আপনি সে রাতে সেখানে গিয়েছিলেন, মানে দুর্ঘটনার রাত্রে। তাছাড়া একমাত্র আপনার কাছেই মালঞ্চৰ ঘরের দরজার এবং বাড়ির সদর দরজার ডুপলিকেট চাবি থাকত। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমি কি বলতে চাইছি।

—ତାହଲେ ଆପନାର କି ଧାରଣା ଆମିଇ ସେ ରାତ୍ରେ ମାଲଞ୍ଚକେ ହତ୍ୟା କରେଛି?

—ସେଟା ଏଥିଲୋ ପ୍ରମାଣ ନା ହଲେও ଏ ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପାରେ ଏକଜନ suspect ହିସାବେ ଆପାତତ ଆପନାକେ ଆମି arrest କରତେ ଏମେହି ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଆପନାକେ ଥାନାଯ ଯେତେ ହବେ।

—ବେଶ ଚଲୁନ । ଲସ୍ବା ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ମୋଚନ କରେ ସୁରଜିଂ ବଲଲେନ ।

ଦଶ ମିନିଟ ପର ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଁର ଜୀପେ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲକେ ତୁଲେ ନିଯେ ଲାଲବାଜାରେ ଦିକେ ଚଲେ ଗେଲେନ ।

ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲକେ ଥାନା ଅଫିସାର ଗ୍ରେଣ୍ଡାର କରେ ନିଯେ ଗିଯେଛେ ଏହି ସଂବାଦଟା ସନାତନଇ ଓ ପରେ ଏମେ କାଂଦତେ କାଂଦତେ ସ୍ଵର୍ଗଲତାକେ ଜାନାଲ । ସ୍ଵର୍ଗଲତା ସଂବାଦଟା ଶୁନେ ଯେନ ପାଥର ହୟେ ଗେଲେନ । ସୁରଜିତେର ବଡ଼ ଛେଳେ ଯୁଧାଜିଂ ଆରୋ ଆଧୟଣ୍ଟା ପରେ ଏଲୋ ଇଉନିଭାରସିଟି ଥେକେ । ସନାତନଇ ତାକେ ପ୍ରଥମ ସଂବାଦଟା ଦିଲ । ଯୁଧାଜିଂଓ ସଂବାଦଟା ଶୁନେ ଏକେବାରେ ସ୍ତର୍ତ୍ତି ସେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ମାର ଘରେ ଗିଯେ ଚୁକଲ ।

—ଏସବ କି ଶୁନଛି ମା?

ସାଶ୍ରନ୍ୟନେ ସ୍ଵର୍ଗଲତା ନିଃଶବ୍ଦେ ଛେଳେର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକାଲେନ ।

—ବାବାକେ arrest କରେ ନିଯେ ଗିଯେଛେ । ମା—ମାଗୋ, କଥା ବଲଛ ନା କେନ?

ସ୍ଵର୍ଗଲତା ଚୋଥେ ଆଁଚଳ ଚାପା ଦିଯେ କେବଳ ଫୁଲେ ଫୁଲେ କାଂଦତେ ଲାଗଲେନ । କେଲେକ୍ଷାରିର କିଛିଇ ଆର ବାକୀ ଥାକବେ ନା—କାଳ ସକାଳେଇ ସଂବାଦପ୍ରେ ନାମଧାର ଦିଯେ ସବ କଥା ହୟତେ ଛେପେ ଦେବେ । ତାରପର ତିନି ମୁଖ ଦେଖାବେନ କି କରେ?

—କେଂଦ୍ରେ ନା ମା, I don't believe, ଆମି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନା ବାବା ଏ କାଜ କରତେ ପାରେନ । ଆମି ଏକ୍ଷୁନି ଆମାଦେର ସଲିସିଟାର ମିଃ ବୋସେର କାଛେ ଯାଛି—ବଲେ ଯୁଧାଜିଂ ଦାଁଡ଼ାଳ ନା । ବେର ହୟେ ଗେଲ ଗାଡ଼ି ନିଯେ ।

ସଲିସିଟାର ମିଃ ନିର୍ମଳ ବସୁ ସବ କିଛୁ ଶୁନେ ବଲଲେନ, ସର୍ବାଗ୍ରେ ସୁରଜିତେର ଜାମିନେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେ ହବେ । ତବେ ହତ୍ୟାର ସନ୍ଦେହେ ତାକେ ଗ୍ରେଣ୍ଡାର କରେଛେ ପୁଲିସ, ହୟତେ ଜାମିନ ଦିତେ ଚାଇବେ ନା, ୩୦୨ ଧାରାର କେସ । ତବୁ ଚଲୁନ, ଏକବାର ଅୟାଡ଼ଭୋକେଟ ମିଃ ଭାଦୁଡ଼ିର କାଛେ ଯାଓୟା ଯାକ ।

ସୋମନାଥ ଭାଦୁଡ଼ି କ୍ରିମିନ୍ୟାଲ ସାଇଡେର ଆଜକେର ସବ ଚାଇଟେନ୍‌ନାମକରା ଅୟାଡ଼ଭୋକେଟ । ତିନି ବ୍ୟାପାରଟାର ଆଦ୍ୟୋପାନ୍ତ ନୀରବେ ଶୁନଲେନ ଯୁଧାଜିତେର କାଛ ଥେକେ, କେବଳ ତାଁର ହାତେର ମୋଟା ଲାଲନୀଲ ପେନସିଲଟା ଦୁ-ଆଙ୍ଗୁଲେର ମଧ୍ୟେ ଘୁରତେ ଲାଗଲ ।

ସବ ଶୁନେ ତିନି ବଲଲେନ, ବ୍ୟାପାରଟା ବେଶ ଜଟିଲ ବଲେଇ ମନେ ହଚ୍ଛେ ନିର୍ମଳବାବୁ, କାଳଇ ଆଦାଲତେ ମିଃ ଘୋଷାଲକେ ସଥିନ ହାଜିର କରା ହବେ, ତଥନ ଆମରା ଜାମିନେର ଜନ୍ୟ ଆର୍ଜି ଫାଇଲ କରବ । ତାରପର ଦେଖା ଯାକ କି ହୟ । ଏକଟୁ ଥେମେ ସୋମନାଥ ଭାଦୁଡ଼ି ଆବାର ବଲଲେନ, ଯୁଧାଜିବାବୁ, ଆଇନେର ଦିକ୍ ଥେକେ ଅତଃପର ଯା କିଛୁ କରବାର ଆମରା କରବ, କରତେଓ ହୟେ ଆମାଦେର, ଏବଂ ଆଇନ ଆଦାଲତେର ବ୍ୟାପାର ତୋ ବୁଝତେଇ ପାରଛେନ, କତଟା ମନ୍ଦାକ୍ରମାନ୍ତା ଗତିତେ ଚଲେ । ଇତିମଧ୍ୟେ ଆମାର ପରାମର୍ଶ ଯଦି ଚାନ ତୋ ଏକଟା କଥା ବଲି ।

—বলুন। যুধাজিৎ বলল।

—এদিকে যা হবার হোক, আপনারা ইতিমধ্যে একজনের সাহায্য নিলে বোধ হয় ভাল করতেন।

—কার সাহায্য?

—কিরীটী রায়ের নাম শুনেছেন?

সঙ্গে সঙ্গে নির্মল বসু বললেন, নিশ্চয়, শুনেছি বৈকি।

—চলুন না, তাঁর কাছে একবার যাওয়া যাক। বিচার বিশ্লেষণের অন্তুত ক্ষমতা মশাই ভদ্রলোকটির। দুটো কেসের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আমি কাজ করে ওঁর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী মনের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছি। তবে ভাবছি তিনি রাজী হবেন কি না—

—কেন, রাজী হবেন না কেন, যা ফিস্ক লাগে—Whatever amount he wants, যুধাজিৎ বলল, I am ready to pay.

সোমনাথ ভাদুড়ী হাসলেন, টাকার অক্ষ দিয়ে তাঁকে রাজী করাতে পারবেন না যুধাজিৎবাবু। টাকা তিনি আবিশ্যি নেন, কিন্তু আসলে গোয়েন্দাগিরি করা ওঁর একটা নেশা। এককালে রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে নেশা ছিল ভদ্রলোকের কিন্তু ইদনীং আর তেমন যেন কোন উৎসাহ দেখি না। রহস্যের ব্যাপারে যেন মাথাই ঘামাতে চান না, তাছাড়া ভদ্রলোক প্রচণ্ড খেয়ালী।

—আপনি যদি একবার অনুরোধ করেন মিঃ ভাদুড়ী—যুধাজিৎ বলল।

। সোমনাথ ভাদুড়ী প্রত্যুভৱে যুধাজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমিই যখন তাঁর নাম করেছি তখন আমি অবশ্যই বলব।

—তাহলে আর দেরি করে লাভ কি, চলুন না এখনই একবার তাঁর কাছে যাই—

—এখন না, কাল বিকেলের দিকে আসুন, যাওয়া যাবে। সকালটা আমায় জামিনের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হবে।

নির্মল বসু বললেন, মিঃ ভাদুড়ী, আমিও কি আসব?

—আসতে পারেন, তবে না এলেও চলে, আমিই যুধাজিৎবাবুকে নিয়ে যাব।

—তাহলে সেই কথাই রইল, আমি না এলে যুধাজিৎবাবুই আসবেন। আজ উঠি—
পরদিন আদালতে পুলিস সুরজিৎ ঘোষালকে হাজির করল।

কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা কি করে জানি সংবাদটা ঠিক পেয়ে গিয়েছিল, ঐদিনকার সংবাদপত্রে সুরজিৎ ঘোষালের গ্রেপ্তারের কাহিনী ছাপা হয়ে গিয়েছে দেখা গেল। সারা কলকাতা শহরে যেন একটা সাড়া পড়ে যায়। এত বড় একজন মানী লোক,—জনসাধারণের কৌতুহল যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়।

আদালতে কিন্তু জামিন পাওয়া গেল না, সরকার পক্ষের কোঁসুলি মিঃ চট্টরাজ তীব্র ভাষায় জামিন দেওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করলেন।

সোমনাথ ভাদুড়ী যদিও বললেন, তাঁর ক্লায়েন্ট সমাজের একজন গণমান্য ও প্রতিষ্ঠিত লোক, তাঁকে জামিনে খালাস দেওয়া উচিত। কিন্তু তার উত্তরে চট্টরাজ বললেন, জামিন দিলে তদন্তের অসুবিধা হবে, চার্জ গঠন করা যাবে না।

জজসাহেব উভয়পক্ষের সওয়াল শুনে সুরজিৎকে আরো দশদিন হাজুত থাকবার

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେନ । ଆରୋ ଦଶଦିନ ପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହଲ ଶୁନାନିର ଦିନ, ପୁଲିସେର ତଦ୍ଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଜନ୍ୟ ।

ବଲାଇ ବାହୁଳ୍ୟ, ପରେର ଦିନେର ସଂବାଦପତ୍ରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେ ଛାପା ହୟେ ଗେଲ । ସୁରଭିଙ୍ ଘୋଷାଲକେ ଜୀମିନ ଦେନନି ଜଜ, ଆରୋ ତଦ୍ଦେ ସାପେକ୍ଷେ ଜେଲ ହାଜରେ ଥାକିବାର ହକ୍କମ ଦେଓୟା ହୟେଛେ । ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଏକଟା କାଳୋ ଛାଯା ଗ୍ରାସ କରିଲ ସୁରଭିଙ୍ ଘୋଷାଲେର ଗୃହକେ ।

॥ ସାତ ॥

କିରୀଟୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା ରାଜୀ ହୟନି ।

ରାତ ଆଟଟା ନାଗାଦ ସୋମନାଥ ଭାଦୁଡ଼ି ତାଁର ଗଡ଼ିଆହଟାର ବାଡ଼ିତେ ଏକଇ ଏମେଛିଲେନ କିରୀଟୀର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ । କିରୀଟୀ ବଲେଛିଲ, ନା ଭାଦୁଡ଼ିମଶାଇ, ଓସବ ଘାଁଟାଘାଁଟି କରତେ ଏ ବୟମେ ଆର ଭାଲ ଲାଗେ ନା, ଆପନାରା ବରଂ ସୁରତର କାହେ ଯାନ । ଆମାର ମନେ ହୟ ସେ କେସଟା ଠିକ ଟ୍ୟାକ୍ଲ କରତେ ପାରବେ ।

—ତା ଜାନି, ମୁଁ ହେସ ସୋମନାଥ ବଲିଲେନ, ତବୁ କିରୀଟୀବାବୁ ଆପନି ହଲେ—

—ଆମିଓ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅୟାଭ୍ରତୋକେଟ ସୋମନାଥ ଭାଦୁଡ଼ି ଯଥନ ଏ ମାମଲା ହାତେ ନିଯମେଛେନ ତଥନ କୋନ ଅବିଚାର ହବେ ନା, ଦୌସି ଠିକଇ ଚିହ୍ନିତ ହବେ ।

ହାସତେ ହାସତେ ସୋମନାଥ ଭାଦୁଡ଼ି ବଲିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଆପନି ଛାଡ଼ା ମାମଲାର ସମସ୍ତ ସୂତ୍ର ଗୁଛିଯେ ଆମାର ହାତେ ତୁଲେ ଦେବେ କେ—କାରଣ ବ୍ୟାପାରଟା ସତିଇ ଆମାର କାହେ ଜଟିଲ ମନେ ହଞ୍ଚେ ରାଯମଶାଇ । ତାଛାଡ଼ା ସୁରଭିଙ୍ ଘୋଷାଲ ସମାଜେର ଏକଜନ ଗଣମାନ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି । ଅବିଶ୍ୱି ରକ୍ଷିତାର ବ୍ୟାପାରଟା ତାଁର ଜୀବନେ ଏକଟା କଲକ । କିନ୍ତୁ ଆଜକେର ଦିନେ ହାତେ ଯାଦେର ପ୍ରୟୋଜନେର ବୈଶୀ ପରସା ଆଛେ, ପ୍ରାୟଇ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଐ ଧରନେର ୫୦% ଦିନା ଦେଇ ।

କିରୀଟୀ ଏବାରେ ହେସ ଉଠିଲ ।

—ହାସଛେନ ରାଯମଶାଇ, ଆମାର ଐସବ ସୋ-କଲାଡ ହାଇ ସୋସାଇଟିର କିଛୁ କିଛୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଓ ଭଦ୍ରମହିଳାର କିଛୁ କିଛୁ ବ୍ୟାପାର-ସ୍ୟାପାର ଜାନବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯା-ଇ ବଲୁନ ହୟେଛେ, ଏମନ demoralised ହୟେ ଗେଛେ ସବ—

—ଆପ୍ତେ ଭାଦୁଡ଼ି ମଶାଇ, ଆପ୍ତେ । କିରୀଟୀ ପୂର୍ବବଂ ହାସତେ ହାସତେଇ ବଲିଲ, ଆପନି ଯାଁଦେର କଥା ବଲିଛେନ ତାଁରା ଓଇ ସବ ବ୍ୟାପାରକେ କୋନ ବ୍ୟାଧି, ପାପ ବା ଅନ୍ୟାଯ କିଛୁ ବଲେ ମନେ କରେନ ନା । ତାଛାଡ଼ା ଓଟା ଏ ଯୁଗେର ଏକଟା କାଲଚାରେର ସାମିଲ ।

—କାଲଚାରଇ ବଟେ । ମେ ଯାକ, ଆପନାକେ କିନ୍ତୁ ସୁରଭିଙ୍ ଘୋଷାଲେର କେସଟା ହାତେ ନିତେ ହେବେ ।

—ଆପନାର କାହୁ ଥେକେ ରେହାଇ ପାବୋ ନା ବୁଝିତେ ପେରେଛି, ବଲୁନ ସବ ବ୍ୟାପାରଟା—ଆପନି ଯତନ୍ଦ୍ର ଜାନେନ ।

ସୋମନାଥ ଭାଦୁଡ଼ି ବଲେ ଗେଲେନ ସବ କଥା । କିରୀଟୀ ନିଃଶବ୍ଦେ ଶୁନେ ଗେଲ, କୋନ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ କରିଲ ନା । ସୋମନାଥ ଭାଦୁଡ଼ିର କଥା ଶେ ହଲେ ପାଇପେ ଟୋବାକୋ ଠାସତେ ଠାସତେ କିରୀଟୀ ବଲିଲ, ତାହଲେ ଏଖାନେଓ ଦେଇ ଏକ ନାରୀ ଓ ତିନଟି ପୁରୁଷର ସଂଯୋଜନ । ଟ୍ରାଯାମ୍ବୁଲାର

ব্যাপার। মালঞ্চ দেবীর স্বামী সুশাস্ত মল্লিক আর দূজন—সুরজিৎ ঘোষাল ও দীপ্তেন ভৌমিক। তিনজনই চাইত এক নারীকে। সুশাস্ত মল্লিক মানে ঐ মালঞ্চের স্বামীটা তো একটা ফুল—নচেৎ স্ত্রীকে একজনের রান্ধিতা হিসাবে allow করে সেই রান্ধিতার আশ্রয়েই থাকতে পারে! তার পয়সায় নেশা করতে পারে! কে জানে, হয়তো সে সত্য সত্যিই মালঞ্চকে ভালবাসত—

—ভালবাসত! না না, ও একটা অপদার্থ।

—তবু তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন না ভাদুড়ীমশাই; এবং বর্তমান মামলায় যে মোটিভ বা উদ্দেশ্য সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সেটা ওর দিক থেকে বেশ strong থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। প্রত্যেক হত্যার ব্যাপারেই আপনি তো জানেন আমাদের সর্বাগ্রে তিনিটি কথা চিন্তা করতে হয়। প্রথমত, হত্যার উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়ত, এক বা একাধিক ব্যক্তি সেই হত্যার আশেপাশে থাকলে হত্যা করার ব্যাপারে কার কত্তুকু possibility বা সম্ভাবনা থাকতে পারে ও তৃতীয়ত, probability, ওদের মধ্যে কার পক্ষে হত্যা করার সবচাইতে বেশী সুযোগ ছিল।

—তাহলে তো রায়মশাই ওদের তিনজনই—

—সেইজন্যেই তো বলছিলাম ভাদুড়ীমশাই, যে বাড়িতে হত্যা সংঘটিত হয়েছে ওদের তিনজনের মধ্যে একজন সেখানে থাকত ও অন্য দূজনের সেখানে সর্বদা যাতায়াত ছিল। কাজেই ওদের তিনজনেরই মালঞ্চকে হত্যা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল বলে ওদের যে কোন একজনের পক্ষে হত্যা করা সম্ভবও ছিল। আর এই মামলায় আপনার সর্বাপেক্ষা বড় সূত্র এইটিই হবে, তাই সর্বাগ্রে আপনাকে ঐ তিনিটি মহাপুরুষের সমস্ত সংবাদ in details সংগ্রহ করতে হবে।

—আর কিছু?

—একটা কথা ভুলে যাবেন না ভাদুড়ীমশাই, দুর্ঘটনার দিন সক্ষ্য থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে প্রথমে দীপ্তেন ভৌমিক ও তার পরে সুরজিৎ ঘোষাল মালঞ্চের কাছে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আপাতত যা আমরা জেনেছি সুশাস্ত মল্লিক সে রাত্রে ঐ বাড়িতে যে উপস্থিত ছিল না সেটা তার সম্পূর্ণ একটা মিথ্যে বয়ান যেমন হতে পারে তেমনি সেটা তার পক্ষে একটা alibi ও হতে পারে।

কিরীটী বলতে লাগল, সুতরাং সন্দেহের তালিকা বা সম্ভাব্য হত্যাকারীর তালিকা থেকে ঐ তিন মহাত্মার একজনকেও আপনি বাদ দিতে পারছেন না আপাতত। All spotted, ওদের প্রত্যেকেরই মালঞ্চকে হত্যা করবার ইচ্ছা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, যদিও অবিশ্য তার কারণটা একজন থেকে অন্যের পৃথক হতে পারে। তাহলেও একটা কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা ঐ একটি নারীকেই কেন্দ্র করে। কি জানেন ভাদুড়ীমশাই, তাস খেলতে বসে রংয়ের টেক্কা কে হাতছাড়া করতে চায় বলুন। না, ভাদুড়ীমশাই, আমার তো মনে হচ্ছে আপনি যতটা ভাবছেন ব্যাপারটা হয়তো ততটা জটিল মানে complicated নয়।

—নয় বলছেন?

—হ্যাঁ। কারণ এ মামলায় মোটিভটা যেদিক থেকেই বিচার করুন না কেন, তিনজনের

যে কোন একজনের অ্যাসেল থেকেই, দেখবেন শেষটায় হয়তো এটাই প্রমাণিত হবে, পাল্লার কাঁটাটা একদিকেই ঝুকছে—towards that woman, আসলে কি জানেন ভাদুড়ী মশাই, সুরজিৎ ঘোষালের মত একজন মানী গুণী সমাজে প্রতিষ্ঠাবান পয়সাওয়ালা ব্যক্তি যদি এই হত্যার সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে জড়িত হয়ে না পড়তেন এবং তার সঙ্গে একটা কলক্ষের ব্যাপার না থাকত তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে যেমন এত হৈচৈ হত না, তেমনি সরকারও এত তেল পোড়াত না।

—কি বলছেন আপনি রায়মশাই?

—আমি মিথ্যা বলিনি ভাদুড়ীমশাই, একটু ভেবে দেখলেই আপনিও বুঝতে পারবেন—সমাজে কি আর কারও রক্ষিতা নেই—নাকি কারও রক্ষিতাকে হত্যা করা হয়নি ইতিপূর্বে? ব্যাপারটা সুরজিৎ ঘোষালের মত এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বলেই মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে না জানি কত রহস্যই আছে। অবিশ্য এও আমি বলব, হত্যা হত্যাই, it's a crime and crime must be punished.

—রায়মশাই, যতটুকু শুনলেন তাতে করে সুরজিৎ ঘোষালকে আপনার—

—দোষী না নির্দোষী কি মনে হয়, তাই না আপনার প্রশ্ন ভাদুড়ীমশাই—সেটা তো এই মুহূর্তে কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়, কারণ আমরা আপাতত যে মোটিভ ভাবছি হত্যার হয়তো সে মোটিভ আদৌ ছিল না। আর সেটার যদি কোন হিসেব পাই তাহলে হয়তো দেখব তিনজনের মধ্যে দুজন সহজেই eliminated হয়ে গিয়েছে, আর সেরকম হলে হয়তো হত্যার ব্যাপারটাই একটা সম্পূর্ণ অন্য রূপ নেবে, কাজেই সবটাই এখন তদন্ত সাপেক্ষ।

—তা ঠিক, তবে আপনাকে ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা করার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—

—আপনি black sheep-কে ব্যাক করছেন কিনা, তাই না ভাদুড়ীমশাই?

—তাই—

কিরীটী বললে, সে আরো পরের কথা, আপনি ডিফেন্স কোঁসুলী, এগিয়ে যেতে হবে, আপনি দিন কতক বাদে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অবিশ্য তেমন কিছু জানতে পারলে আমিও আপনার কাছে যেতে পারি।

—তাহলে আজ আমি উঠি—

—আসুন, আর যুধাজিৎবাবুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—ঠিক আছে।

কিছুদিন যাবৎ কিরীটীর মধ্যে যে নিষ্ক্রিয়তা চলছিল, সোমনাথ ভাদুড়ী চলে যাবার পর মালঞ্চর হত্যার ব্যাপারটা চিন্তা চিন্তা করতে করতে সেটা যেন তার অঙ্গাতেই আপনা থেকে সক্রিয়তার দিকে মোড় নেয়। এবং প্রথমেই যেটা তার মনে হয়, আঞ্চলিক থানার ও. সি. সুশীল চক্রবর্তীর সাহায্যই তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর একেবারে অপরিচিত নয়, তাছাড়া কিরীটী জানে তার মাথার মধ্যে কিছু বস্তু আছে, তার মস্তিষ্কের গ্রে সেলগুলো সাধারণের চাইতে একটু বেশীই সক্রিয়, তার প্রমাণও কিছুদিন আগে একটা হত্যা মামলার ব্যাপারে পেয়েছিল কিরীটী।

কিরীটী আর দেরী করে না, জংলীকে ডেকে হীরা সিংকে গাড়ি বের করতে বলে দিল।

গায়ে জামা চড়াচ্ছে কিরীটী, কৃষণ এসে ঘরে ঢুকল।—বেকচ্ছ নাকি কোথাও? রাত্রি তখন প্রায় দশটা। কিরীটী বললে, হঁয়, একবার থানায় যাচ্ছ, সুশীল চক্ৰবৰ্তীৰ সঙ্গে দেখা কৰতে হবে।

—মালংঞ্চৰ হত্যা মামলাটা তাহলে তুমি accept কৰলে?

—কি কৰি, ভাদুড়ীমশাইকে না কৰতে পাৱলাম না।

—তা কাল সকালে গেলেই তো হয়।

—তা হয়, তবে এখন হয়তো তাকে একটু ফি পাবো।

আসলে কিন্তু কৃষণ খুশিই হয়েছে। ইদানীং তাৰ স্বামীৰ ঐ ধৰনেৰ নিষ্ঠিয়তা কৃষণৰ আদৌ যেন ভাল লাগছিল না। মানুষটাৰ হাতে যথনই কোন কাজ থাকে না তখনই তাৰ মুখে এক বুলি—কিরীটী রায় বুড়ো হয়ে গিয়েছে।

কৃষণ প্ৰতিবাদ জানায়, চুল পাকলেই মানুষ কিন্তু বুড়িয়ে যায় না।

কিরীটী হাসতে হাসতে বলে, বয়স হলে বুড়িয়েই যায়।

—কত বয়েস হয়েছে তোমাৰ?

—হিসাব কৰে দেখ সজলী, চৌষট্টি—সিঙ্গটি ফোৱ।

—তাহলে আমিও তো বুড়ি হয়ে গিয়েছি, আমাৰও তো বয়েস—

কিরীটী বলে উঠেছে, না, তোমাৰ বয়স আমাৰ চোখে বাড়েনি—

—আমাৰ চোখেও তুমি বুড়ো হয়ে যাওনি, বুঝেছ—

কৃষণ বললে, বেশী রাত কোৱো না কিন্তু।

—না, তড়াতাড়ি ফিৱৰ।

॥ আট ॥

সুশীল চক্ৰবৰ্তী থানাতেই ছিলেন।

কয়দিন ধৰে তিনি মালংঞ্চৰ হত্যা ব্যাপারটা নিয়েই সৰ্বদা ব্যস্ত, এখানে ওখানে ছেটাচৰ্টি বৰতে হচ্ছে তাঁকে। অফিস ঘৰে বসে কতকগুলো কাগজপত্ৰ দেখছিলেন সুশীল চক্ৰবৰ্তী। কিরীটীকে ঘৰে ঢুকতে দেখে চেয়াৰ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্প কঠে তিনি বললেন, একেই বলে বোধ হয় মনেৰ টান দাদা, আসুন, আসুন।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, তাই নাকি?

—হঁয়, আজ দুদিন থেকে আপনাৰ কথাই ভাবছিলাম দাদা।

—তাই বোধ হয় আমাৰও তোমাৰ কথা মনে পড়ল। তা ব্যাপার কি বল তো, হিন্দুহান রোডেৰ মাৰ্ডাৰ কেসটা না কি?

—হঁয় দাদা—

—আমিও কিন্তু এসেছিলাম সেই ব্যাপারেই সুশীল।

—সত্যি! বসুন দাদা। তা আমাদেৱ বড়কৰ্তাদেৱ পক্ষ থেকে, না সুৱজিৎ ঘোষালেৱ পক্ষ থেকে?

—আপাতত বলতে পাৱো আমাৰ নিজেৰ পক্ষ থেকেই। এখনো কেসটা আমি কাৱো

পক্ষ থেকেই নিইনি ভায়া।

—কেসটা কিন্তু বেশ জটিলই মনে হচ্ছে দাদা—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—সত্যিই জটিল কিনা সেটা জানবার জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি ভায়া, তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে যা তোমার মনে হয়েছে বা হচ্ছে সেটা আমায় বল তো।

সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর অনুরোধে সেই প্রথম দিন থেকে মালঞ্চর হত্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা যা জেনেছেন একে একে সব বলে গেলেন এবং বলা শেষ করে বললেন, কি রকম মনে হচ্ছে দাদা ব্যাপারটা, সত্যিই কি বেশ একটু জটিলই নয়?

—খুব একটা জটিল বলে কিন্তু মনে হচ্ছে না, ভায়া। কিরীটী বলল, আমি বুঝতে পারছি মালঞ্চর হত্যার বীজটা কোথায় ছিল—

—বুঝতে পারছেন?

—হ্যাঁ, তুমিও একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে! একটি নারীকে ঘিরে—যে নারীর মধ্যে মনে হয় তীব্র যৌন আকর্ষণ ছিল—এক ধরনের নারী, যারা সহজেই পুরুষের মনকে রিরংসায় উদ্বৃদ্ধ করে তোলে, সেইটাই এই হত্যার বীজ হয়ে ক্রমশ ডালপালা বিস্তার করেছিল বলেই আমার অনুমান।

—একটা বুঝিয়ে বলুন দাদা—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—তিনটি পুরুষ একেত্রে—সুরজিৎ ঘোষাল ও দীপ্তেন ভৌমিক দুজনে বাইরের পুরুষ আর তৃতীয়জন মালঞ্চর হতভাগ্য স্বামী সুশাস্ত মল্লিক ঘরের জন। মালঞ্চর যৌন আকর্ষণে ঐ তিনজন মালঞ্চকে ঘিরে ছিল।

—কিন্তু সুশাস্ত মল্লিক তো তার স্ত্রীকে—

—ভুলে যেও না, স্ত্রী ভট্টা হওয়া সত্ত্বেও সুশাস্ত তার আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি আর পারেনি বলেই তার স্ত্রী অন্যের রক্ষিতা জেনেও সেই স্ত্রীর সাম্রাজ্য থেকে দূরে সরে যেতে পারেনি, হিন্দুহান রোডের বাড়িতেই পড়ে ছিল। তার স্ত্রী অন্যের রক্ষিতা জেনেও তারই হাত থেকে প্রতাহ মদের পয়সা ভিক্ষা করে নিয়েছে।

তারপর—একটু থেমে কিরীটী বলতে লাগল, তার স্ত্রী তার কাছে অপ্রাপ্যীয়া জেনেও তার মনের রিরংসা তাকে সর্বক্ষণ পীড়ন করেছে। তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এমনও তো হতে পারে ভায়া, সেই অবদমিত রিরংসা থেকেই কোন এক সময়ে একটা শ্ফুলিঙ্গ তার মনের মধ্যে আকর্ষিক আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত ঐ হত্যাকাণ্ডটা ঘটে গিয়েছে।

—কিন্তু যতদূর জানা গিয়েছে ঐ ব্যাপারের তিন দিন আগে থাকতেই সুশাস্তবাবু এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—হ্যাঁ গিয়েছিল, কিন্তু হত্যার পরের দিনই তার প্রত্যাবর্তন। চলেই যদি গিয়েছিল তো আবার ফিরে এলো কেন? এবং ফিরে এলো যে রাত্রে হত্যাটা সংঘটিত হয় তারই পরদিন প্রত্যুষে। এর মধ্যে দুটো কারণ কি থাকতে পারে না?

—দুটো কারণ?

—হ্যাঁ, প্রথমত, যারা কোন বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে কাউকে হত্যা করে তাদের মধ্যে একটা সাইকেলজি থাকে, হত্যার আনন্দকে চরম আনন্দে তুলে দেবার জন্যে

আবার তারা অকুস্থলে ফিরে আসে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সকলের মধ্যে উপস্থিত থেকে সেই চরম আনন্দকে রসিয়ে উপলব্ধি করবার জন্যে। এবং দ্বিতীয়ত, সুশাস্ত মল্লিক হয়তো অকুস্থল থেকে ঘটনার সময় দূরে থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে তার নির্দেশিতাটুকুই, *an alibi*.

সুশীল চক্রবর্তী বললেন, আমি দাদা অতটা—

—তালিয়ে দেখনি, তাই না ভায়া, কিন্তু কথাটা ভাবা উচিত ছিল না কি তোমার?

—ভাবছি আপনি বুবলেন কি করে যে সুশাস্ত মল্লিককে আমি সত্যি কিছুটা eliminate করেছিলাম—

—সে তো তোমার কথা শুনেই বুবতে পেরেছিলাম। তুমি যত গুরুত্ব দিয়েছ এই দুজনের ওপরেই—সুজিৎ ঘোষাল আর দীপ্তেন ভৌমিক। কিন্তু খুনের মামলার তদন্তে অমন বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা তোমার অবহেলা করা উচিত হয়নি।

—কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছেন?

—ঐ যে তোমার এ সুশাস্ত মল্লিকের হাঠাঁ অপ্রত্যাশিত ভাবে অকুস্থলে আবির্ভাব ও তার সেই কথাগুলো—‘দরজা আর খুলবে না’, রতন আর মানদা যখন কিছুতেই দরজা খোলতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমৃত হয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কথাটা সে বলল কেন? এমনি একটা কথার কথা, না কি জেনেশুনেই সে মালঝর মৃত্যুর ব্যাপারটা ঘোষণা করেছিল? যাকগে, rather late than never—তুমি দীপ্তেন ভৌমিকের সঙ্গে কথা বলেছ?

—বলেছি, গত পরশুই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে তো কাছাকাছিই লেক রোডে থাকে, কিন্তু দেখা পাইনি। অফিসের কাজে নাকি তিনি আগের দিন পাটনায় গিয়েছেন আর আজকালের মধ্যেই তাঁর ফেরার কথা। বলে এসেছি এলেই থানায় রিপোর্ট করতে—

ঐ সময়ে থানার সামনে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ পাওয়া গেল এবং একটু পরেই একজন সুন্তোষজনক এসে ঘরে ঢুকলেন।

—কি চাই? সুশীল চক্রবর্তীই প্রশ্ন করলেন।

—এখানকার ও. সি.-কে।

—আমিই—বলুন কি দরকার?

—আমার নাম দীপ্তেন ভৌমিক।

নাম কানে যেতেই কিরীটী দীপ্তেন ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে দেখল। বেশ বলিষ্ঠ লম্বা চওড়া চেহারা, সুন্তোষজনক এসে ঘরে ঢুকলেন।

—বসুন মি: ভৌমিক—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—আমার খোঁজে আপনি আমার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। দীপ্তেন বললেন।

—হ্যাঁ, আপনি জানেন নিশ্চয়ই, মালঝদেবী খুন হয়েছেন—

—জানি। যেদিন আমি পাটনায় যাই, সেদিন পাটনাতেই সংবাদপত্রে newsটা পড়েছিলাম।

—আপনার সঙ্গে মালঝদেবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল?

—তা কিছুটা ছিল।

—যে রাত্রে মালঞ্চদেবী নিহত হন সেদিন সন্ধ্যারাত্রে আপনি ঐ মালঞ্চদেবীর হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

—গিয়েছিলাম।

—সেখান থেকে কখন চলে এসেছিলেন?

—আধুনিক পরেই, কারণ আমার ট্রেন ছিল রাত ন'টা চালিশে—

কিরীটী ঐ সময় বললে, কিন্তু মিস্টার ভৌমিক, আপনাকে ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে রতন বা মানদা কেউ দেখেনি—

—না দেখে থাকতে পারে।

আবার কিরীটীর প্রশ্নঃ সদর দিয়েই বের হয়ে এসেছিলেন বোধ হয়?

—তা ছাড়া আর কোথা দিয়ে আসব। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? আপনাদের কি ধারণা ঐ জগন্য ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ আছে?

—মনে হওয়াতা কি খুব অস্বাভাবিক মিঃ ভৌমিক? সুশীল চতুর্বর্তী বললেন।

—How fantastic—তা ইঠাই ঐ ধরনের একটা absurd কথা আপনাদের মনে হল কেন বলুন তো অফিসার?

কিরীটী বললে, যে স্ত্রীলোক একই সঙ্গে দুজন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের লীলাখেলা চালাতে পারে এবং সেখানে যাদের যাতায়াত, তাদের প্রতি ঐ ধরনের সন্দেহ জাগেই যদি—

কিরীটীকে বাধা দিয়ে দীপ্তেন ভৌমিক বললেন, থামুন। একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, সে রাত্রে আমি ন'টা চালিশের ট্রেনে কলকাতা ছেড়ে যাই। আমি কি চলস্ত ট্রেন থেকে উড়ে এসে তাকে হত্যা করে হাওয়ায় উড়তে উড়তে আবার চলস্ত ট্রেনে ফিরে গিয়েছি? সত্যি মশাই, আপনাদের পুলিসের উর্বর মষ্টিকে সবই বোধ হয় সন্তুষ্ট। ঐ সব আবোল-তাবোল কতগুলো প্রশ্ন করার জন্যেই কি আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন?

—Listen দীপ্তেনবাবু, যতক্ষণ না আপনি প্রমাণ করতে পারছেন, কিরীটী বললে, সে সত্যিই সে রাত্রে আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে আধুনিক মধ্যে বের হয়ে এসেছিলেন, পুলিসের সন্দেহটা ততক্ষণ আপনার ওপর থেকে যাবে না।

—আমি একজন ভদ্রলোক, আমি বলছি, সেটাই কি যথেষ্ট নয় মশাই?

—না মিঃ ভৌমিক, যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট হত যদি ঐ রাত্রেই আপনার বিশেষ ভাবে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ একজন ঐ ভাবে না নিহত হত।

—মালঞ্চর সঙ্গে আলাপ ছিল ঠিকই কিন্তু সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—আচ্ছা দীপ্তেনবাবু, কিরীটীর প্রশ্ন, আপনি জানতেন নিশ্চয়ই, যে মালঞ্চদেবী, অনেকদিন ধরে সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতা হিসাবে ছিল—

—জানব না কেন? জানতাম।

—সে ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে মালঞ্চর ঘনিষ্ঠতাটা সুরজিৎ ঘোষাল যে ভাল চোখে দেখতে পারেন না সেটা তো স্বাভাবিক—

—আমি অতশ্চত ভাবিনি মশাই, তাছাড়া ভাববার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

—ভাবটা বোধ হয় উচিত ছিল, যাক সে কথা। আপনি ভাল করে ভেবে বলুন, কখন কোন পথ দিয়ে সে রাতে আপনি সেই বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন এবং কিসে করে ফিরেছিলেন?

—আমি ফিরেছিলাম ট্যাঙ্কিতে—

—কেন, আপনার তো গাড়ি আছে—

—গাড়ি আমি আগের দিন গ্যারাজে দিয়েছিলাম repair-এর জন্যে, আর আগেই বলেছি, আমি সদর দিয়েই বের হয়ে এসেছিলাম।

—দীপ্তেনবাবু, আপনি কি মালঞ্চদেবীকে একটা মুক্তোর হার দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কত দাম সেটার? কিরীটী জেরা করতে থাকে।

—হাজার তিনেক—

—ঐ রকম দামী জিনিস আরো দিয়েছেন কি তাঁকে?

—দিয়েছি অনেক কিছু, কিন্তু অত দামী জিনিস আগে দিইনি।

—তা হঠাৎ অত দামী হার, অন্য একজনের রক্ষিতাকে দিতে গেলেন কেন?

—থুশি হয়েছিল দিয়েছি। আর কিছু আপনাদের জিজ্ঞাস্য আছে?

—আচ্ছা, আপনার নাম তো দীপ্তেন ভৌমিক, আর কোন নাম নেই আপনার?

—মানে?

—মানে অনেকের দুটো নাম থাকে, যেমন ডাকনাম, পোশাকী নাম, আলাদা আলাদা—

—আছে। আমার ডাকনাম সুনু, মা বাবা আমাকে সুনু বলে ডাকতেন, আর দাদাকে মনু বলে ডাকতেন।

—আপনার দাদা বেঁচে আছেন?

—হ্যাঁ, ইংলণ্ডে সেটেল্ড—

—আপনি নিশ্চয়ই কুমাল ব্যবহার করেন?

—নিশ্চয় করি। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনাদের? একটু যেন বিরক্তির সঙ্গেই কথাটা উচ্চারণ করলেন দীপ্তেন ভৌমিক।

—না, আপনি আপাতত যেতে পারেন মিঃ ভৌমিক। সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর চোখের ইশারা পেয়ে ভৌমিককে বললেন।

—ধন্যবাদ। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন দীপ্তেন, তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন একটু যেন দ্রুত পদেই।

ভদ্রলোক থানা থেকে বের হয়ে যেতে সুশীল চক্রবর্তী বললেন, আমি দীপ্তেন ভৌমিকের ওপর constant watch রাখব ভাবছি দাদা—

—ওয়াচ রাখতে হলে শুধু দীপ্তেন ভৌমিক কেন, সে তালিকা থেকে সুশাস্ত মল্লিকও বাদ যাবেন না। কিন্তু আমি কি বলছি জানো ভায়া—আজকের সমাজের মানুষ এ কি এক সর্বনাশা পথে ছুটে চলেছে। না আছে কোন সংযম—কোন যুক্তি—কেবল to achieve, এবং মজা হচ্ছে, কি তারা চায়, কি পেলে তারা সুবী-সন্তুষ্ট, সেটা ওদের নিজেদের কাছেও

স্পষ্ট নয়। এই মালঞ্চ দেবীর কথাই ভাবো না, সুরজিৎ ঘোষালকে নিয়ে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, দীপ্তেন ভৌমিককেও টেনেছিল—যাকগে, আজ উঠি। হঁা, ভাল কথা, কাল একবার তোমাদের অকুস্তলটা ঘুরে এলে মন্দ হত না।

—বেশ তো, কখন যাবেন বলুন, আমি যাপনাকে তুলে নেব'খন। বাড়িটা তো এখন পুলিস পাহারাতেই আছে।

—রতন আর মানদা?

—তারাও আছে।

—আর কেউ নেই?

—আছে বৈকি, মালঞ্চর স্বামী সুশাস্ত মল্লিকও তো এই বাড়িতেই আছে এখনো।

—কিন্তু বাড়িটা এখন কার সম্পত্তি হবে? মালঞ্চর কোন ওয়ারশিন নেই?

—জানি না। এখনো তো দাবীদার আসেনি।

—হঁ। কাল সকালে তুমি ন'টা নাগাদ আসতে পারবে?

—পারব না কেন, যাব।

—তাহলে এই কথাই রইল, আমি চলি।

কিরীটী থানা থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী চলস্ত গাড়িতে বসে বসে ভাবছিল—মালঞ্চর মৃত্যুটা কি তিনটি পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর ঈর্ষা থেকেই ঘটেছে, না আরো কিছু ছিল?

সুরজিৎ ঘোষালের মত লোক ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে তার রফিতাকে খুন করতে পারে কথাটা যেন ভাবা যায় না, অথচ তারই কুমাল মৃতের গলায় পেঁচিয়ে গিঁট বাঁধা ছিল, এবং সে মালঞ্চকে শাসিয়েছিল, হত্যার হমকিও দেখিয়েছিল। সুরজিৎ ঘোষালকে গ্রেপ্তার করার পিছনে পুলিসের এটাই জোরালো যুক্তি, সুরজিৎ ঘোষালের কথাগুলো সুশীল চক্রবর্তী মানদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই জেনেছেন।

কিন্তু মানদা আরো বেশী কিছু জানে, কারণ সে ছিল মালঞ্চর পেয়াবের দাসী। অনেক মাটিনে পেত সে। মানদা যদিও দীপ্তেন ভৌমিকের কথাটা স্বীকার করেনি তবু সে-ই তার মনিবের কর্ণগোচর করেছে বলে কিরীটীর ধারণা, সেটা মানদারই কাজ। মানদা গাছেরও খেতো তলারও কুড়াতো।

কিরীটীর আরো মনে হয় দীপ্তেন ভৌমিক সত্যি কথা বলেননি। কিরীটী জানত না যে দু'দিন পরেই সে দীপ্তেন ভৌমিক সম্পর্কে এক চমকপ্রদ সংবাদ শুনবে সুশীল চক্রবর্তীর কাছ থেকে, এবং সে সংবাদ পাওয়ার পর মালঞ্চর হত্যা ব্যাপারটা সত্যিই জটিল হয়ে উঠবে।

॥ নয় ॥

পরের দিন সোয়া ন'টা নাগাদ সুশীল চক্রবর্তী এসে হাজির হলেন কিরীটীর বাড়িতে।
কিরীটী প্রস্তুত হয়েই ছিল, সুশীল চক্রবর্তীর জীপে উঠে বসল।

হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির দরজায় দুজন সেপাই পাহারায় ছিল এবং একজন অন্দরে
ছিল। জীপ থেকে সুশীল চক্রবর্তীকে নামতে দেখে তারা সেলাম জানাল। কিরীটীকে নিয়ে
সুশীল চক্রবর্তী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রথমেই ওরা সুশাস্ত মল্লিক যে ঘরটায় থাকে সেই নীচের ঘরটায় উঁকি দিলেন।
সুশাস্ত মল্লিককে ঘরের মধ্যে দেখা গেল না। ইতিমধ্যে জীপের শব্দে রতন ওপর থেকে
সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছিল। সুশীল চক্রবর্তী রতনকেই প্রশ্ন করলেন, সুশাস্তবাবুকে
দেখছি না, কোথায় তিনি?

—আজ্ঞে সকালে যখন চা দিই তখন তো ছিলেন। তবে গতকাল তিনি বলেছিলেন
এ বাড়িতে তিনি আর থাকবেন না, চলে যাবেন।

—কেন, তাঁর কেন অসুবিধা হচ্ছে নাকি?

—না বাবু অসুবিধা হবে কেন। মানদার হাতেই তো সংসার খরচের টাকা থাকত,
এখন যা আছে এ মাসটা চলে যাবে। তবে ওনার তো আবার বোতলের ব্যাপার আছে
সঙ্গেবেলা—মানদা তো সে সব কিছু দিচ্ছে না। বোধ হয় সেইজন্যেই—

সুশীল চক্রবর্তী হাসলেন। ঠিক সেই সময় দেখা গেল সুশাস্ত মল্লিক দোতলা থেকে
সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সুশীল চক্রবর্তীকে দেখে সুশাস্ত বললে, এই যে দারোগাবাবু,
আপনি আমার ওপরে কেন জুলুম করছেন বলুন তো?

—জুলুম?

—নয়! বাড়ি থেকে বেরহতে পারব না, এটা জুলুম ছাড়া আর কি বলুন তো?

কিরীটী চেয়ে চেয়ে দেখছিল লোকটাকে। মুখে বেশ দাঢ়ি গজিয়েছে খোঁচা খোঁচা।
বোধ হয় কয়েকদিন কোন ক্ষেত্রকর্ম না করায়। পরনের জামা ও পায়জামাটা ময়লা।
একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মনে হয় অনেকদিন চিরনির স্পর্শও পড়েনি।

কিরীটী চুপিচুপি সুশীল চক্রবর্তীকে বললে, এই বোধ হল মালঞ্চর স্বামী?

—হঁ দাদা।

—লোকটাকে ছেড়ে দাও। তবে নজর রেখো—

—কিন্তু দাদা, যদি ভাগে, আমি তো ভেবেছিলাম এবাবে ওকে আয়ারেন্ট করব।
নিম্নকষ্টে কথাগুলো বললেন সুশীল।

—সুশাস্তবাবু—

কিরীটীর ডাকে সুশাস্ত মল্লিক তাকাল জ্বুটি করে।

—আপনাকে আমরা ছেড়ে দেবার কথা ভাবতে পারি, যদি ঠিক ঠিক আপনার কাছ
থেকে যেগুলো জানবার জন্যে এসেছি সেগুলোর জবাব দেন।

—মানে আপনি সেদিন সে সব কথা বলেছেন, সব আমরা একেবাবে পুরোপুরি সত্য

ବଲେ ମେନେ ନିତେ ପାରଛି ନା । କିରୀଟୀଇ ଜବାବ ଦିଲ ।

—ଆମି କିଛୁ ଜାନି ନା—ବଲତେ ବଲତେ କିଛୁକଣ କିରୀଟିର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥେକେ ମୋଜା ନିଜେର ସରେ ଗିଯେ ଚୁକଳ ସୁଶାସ୍ତ ମଞ୍ଜିକ ।

ସୁଶିଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ସରେର ଦିକେହି ଏଗୁଛିଲେନ କିନ୍ତୁ ବାଧା ଦିଲ କିରୀଟି । ବଲଲେ, ଆଗେ ଚଲ ସୁଶିଳ, ବାଡ଼ିଟା ଏକବାର ଘୂରେ ଦେଖି, ଆର ସେଇ ସରଟା—

ସୁଶିଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଁଡ଼ିର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ, କିରୀଟି ସୁଶିଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ପିଛନେ ଏଗୋଲେନ । ହଠାତ୍ କିରୀଟିର ନଜର ପଡ଼ିଲ ନୀଚେର ଏକଟା ତାଲାବନ୍ଧ ସରେର ବନ୍ଧ ଜାନଲାର ଦିକେ—କବାଟ ଦୁଟୋ ଈଷ୍ଟ ଫାଁକ, ଆର ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ଫାଁକେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଉଁକି ମାରଛେ ଚୋଥ । ସେଇ ଚୋଥେ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଯେଣ ତୌଳ୍କ ସଙ୍କାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି । କିରୀଟି ଥମକେ ଦାଁଡାଳ ।

କିରୀଟିକେ ଥାମତେ ଦେଖେ ସୁଶିଳ ବଲଲେନ, କି ହଲ ଦାଦା, ଓପରେ ଚଲୁନ—

—ସୁଶିଳ, ଚଲ ତୋ ନୀଚେର ଏଇ ସରଟା ଆଗେ ଦେଖି । ବଲେ ବନ୍ଧ ଦରଜାର ସରଟା କିରୀଟି ଦେଖିଯେ ଦିଲ ।

—ଏ ତାଲାବନ୍ଧ ସରଟା?

—ହଁ । ଚାବି ନେଇ ତୋମାର କାହେ?

—ନା ତୋ ।

—ତାହଲେ ଏ ସରେର ତାଲାର ଚାବି କୋଥାଯ ପାଓଯା ଯାବେ?

ଓଦେର କାହେଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ରତନ ଦାଁଡିଯେ ଛିଲ । ତାର ଦିକେ ତାକିଯେ ସୁଶିଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଧାଲେନ, ଏ ସରେର ତାଲାର ଚାବି କୋଥାଯ?

—ତା ତୋ ଜାନି ନା ହୁଜୁର—

—ଏ ସରେ ତାଲା ଦେଓଯା କେନ?

—ତା ଜାନି ନା ହୁଜୁର, ଏ ସରଟା ତାଲା ଦେଓଯାଇ ଥାକେ, ବରାବର—

—ମାନଦାକେ ଡାକୋ ତୋ, ମେ ହୟତୋ ଜାନେ ଏ ସରେର ତାଲାର ଚାବି କୋଥାଯ ।

ଠିକ ଏ ସମୟ ମାନଦାକେ ଦୋତଲାର ସିଁଡ଼ିର ମାଥାଯ ଦେଖା ଗେଲ । ରତନ ମାନଦାକେ ଦେଖତେ ପେଯେ ବଲଲେ, ବାବୁ, ଏ ଯେ ମାନଦା—

ବଲତେ ବଲତେ ମାନଦା ସିଁଡ଼ି ଦିଯେ ନେମେ ଆସେ ।

—ମାନଦା, ଏ ସରେର ତାଲାର ଚାବିଟା କୋଥାଯ?

—ଆମି ତୋ ଜାନି ନା ବାବୁ । ମାନଦା ବଲଲ ।

—ଏ ସରେର ତାଲାର ଚାବିଟା କୋଥାଯ ତୁମି ଜାନୋ ନା? କିରୀଟିର ଆବାର ପ୍ରଶ୍ନ?

—ନା, ଆମି ଏଖାନେ ଆସା ଅବଧି ଦେଖିଛି, ଏ ଦରଜାଯ ଏ ଭାବେଇ ତାଲା ଖୋଲେ ।

—କଥନୋ କାଉକେ ଦରଜା ଖୁଲତେ ଦେଖନି?

—ନା ବାବୁ—

କିରୀଟି ଏବାର ସୁଶିଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ଦିକେ ତାକାଳ—ସୁଶିଳ, ତୋମାର କାହେ ତୋ ସେଇ ଚାବିର ରିଂଟା ଆହେ, ମଙ୍ଗେ ଏନେହ?

—ହଁ, ଏଇ ନିନ । ସୁଶିଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକଣ୍ଠେ ଚାବି ସମେତ ଏକଟା ଝପୋର ଚାବିର ରିଂ ପକେଟ ଥେକେ ବେର କରେ କିରୀଟିର ହାତେ ତୁଲେ ଦିଲ । କିନ୍ତୁ ରିଂଯେର କୋନ ଚାବିର ସାହାଯ୍ୟେଇ ସରେର ତାଲାଟା ଖୋଲା ଗେଲ ନା । ଏମନ କି ଚାବିର ଥୋକାର କୋନ ଚାବିଇ ତାଲାତେ ପ୍ରବେଶ

করানোও গেল না। অথচ তালাটা দেখে কিরীটীর মনে হয় তালাটা সর্বদাই খোলা হয়। তালাটার চেহারা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার মত নয়।

—কোন চাবিতেই তো তালাটা খুলছে না দাদা।

—কোন চাবি না লাগলে আর কি করা যাবে, তালাটা ভাঙতে হবে—কিরীটী শাস্তি গলায় কথাগুলো বলে পর্যায়ক্রমে একবার অদূরে দণ্ডয়ামান রতন আর মানদার মুখের দিকে তাকাল।

গডরেজের মজবুত বড় তালা, তালাটা ভাঙা অত সহজ হল না। একটা লোহার রড দিয়ে প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট ধস্তাধস্তি করার পর তালাটা ভাঙা গেল, তাও দুজন সিপাহীয়ের সাহায্যে। এবং অত যে শব্দ করে তালাটা ভাঙা হল তবু ঠিক তার পাশের ঘরে থেকেও সুশাস্ত মল্লিকের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না বা সে এমে ব্যাপারটা জানবারও কোন চেষ্টা করল না।

ঘরটা অঙ্ককার ছিল, জানালা দরজা বন্ধ থাকায় কিরীটী সুশীল চক্রবর্তীকে বলল, দেখ তো সুশীল, ঘরের আলোর সুইচটা কোথায়—

হাতড়াতে হাতড়াতে সুইচটা পাওয়া গেল। খুট করে সুইচ টিপতেই একটা ডুম ঢাকা একশো পাওয়ারের বাতি জুলে উঠল!

ঐ ঘরটা ঠিক মালঞ্চর দোতলার শোবার ঘরের নীচেই। পরে সেটা বুরেছিল কিরীটী। মাঝারি সাইজের ঘরটি, ঘরের মধ্যে মাত্র একটি দেওয়াল-আলমারি, তার পাল্লায় চাবি লাগানো। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে আর অন্য কোন আসবাবপত্র নেই।

দেখলে মনে হয় ঘরটা কেউ কখনও ব্যবহার করে না। গোটাচারেক জানালা, সব জানালারই পাল্লা বন্ধ। দুটি দরজা, যে দরজার তালা ভেঙে একটু আগে তারা প্রবেশ করেছে তার ঠিক উল্টো দিকে আর একটা দরজা।

দরজাটা খোলাই ছিল, এবং পাল্লা ধরে টানতেই খুলে গেল। দরজাটার পিছনে একটা সরু ফালিমত যাতায়াতের পথ এবং সেই পথের ওপরেই মেঝেরদের দোতলায় যাবার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

কিরীটীর বুঝতে কষ্ট হল না ব্যাপারটা। সে ভুল দেখেনি, কিছুক্ষণ আগে ঐ ঘরের দৈর্ঘ্য ফাঁক করা জানালার কপাটের আড়াল থেকে যে চক্ষুর দৃষ্টি সে দেখেছিল, সে যে-ই হোক, এই ঘরের মধ্যেই সে ছিল এবং পিছনের ঐ দরজাপথেই সে অস্তর্হিত হয়েছে।

—সুশীল—

—কিছু বলছেন দাদা?

—এখন বুঝতে পারছ তো, সে রাত্রে ঐ গলিপথ দিয়েই দীপ্তেন ভৌমিক সকলের অজ্ঞাতে বের হয়ে গিয়েছিল!

—ঐ সিঁড়িটা দিয়ে?

—খুব সভ্যত, কিরীটী বললে, হ্যাঁ সে রাত্রে ঐ সিঁড়ি দিয়েই দীপ্তেন মালঞ্চর ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল। আর আজ কিছুক্ষণ আগে এই ঘরের মধ্যে যে ছিল সে-ও ঐ দরজা আর ঐ সিঁড়ি ব্যবহার করেছে—

—এই ঘরের মধ্যে কেউ ছিল নাকি?

—হ্যাঁ। আর এ বাড়িতে এখন যারা আছে সে তাদেরই মধ্যে একজন কেউ।

—কে বলুন তো দাদা?

—জানি না, তবে এ সময় এই ঘরের মধ্যে সে কেন এসেছিল তাই ভাবছি—

—হয়তো আমাদের প্রতি নজর রাখবার জন্য।

—না। আমার ধারণা তার এ ঘরে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল এবং আমাদের সাড়া পেয়ে এবং জানলার কপাট দুষ্পৎ ফাঁক করে আমাদের দেখতে পেয়েই সরে পড়েছে। তবে বাড়ির বাইরে সে নিশ্চয়ই যায়নি। চল তো, ঘরের আলমারিটা একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।

ঐ চাবির রিংয়ের মধ্যেই একটা চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে ফেলা গেল। একটা তাকে থরে থরে সাজানো কতকগুলো কার্ড-বোর্ডের বাক্স। অনেকটা সিগারেটের বাক্স মত।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে একটা বাক্স নিয়ে বাক্সের ঢাকনাটা খুলতেই দেখা গেল তার দেখা সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো সব লম্বা লম্বা সিগারেট।

সুশীল চক্রবর্তী বললেন, এ সব তো সিগারেট দেখছি—

কিরীটী কোন কথা না বলে একে একে সব বাক্সগুলোই খুলে ফেলল। গোটা দশেক বাক্সের মধ্যে ছটা খালি, বাকি চারটের মধ্যে সিগারেট রয়েছে, তার মধ্যে একটায় অর্ধেক।

—কি ব্যাপার বলুন তো দাদা, এখানে এই আলমারিতে এত সিগারেট কেন?

—আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তো—কিরীটী মৃদু কঠে বলল, এগুলো সাধারণ সিগারেট নয় সুশীল, এগুলো মনে হচ্ছে নিষিদ্ধ নেশার সিগারেট—‘হ্যাসিস’—চরস ইত্যাদি দিয়ে যে-সব নেশার জন্য তৈরী সিগারেট গোপন পথে চলাচল করে এগুলো তাই—সেই জাতীয় সিগারেট—নিষিদ্ধ বস্তু—

সুশীল চক্রবর্তী নিঃশব্দে সিগারেটগুলোর দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে।

কিরীটী বললে, মনে হচ্ছে এ বাড়িতে থেকে এই নিষিদ্ধ বস্তুর লেনদেন হত। আমি ভাবছি সুশীল, শেষ পর্যন্ত এর মধ্যেই মালঝর হত্যার বীজ লুকিয়ে ছিল না তো!

—এই সিগারেটের মধ্যে?

—হ্যাঁ। এই সিগারেটকে কেন্দ্র করেই হয়তো মৃত্যুগরল ফেনিয়ে উঠেছিল। এগুলো নিয়ে চল। আর এই সিগারেটগুলোর মধ্যে থেকে আজই একটা অ্যানালিসিসের জন্যে পাঠিয়ে দাও।

তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, হয়তো এগুলো সরাবার জন্মেই এখানে সে এসেছিল আজও। কয়দিন ধরেই হয়তো চেষ্টা করছিল এগুলো সরাবার, কিন্তু চাবির রিং তোমার পক্ষে থাকায় সুবিধা করতে পারেনি। চল, এবার ওপরে যাওয়া যাক।

সুশীল চক্রবর্তী ভাঙা দরজাটার দিকে এগুঁচিলেন। কিরীটী বাঁধা দিয়ে বললে, না, ও দরজা দিয়ে না, চল পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লোহার সিঁড়ি দিয়ে আমরা ওপরে যাব—

সেই মতই ওরা ওপরে উঠে এলো, লোহার ঘোরানো সিঁড়ি পথ।

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়। দেখা গেল নীচের সেই ঘরটার ওপরের ঘরটাই মালঞ্চর
শয়নকক্ষ। বাথরুম দিয়েই ওরা ঘরে ঢুকল, দরজা খোলাই ছিল বাথরুমের।

—দাদা, আপনি সত্যিই নীচের ঘরে কাউকে দেখেছেন?

—একটি চক্ষু—শ্যেন দৃষ্টি ছিল সেই চোখের তারায়—কিরীটী বললে, চোখাচোখি
যখন একবার হয়েছে তখন পালাতে সে পারবে না। চল, ঘরের ভিতরটা আর একবার
আজ দুজনে মিলে খুঁটিয়ে দেখা যাক।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কিরীটীর নজর পড়ল ঘরের মধ্যে অ্যাশট্রেটার
ওপরে—সোফাস্টের মাঝাখানে একটি ছোট ত্রিপয়ের বেলজিয়ামের কাটগ্লাসের সুদৃশ্য
একটি অ্যাশট্রে, তার মধ্যে চার-পাঁচটা দন্ধাবশেষ সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। একটা
টুকরো হাতে তুলে নিয়ে কিরীটী দেখল—বিলাতী সিগারেট—স্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫।

—সুশীল, তোমার নিহত নায়িকার ধূমপানের অভ্যাস ছিল নাকি?

—জানি না তো—

—জিজ্ঞাসা করনি?

—না।

—জিজ্ঞাসা করাটা উচিত ছিল ভায়া। তার যদি ধূমপানের অভ্যাস না থাকে তবে
এগুলো কার সিগারেটের দন্ধাবশেষ? হয় সুরজিৎ ঘোষালের, না হয় দীপ্তেন ভৌমিকের
নিশ্চয়।

—সুশাস্ত্র মল্লিকেরও তো হতে পারে দাদা—

—মনে হয় না। কারণ যে পরমুখাপেক্ষী, তার ডাগো স্মাগ্ল করা বিলাতী সিগারেট
জুটত বলে মনে হয় না। স্পেশাল ব্রাডের সিগারেট যখন, তখন এই বঁ্ডশীর সাহায্যেই
মাছকে খেলিয়ে ডাঙায় টেনে তোলা কষ্টকর হবে না—কথাগুলো বলে কতকটা যেন
আপন মনেই কিরীটী ঘরের চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। সুশীল চক্রবর্তীর
মুখে শোনা ঘরের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সব কিছু।

—সুশীল, তুমি এই ঘরের বাইরে থেকে লক করে গেলেও এ ঘরে প্রবেশাধিকার
তুমি বন্ধ করতে পারনি, বুঝতে পারছ বোধ হয়! কই—দেখি তোমার চাবির গোছা—

সুশীল চক্রবর্তী পকেট থেকে চাবির রিংটা কিরীটীর হাতে তুলে দিলেন।

—ঐ আলমারির চাবি কোন্টা সুশীল?

সুশীল চাবিটা দেখিয়ে দিলেন এবং চাবির সাহায্যে কিরীটী আলমারিটা খুলে ফেলল।
দুটি ড্র্যার, দুটি ড্র্যারই একে একে খুলে তার ভেতরের সব কিছু পরীক্ষা করে দেখতে
লাগল কিরীটী।

কিন্তু ড্র্যারের মধ্যে সুশীল চক্রবর্তী সেদিন অনুসন্ধান চালিয়ে যা পেয়েছিলেন তার
চাইতে বেশী কিছু পাওয়া গেল না। কিরীটী তবু অনুসন্ধান চালিয়ে যায়...

—কি খুঁজছেন দাদা? সুশীল প্রশ্ন করল।

—ব্যাকের পাসবই। মালঞ্চর নিশ্চয়ই একাধিক ব্যাকে অ্যাকাউন্ট ছিল।

—একটা তো পেলেন।

—যেখানে নিযিন্দ চোরাই দ্রব্যের কারবার, সেখানে ব্যাক-ব্যালেন্স মাত্র হাজার দুই-তিন থাকাটা ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। চোরাই কারবারের লেনদেনের নিট ফল অত সামান্য তো হতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কিরীটীর অনুমানই ঠিক। মালঞ্চর নামে চার-পাঁচটা ব্যাকের পাসবই পাওয়া গেল। কিছু ফিল্ড ডিপোজিটের কাগজপত্র পাওয়া গেল সেই সঙ্গে।

সুশীল চক্রবর্তী বললেন, এ যে দেখছি অনেক টাকা দাদা—

কিরীটী বলল, হ্যাঁ যোগফল তাই দাঁড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে বেশ জটিলই হয়ে উঠল সুশীল—চোরাকারবার, হত্যা, সুন্দরী এক নারী, তিনটি পুরুষ মান্দিকা সেই নারীকে ঘিরে, ভুলে যেও না।

ব্যাকের পাসবইগুলো সঙ্গে নিয়ে ওরা দুজনে দোতলা থেকে আগে সিঁড়ি পথেই নীচের তলায় নেমে এসে সুশাস্ত মল্লিকের ঘরে ঢুকল।

সুশাস্ত মল্লিক তার ঘরের মধ্যে বনে ধূমপান করছিল; সামনেই চৌকির ওপরে একটা সোনার সিগারেট কেস ও একটা ম্যাচ। ওরা ঘরে ঢুকতেই সুশাস্ত মল্লিক ওদের দিকে তাকাল। তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সুশাস্ত মল্লিক একটু যেন বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু কোন কথা বলল না।

—কি সুশাস্তবাবু, কি ঠিক করলেন? কিরীটী বলল।

—কিসের কি ঠিক করব?

—পুলিসকে সাহায্য করলে হয়তো আপনি এই ফ্যাসাদ থেকে মুক্তি পেলেও পেয়ে যেতে পারেন।

—আমি যা জানি সবই তো বলেছি—

—কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমাদের আরো যে কিছু জানবার আছে সুশাস্তবাবু—কিরীটী বলল।

—আমি আর কিছুই জানি না।

—বেশ, তাই না হয় মেনে নিলাম। এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন।

—কি প্রশ্ন?

—মালঞ্চ নিজেই নিজের গাড়ি ড্রাইভ করতেন, গাড়ি নিয়ে তিনি মাঝেমধ্যে নিশ্চয়ই বেরতেন, তিনি কোথায় যেতেন জানেন?

—সিনেমা, থিয়েটার, বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যেতো হয়তো।

—আর কোথাও যেতেন না—যেমন ধরুন কেন ক্লাব বা রেস্তোরাঁ—

—একটা নাইট ক্লাবে মাঝে-মধ্যে সে যেতো জানি। ক্লাবটা বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে—

—ইঁ। বুঝেছি। ক্লাবটার নাম দি রিট্রিট, তাই না? A notorious night club! আচ্ছা, মালঞ্চদেবী ড্রিংক করতেন না মিঃ মল্লিক?

—করত বোধ হয়—

—আপনি দেখেননি কখনো?

—সামান্য বেসামাল অবস্থায় মাঝে-মধ্যে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেখেছি তাকে, কিরীটী অমনিবাস (১৩)—১০

কিন্তু মদ্যপান করতে দেখিনি।

—দীপ্তেনবাবু আর সুরজিৎ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের এ বাড়িতে যাতায়াত ছিল কি?

—সমীর রায় নামে একজন বিলেত ফেরত ডাঙ্কার আর এক তরুণ মারোয়াড়ীকে কালেভদ্রে এখানে আসতে দেখেছি।

—আর কেউ?

—একজন অভিনেত্রী দু-একবার এসেছে—

—কি নাম তার?

—ডলি দত্ত, বৌধ হয় তার নাম।

—আচ্ছা মালঝ দেবী ধূমপান করতেন?

—কখনো দেখিনি—

—হ্যাঁ! আপনি এ বাড়ি থেকে বেরহতে চান মাঝে-মধ্যে—তাই না সুশাস্তবাবু? কিরীটী বলল।

—মাঝে-মধ্যে না, আমি একেবারেই চলে যেতে চাই। আপনারা না আটকালে চলে যেতামও, সুশাস্ত মল্লিক বলল।

—কিন্তু যাবেন কোথায়?

—যা হোক একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে থাকবার—

—কেন এই বাড়িটা তো আপনার স্ত্রীরই নামে।

দপ্ত করে যেন সুশাস্ত মল্লিক জলে উঠল, কি বললেন? স্ত্রী! কে আমার স্ত্রী—ঐ বাজারের বেশ্যাটা! হ্যাঁ, বলতে পারেন অবিশ্য সেই স্ত্রীলোকটারই কাছে মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে আজও বেঁচে আছি আমি, কিন্তু আর না। তারপর একটু থেমে ভাঙা গলায় সুশাস্ত মল্লিক বলল, চলে যেতাম অনেক আগেই, কিন্তু কেন পারিনি জানেন? যখনই ভেবেছি ওই বোকা মেয়েটার দেহটাকে দশজনে খুবলে খুবলে থাচ্ছে তখনই মনে হয়েছে এই ছেঁড়াছিঁড়ি একদিন ওকে শেষ করে দেবে। আর দেখলেন তো, হলও তাই। কিন্তু কি হল, একেবারেই পারলাম না তো ওকে রক্ষা করতে—

শেষের দিকে কিরীটীর মনে হল যেন কান্না বরে পড়ছিল সুশাস্ত মল্লিকের কঠ থেকে।

কিরীটী বলল, সুশাস্তবাবু, সেদিন সকালবেলা যখন মালঝের ঘরের দরজা খুলছিল না, আপনি কেন তখন রতনকে বলেছিলেন মালঝ দেবী শেষ হয়ে গিয়েছেন?

—বলেছিলাম নাকি! আমার ঠিক মনে নেই—

—হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন। আচ্ছা, আর একটা কথা সুশাস্তবাবু, কিরীটী বলল, ঐ দুঃটিনার আগে হঠাৎ কেন আপনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন?

—বুঝতে পেরেছিলাম এ বাড়িতে আর আমার থাকা হবে না, কারণ মালঝ তা চায় না—

—মালঝ কিছু বলেছিলেন?

—হ্যাঁ—

—কি বলেছিলেন?

সুশাস্ত মল্লিক সেই সন্ধ্যার ঘটনাটা বলে গেল। তারপর বলল, আপনিই বলুন মশাই,

ତାରପରଓ କି ଥାକା ଯାଯ ?

—ତବେ ଆବାର ଏଥାନେ ଫିରେ ଏଲେନ କେନ ?

—ଫିରେ ଆସତାମ ନା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ କେନ ଯେଣ ଆମାର ମନ ବଲଛିଲ, ତାର ବଡ଼ ବିପଦ, ଆର ଆମାର ମନ ଯେ ମିଥ୍ୟ ବଲେନି, ସେ ତୋ ପ୍ରମାଣିତାଇ ହେଁବେଳେ।

—ତା ବଟେ ! ଦୁଟୋ ରାତ କୋଥାଯ ଛିଲେନ ଆପନି ?

—ପଥେ ପଥେ, ଆର କୋଥାଯ ଥାକବ ? ଆମାର ଆବାର ଜାୟଗା କୋଥାଯ ?

—ଆଜ୍ଞା ସୁଶାସ୍ତବାବୁ, ଆପନାର ସ୍ତ୍ରୀ ହତୀର ବ୍ୟାପାରେ କାଉକେ ଆପନି ସନ୍ଦେହ କରେନ ? କିରୀଟୀଇ ପୁନରାୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରଲ ।

—ନା, ତବେ ଐ ଧରନେର ମେଯେଛେଲେଦେର ଶେଷ ପରିଗାମ ଐ ରକମଇ ଯେ ହବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଘାତ ମୃତ୍ୟୁ, ତା ଆମାର ଜାନା ଛିଲ ।

—ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସୁଶାସ୍ତବାବୁ, ଆପନି ବେରୁତେ ପାରେନ—ଅବଶ୍ୟାଇ ଯଦି ଆପନି କଥା ଦେନ ଯେ ପୁଲିସେର ଅନୁମତି ଛାଡ଼ା ଏ ବାଡ଼ି ଛେଡ଼େ କୋଥାଓ ଯାବେନ ନା ।

—ତାଇ ହବେ । ଆର ଯାବଇ ବା କୋଥାଯ—ସତଦିନ ନା ଏକଟା ଆସ୍ତାନା ମେଲେ ମାଥା ଗୁଞ୍ଜବାର ମତ ।

ହଠାତ୍ ସୁଶାସ୍ତ ବଲେ ଓଠେ, ଐ ମାନଦା, ଓକେ ଏକଦମ ବିଶ୍ଵାସ କରବେନ ନା ମଶାଇ, she is a dangerous type.

କିରୀଟୀ ମୃଦୁ ହାସେ । ସୁଶାସ୍ତ ବଲେ, ଆପନି ହାସଛେନ ସ୍ୟାର, ଐ ଧରନେର ଉତ୍ୟୋମ୍ୟାନରା can do anything for money.

—ତାର ମାନେ ଆପନି କି ବଲତେ ଚାନ ଓକେ ଟାକା ଦିଯେ—

—କିଛୁଇ ଆମି ବଲତେ ଚାଇ ନା ସ୍ୟାର, ଶୁଦ୍ଧ ବଲଛିଲାମ ଓର ଓପର ନଜର ରାଖବେନ ।

ଦୁଜନେ ଘର ଥିକେ ବେର ହେଁବେ ଏଲୋ । ପିଂଡି ଦିଯେ ଦୋତଲାଯ ଉଠିଲେ ଉଠିଲେ ସୁଶିଲ ବଲଲେନ, ଲୋକଟା ମନେ ହଚେ ଏକଟା ବାନ୍ଧୁଧୁମୁ—

—ସୁଶାସ୍ତ ମଲିକେର ଓପର ନଜର ରେଖେ ତୋ ?

—ହଁଁ, ବିନୋଦକେ ବଲେଛି—

॥ ଦଶ ॥

ମାନଦା ଆର ରତନ ଦୋତଲାର ବାରାନ୍ଦାଯ ଦାଙ୍ଗିଯେ ଫିସ ଫିସ କରେ କି ସବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଲଛିଲ ନିଜେଦେର ମୃଧ୍ୟେ । ଓଦେର ଦେଖେ ଚୁପ କରେ ଗେଲ ।

କିରୀଟୀର ଇଞ୍ଜିଟେ ସୁଶିଲ ମାନଦାକେ ବଲଲେନ, ମାନଦା, ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ତୋମାକେ କଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରତେ ଚାନ, ଠିକ ଠିକ ଜବାବ୍ ଦେବେ—

—କେନ ଦେବୋ ନା ବାବୁ, ସତି କଥା ବଲତେ ମାନଦା ଡରାଯ ନା, ତେମନ ବାପେ ଜନ୍ମ ଦେଇନି ମାନଦାକେ ।

—ରତନ, ତୁମି ନୀଚେ ଯାଓ, ଡାକଲେ ଏସୋ । ସୁଶିଲ ବଲଲେନ ।

—ଯେ ଆଜ୍ଞେ । ରତନ ନୀଚେ ଚଲେ ଗେଲ ।

—ମାନଦା, ତୋମାର ମା ତୋ ନିଜେଇ ଡ୍ରାଇଭ କରତେନ ? କିରୀଟୀର ପ୍ରଶ୍ନ ।

—হ্যাঁ, মা খুব ভাল গাড়ি চালাতে পারত বাবু।

—প্রায়ই তোমার মা গাড়ি নিয়ে বেরুত, তাই না?

—প্রায় আর বেরুবে কি করে, বাবু আসতেন তো সক্ষ্যার সময়, রাত এগারোটা পর্যন্ত থাকতেন, তবে যদি কখনো তাড়াতাড়ি চলে যেতেন, মা গাড়ি নিয়ে বেরুত। তাছাড়া বাবু বাইরে-টাইরে গেলে বেরুত।

—তোমার মা কোথায় যেতো জানো?

—কি একটা ক্লাবে যেতো শুনেছি। নাম জানি না।

—কখন ফিরত?

—তা রাত সাড়ে বারোটা, দেড়টার আগে ফিরত না।

—তোমার মা মদ খেতো?

—খেতো বৈকি, তবে খেতে দেখিনি।

—যদি দেখিনি তবে জানলে কি করে তোমার মা মদ খেতো? কিরীটী শুধালো।

—আজ্জে বাবু, তা কি আর জানা যায় না। মাঝে মাঝে ক্লাব থেকে ফিরে এলে আমি যখন দরজা খুলে দিতাম, মার মুখ থেকে ভরভর করে গন্ধ বেরুত। তাছাড়া টলতেও দেখেছি মাকে—

—তোমার মা সিগারেট খেতো?

—হ্যাঁ, তবে বেশী নয়। মাঝে-মধ্যে কখনো-সখনো একটা-আধটা খেতে দেখেছি।

—ডাক্তার সমীর রায়কে তুমি চেনো মানদা?

—এখানে তো প্রায়ই এক ডাক্তারবাবু আসতেন, নাম জানি না, তবে মা তাকে ডাঃ রায় বলে ডাকতেন।

—তোমার বাবু জানতেন যে ঐ ডাক্তারবাবু এখানে আসতেন?

—জানবেন কি করে—বাবু যখন থাকতেন না তখনই তো ডাক্তারবাবু আসতেন।

—আর একজন মারোয়াড়ি—অঙ্গবয়স্ক ভদ্রলোক?

—হ্যাঁ, আগরওয়ালা বলে একজন আসতেন মাঝে-মধ্যে।

—ডলি দস্তকে জানো? ওই ফিল্ম-অ্যাকট্রেস, ছবি করে?

—হ্যাঁ, সেও তো আসত এখানে। ঐ ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই আসত।

—আচ্ছা, যে রাতে তোমার মা খুন হয়, সে রাতে তো তোমার বাবু আর দীপ্ণেনবাবু দুজনেই এ বাড়িতে এসেছিলেন, তাই না? কিরীটীর প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, আগে দীপ্ণেনবাবু, আর তাই নিয়েই তো বাবুর সঙ্গে রাগারাগি, বাবু বলেছিলেন মাকে খুন করবেন!

—তোমার বাবু যখন ওকে শাসাচ্ছিল তুমি তখন কোথায় ছিলে?

—দরজার বাইরে?

—আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। বাবু যে বলেছিল মায়ের ওপরে সর্বদা নজর রাখতে।

—তাহলে এ বাড়িতে যা হত তুমিই সে-সব কথা তোমার বাবুকে বলতে?

—তা বলব না—বাবু তো ঐ জনেই আমাকে রেখেছিলেন।

—ତୋମାର ବାବୁ ତାହଲେ ତୋମାର ମାକେ ସନ୍ଦେହ କରତେନ ?

—ତା ସନ୍ଦେହର ମତ କାଜ କରିଲେ ସନ୍ଦେହ କରବେ ନା ଲୋକେ !

—ତା ସଟେ । କିରିଟି ହାସଲ ।

—ମାନଦା—କିରିଟି ଆବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲ, ତୁମି କୋନ୍ ଘରେ ଥାକୋ ?

—ଆଜେ ନୀଚେର ଏକଟା ଘରେ—

—ଯେ ରାତ୍ରେ ତୋମାର ମା ଖୁନ ହୟ, ସେ ରାତ୍ରେ ରାତ ଦଶଟା ଥେକେ ବାରୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମି କି କରଛିଲେ ? ମନେ ଆଛେ ନିଶ୍ଚଯାଇ ତୋମାର ?

—ବାବୁ ରାଗାରାଗି କରେ ଚଳେ ଯାବାର ପର ରାତ ସାଡ଼େ ଦଶଟା ପୌନେ ଏଗାରୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଚେଇ ଛିଲାମ । ଭେବେଛିଲାମ ମା ହୟତୋ ଗାଡ଼ି ନିଯେ ବେଳବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଯଥନ ବେର ହଲ ନା, ବୁଝାଲାମ ଆର ବେଳବେ ନା, ତଥନ ଓପରେ ତାକେ ଥାବାର କଥା ବଲତେ ଯାଇ—

—ଗିଯେ କି ଦେଖିଲେ ?

—ମାର ଘରେର ଦରଜା ବନ୍ଧ ।

—ତାରପର ?

—ଡାକାଡାକି କରିଲାମ, ମା ତଥନ ବଲିଲେନ, ତିନି ଥାବେନ ନା, ଆର ଆମାଦେର ଥେଯେ ନିତେ ବଲିଲେନ ।

—ତୋମାର ମାର ଗଲାର ସ୍ଵର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣେଛିଲେ ?

—ମାର ଗଲାର ସ୍ଵର ସାମାନ୍ୟ ଏକଟୁ ଜଡ଼ାନୋ ଛିଲ, ତବୁ ଠିକ ମାର ଗଲାଇ ଶୁଣେଛି । ତାରପର ନୀଚେ ଗିଯେ ଆମି ଆର ରତନ ଥେଯେ ନିଯେ ଶୁଯେ ପଡ଼ି ।

ଓପରେର ତଳାଯ କୋନ ଶକ୍ତିବ୍ୟ କିଛୁ ଶୋନନି ମେ ରାତ୍ରେ ?

—ନା ।

—ଠିକ ଆଛେ, ତୁମି ରତନକେ ଏବାରେ ପାଠିଯେ ଦାଓ ।

ଏକଟୁ ପରେ ରତନ ଏଲୋ ।

କିରିଟିଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ରତନ, ସେ ରାତ୍ରେ ତୁମି କଥନ ଶୁଯେଛିଲେ ?

—ବୋଧ ହୟ ତଥନ ରାତ ସାଡ଼େ ଏଗାରୋଟା ବାଜତେ ଶୁଣେଛିଲାମ ।

—ସେଟା ଯେ ସାଡ଼େ ଏଗାରୋଟାଇ ତା କି କରେ ବୁଝାଲେ, ସାଡ଼େ ବାରୋଟା ବା ଦେଡ଼ଟାଓ ତୋ ହତେ ପାରେ !

—ମାନଦାଓ ବଲେଛିଲ, ବଲେଛିଲ ରାତ ସାଡ଼େ ଏଗାରୋଟା ବାଜଲ ରତନ ।

—ଆଜ୍ଞା ରତନ, ପରେର ଦିନ ତୁମି କଥନ ସଦର ଖୋଲ ?

—ଯଥନ ଥାନାଯ ଖବର ଦିତେ ଯାଇ ।

—ତା ତୋମାର ବାବୁକେ ଆଗେ ଫୋନେ ଖବର ନା ଦିଯେ ତୁମି ଥାନାଯ ଗେଲେ କେନ ?

—ଆଜେ ମାନଦାଇ ଯେ ବଲିଲେ—

—ହଁ ! ଆଜ୍ଞା ରତନ, ନୀଚେର ଯେ ଘରଟାଯ ସର୍ବଦା ତାଲା ଦେଓଯା ଥାକତ ସେଟା ତୁମି କାଉକେ ଖୁଲିଲେ ଦେଖେଚ କଥିନୋ ?

—ମାର କାହେଇ ଚାବି ଥାକତ, ମା-ଇ ମାଝେ ମଧ୍ୟ ଖୁଲିଲେନ, ଆର କାଉକେ ଆମି ଏ ଘରେର ଦରଜା ଖୁଲିଲେ ଦେଖିନି ବାବୁ ।

—ତୋମାର କୌତୁଳ ହୟନି କଥିନୋ—ଘରେ କେନ ସର୍ବଦା ତାଲା ଦେଓଯା ଥାକେ ?

—না।

—মানদা কখনো ঐ ঘরে ঢোকেনি?

—না, দেখিনি বাবু।

মানদা ও রতনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিরীটী সুশীল চক্ৰবৰ্তীকে নিয়ে আবার সারা বাড়িটা ঘুৱে ঘুৱে দেখল। বাড়ি থেকে বের হয়ে জীপে উঠে কিরীটী বলল, সুশীল, তোমায় একটা কাজ করতে হবে—

—কি বলুন দাদা?

—ডাঃ সমীর রায় আর ঐ অভিনেত্ৰী ডলি দন্ত—ওদের একটু খোঝখবৰ নিতে হবে। কাল-পৰশু যখন হোক ওদের থানায় ডেকে আনতে পারো?

—থানায়?

—হ্যাঁ। কিংবা এক কাজ কর, তোমাদের ডি.সি. ডি.ডি. মিঃ চট্টৱাজকে আমাৰ কথা বলে বোলো ওদেৱ লালবাজারে এনে জিজ্ঞাসাবাদ কৰাৰ জন্মে।

—সেই বোধ হয় ভাল হবে দাদা, আপনি বৰং ফোনে মিঃ চট্টৱাজকে বলুন, আমি আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এখুনি লালবাজার যাচ্ছি।

—ভাল কথা, তোমাৰ যয়না তদন্তেৰ রিপোর্ট এসেছে?

—সে তো কালই এসে গৈছে, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি।

—ফোৱেনসিক রিপোর্ট, ভিসেৱা ও অন্যান্য জিনিসেৱ?

—না, এখনো আসেনি, তবে আশা কৰছি দু-চার দিনেৰ মধ্যেই এসে যাবে।

ডি.সি. ডি.ডি. মিঃ চট্টৱাজকে বলতেই তিনি ডাঃ সমীর রায় ও ডলি দন্তকে লালবাজারে ডেকে আনবাৰ ব্যবস্থা কৰলেন, এবং কিরীটী ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাছে শুনে আৱণও খুশি হলেন।

লালবাজার থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা তিনটে হয়ে গেল সুশীল চক্ৰবৰ্তীৰ। থানায় চুকে তিনি দেখেন কিরীটী তাৰ ঘৰে বসে আছে।

—এ কি দাদা, আপনি কতক্ষণ? সুশীল চক্ৰবৰ্তী বললৈন।

—মিনিট দশক। কই দেখি তোমাৰ পোস্টমর্টেম রিপোর্ট—সুশীল চক্ৰবৰ্তী পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এগিয়ে দিলৈন।

যয়না তদন্তেৰ রিপোর্টে বলা হয়েছে, শ্বাসরোধ কৰেই হত্যা কৰা হয়েছে, এবং মৃত্যুৰ সময় সন্তুষ্ট সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটাৰ মধ্যে কোন এক সময়। শৱীৰেৱ কোথাও বিশেষ কোন আঘাতেৰ চিহ্ন পাওয়া যায় নি, যাতে কৰে প্ৰমাণিত হতে পাৱে মৃত্যুৰ পূৰ্বে নিহত ব্যক্তি কোন রকম স্ট্ৰাগ্ল কৰেছিল। মৃতেৰ হাতে এবং পায়ে অনেকগুলো কালো কালো চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। আৱ ভিসেৱাৰ রিপোর্ট এখনো আসেনি।

—আচ্ছা দাদা, সুশীল চক্ৰবৰ্তী বললৈন, হিন্দুস্থান ৱোডেৱ বাড়ি থেকে যে বাঙ্গ-ভৱা সিগাৱেট পাওয়া গিয়েছে, আপনি বলেছিলেন, ওগুলি সন্তুষ্ট নিষিদ্ধ নেশাৰ সিগাৱেট—ওৱ মধ্যে কি আছে বলে আপনাৰ মনে হয়?

—ଓର ମଧ୍ୟେ ଗାଁଜା ବା ଭାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ନେଶାର ବସ୍ତୁ ଆହେ ବଲେ ମନେ ହ୍ୟ । ଏଇ ଯାଦେର ତୋମରା ବଳ ହ୍ୟାସିସ ସିଗାରେଟ୍ । ଆମାଦେର ଦେଶେ ଭାରତୀୟ ଗାଁଜା ଥେକେଇ ଓହି ବସ୍ତୁଟି ତୈରି ହ୍ୟେ ଥାକେ । ଫାର୍ମାକୋପିଆତେও ତୁମି ଓର କଥା ପାବେ—An Arabian aromatic confection of Indian hemp. ପର୍ଶିମେର ଦେଶଙ୍କଲୋତେ ଏଇ ଧରନେର ସିଗାରେଟ୍ ନେଶାର ଜଣେ ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟାବହତ ହ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଗାଁଜା ଥେକେଇ ମୂଳତ ତୈରୀ ହ୍ୟ । ଆମାର ମନେ ହ୍ୟ, ଚୋରାଇପଥେ ଏଇ ନେଶାର କାରବାର ଚାଲାତ ମାଲଖ୍ପ ଦେବୀ । ଅବିଶ୍ୟାଇ ମେ ଏକା ନୟ, ମେଷେ ତାର ଆରଓ କେଉ କେଉ ନିଶ୍ଚରାଇ ଛିଲ, ଆର ଏଇ ନେଶାର ଚୋରାକାରବାର କରେ ପ୍ରଚୁର ଉପାର୍ଜନ କରତ ମାଲଖ୍ପ ଓ ତାର ସନ୍ଧିସାଥୀରା ।

—ତବେ କି ତାର ମତ୍ତୁର ପିଛନେ ଏଇ ଚୋରାକାରବାରେର କୋନ—

—ହଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ନା ସୁଶୀଳ । ଯାକ, ଆମି ଏଥିନ ଉଠିବ । ତୋମାଦେର ଡି.ସି. ଡି.ଡି. ଆମାକେ ଫୋନ କରେଛିଲେନ, ମେଥାନେ ଏକବାର ଯେତେ ହବେ ।

॥ ଏଗାରୋ ॥

ପରେର ଦିନ ବେଳା ନଟା ନାଗାଦ କିରୀଟୀ ଲାଲବାଜାରେ ଡି.ସି. ଡି.ଡି. ମିଃ ଚଟ୍ଟରାଜେର ଅଫିସ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଦେଖେ ଏକଜଣ ମଧ୍ୟବୟାସୀ ସୁଦର୍ଶନ ଭଦ୍ରଲୋକ, ପରନେ ଦାମୀ ସ୍ୟାଟ, ଚଟ୍ଟରାଜେର ମୁଖୋମୁଖୀ ବସେ ।

ଚଟ୍ଟରାଜ କିରୀଟୀକେ ଚୋଥେ ଇଦିତେ ଚୋଯାରେ ବସତେ ବଲାଲେନ ।

—ଡାଃ ରାଯ়, ଆପନାର ଏଇ ହିନ୍ଦୁହାନ ରୋଡ଼େର ବାଡ଼ିତେ ଯାତାଯାତ ଛିଲ ମେ କଥା ଆମରା ଗତକାଳଇ ଜାନତେ ପାରି—ଡି.ସି. ଡି.ଡି. ବଲାତେ ଥାକେନ ।

—ଯାତାଯାତ ଛିଲ ବଲାତେ ଆପନି କି ବୋବାଚେନ୍?

—ମାନେ ପ୍ରାୟଇ ଆପନି ଓଥାନେ ଯେତେନ ।

—ହଁ ଯେତାମ, ମାଲଖ୍ପ ଦେବୀ ଆମାର ପେସେନ୍ଟ ଛିଲେନ ।

—I see, ତା ତାର ରୋଗଟା କି ଛିଲ ଡାଃ ରାଯ়?

—ନାନା ଧରନେର ଅସୁଖ ଛିଲ । ତବେ ପ୍ରାୟଇ ମାଇଗ୍ରେନ ଆର ପେଟେର କଲିକେ ଭୁଗତେନ ।

ହଠାତ୍ ଏ ସମୟ କିରୀଟୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲ, excuse me ଡାଃ ରାଯ়, ଏକଟା କଥା, ଆପନି କି ଜାନତେନ ଏ ମହିଳାଟି ଗାଁଜା ଜାତୀୟ କୋନ ନିଯିନ୍ଦ ନେଶା କରତେନ ?

—ନା, ଆମି ଜାନି ନା ।

—ମାଲଖ୍ପ ଦେବୀ କଥିନୋ ବଲେନ ନି?

—ନା ।

—ଆପନି ସାଧାରଣତ ରାତ୍ରେର ଦିକେଇ ମେଥାନେ ଯେତେନ ଶୁନେଛି—

—ବାଜେ କଥା । ଯଥନଇ ଦରକାର ପଡ଼ତ ତଥନଇ ଯେତାମ, ଆମରା ଡାକ୍ତାର, କଲ ଏଲେ ଯେତେଇ ହ୍ୟ ।

—ଡାକ୍ତାର ହିସାବେଇ ତୋ ଯେତେନ ! ତବେ ଆପନାକେ ଦରକାରଟା ବେଶୀର ଭାଗ ରାତ୍ରେର ଦିକେଇ ହତ—ତାଇ ନୟ କି ?

—ବଲଲାମ ତୋ, ଯଥନ ଦରକାର ହତ ତଥୁନି ଯେତାମ ।

- তা মিৎ সুরজিৎ ঘোষাল ব্যাপারটা জানতেন?
- জানতেন বৈকি, আর তাঁর কল পেয়েই তো প্রথমে আমি সেখানে যাই—
- সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে মালঝর সম্পর্কের কথটা নিশ্চয় আপনি জানতেন অর্থাৎ মালঝ তার keeping-য়ে ছিল?
- আমার জানার দরকার হয়নি and that was none of my business.
- ডাঃ রায়, আপনি দীপ্তেন ভৌমিককে জানেন?
- হ্যাঁ, পরিচয় আছে। সমীর ডাক্তার বললেন।
- তিনি হিন্দুহান রোডের বাড়িতে যেতেন জানেন নিশ্চয়ই?
- না, তাকে সেখানে আমি কখনো দেখিনি।
- ডাঃ রায়, বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে একটা নাইট ক্লাব আছে, socalled সোসাইটির অভিজাত নরনারীরা যেখানে রাত্রে মিলিত হয়। ক্লাবটা জানেন আপনি?
- জানি।
- আপনিও তো সেখানে প্রায়ই যেতেন। সেখানে আপনার দীপ্তেন ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হত না?
- মনে করতে পারছি না।
- আর মিৎ সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে?
- না, তাঁকে কখনও সেখানে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।
- মালঝ দেবী—তাকে নিশ্চয়ই ঐ নাইট ক্লাবে দেখেছেন?
- হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি মাঝে মধ্যে সেখানে যেতেন।
- ডাঃ রায়, আপনি অভিনেত্রী ডলি দন্তকে চেনেন?
- না, ও নাম শুনিছিনি আমি কখনো।
- ডি.সি. ডি.ডি. প্রশ্ন করলেন, ব্যাকে আপনার কোন ভল্ট নেই?
- না মশাই, নেই। আমাদের আয়টাই আপনারা কেবল দেখেন, ব্যয়ের দিকটা কখনো ভেবে দেখেন না। আমার আয় যেমন তেমন খরচও অনেক।
- আচ্ছা আর একটা কথা, আবার কিরীটীর প্রশ্ন, আপনি তো মালঝ দেবীর ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ছিলেন, তিনি গাঁজা ছাড়া অন্য কোন রকম নেশা করতেন বলে জানেন?
- হ্যাঁ, করতেন। She was addicted to pethidine! প্রথমে abdominal colic-এর জন্যে নিতেন, পরে সেটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল।
- নিজে নিজেই ইন্জেকশন নিতেন বোধহয়?
- শেষের দিকে তাই নিতেন জানি।
- আপনি তাঁকে ঐ মারাত্মক বিষ শরীরে নিতে নিয়ে করেননি?
- বহুবার করেছি, কিন্তু পেথিডিনের নেশা বড় মারাত্মক নেশা, একবার ঐ নেশার কবলে পড়লে রেহাই পাওয়া দুর্কর—
- আর একটা নেশাও তিনি করতেন, আমরা যতদূর জেনেছি। জানেন কিছু?
- কিসের নেশা?
- হ্যাসিস—

—Good Lord ! ନା, ଆମି ଜାନତାମ ନା । and I don't think so, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରେ ପର ଡାକ୍ତାର ରାଯକେ ମିଃ ଚଟ୍ଟରାଜ ଯାବାର ଅନୁମତି ଦିଲେନ ।

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡଲି ଦନ୍ତକେ କିନ୍ତୁ ତାର ଟାଲାର ବାଡ଼ିତେ ଖୋଜ କରେ ପାଓୟା ଗେଲ ନା । ତାର ସ୍ଵାମୀ ଜୀବନ ଦନ୍ତ ବଲନେନ, ଛବିର ବ୍ୟାପାରେ ସେ ବୋଷାଇ ଗିଯେଛେ ।

ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବତୀ ଡଲି ଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କେ ଖୋଜିଥିବାର ନିଯେଛିଲେନ ।

ବୟମସ ତ୍ରିଶେର ମଧ୍ୟେ, ଧାନତିନେକ ଛବିତେ କାଜ କରେଛେ ବେଶ କରେକ ବହର ଆଗେ, ଏବଂ କୋନ ଛୁବିଇ ଦାଁଡାଯାନି । ବର୍ତ୍ତମାନେ ତିନ-ଚାର ବଂସର ତାର ହାତେ କୋନ କାଜ ନେଇ । ତାର ସ୍ଵାମୀ ଜୀବନ ଦନ୍ତ ବ୍ୟାପାର, ବେଶ ଭାଲାଇ ରୋଜଗାର କରେ । ମଞ୍ଚଲ ଅବହ୍ଳା । ଡଲି ଦନ୍ତ ଗ୍ୟାଜୁଯୋଟ ଏବଂ ହାଇ ସୋସାଇଟିତେ ତାର ଯାତାଯାତ ଓ ମେଲାମେଶା ଆଛେ । ନିଜେର ଏକଟା ଫିଯାଟ ଗାଡ଼ି ଆଛେ, ସେଟା ନିଯେଇ ସୁରେ ବେଡ଼ାଯ ।

ଡଲି ଦନ୍ତ ଏକଦିନ ନିଜେଇ ଲାଲବାଜାରେ ଏସେ ହାଜିର ହଲ । ଗାଡ଼ି ଥେକେ ନେମେ ଗଟଗଟ କରେ ସିଁଡ଼ି ଦିଯେ ଉଠେ ଏକେବାରେ ଚଟ୍ଟରାଜେର ଘରେର ସାମନେ ଗିଯେ ଦାଁଡାଳ । ଦରଜାର ଗୋଡ଼ାଯ ପ୍ରହରାରତ ସାର୍ଜନ୍ଟ ଡଲି ଦନ୍ତକେ ବାଧା ଦିଲ ।—କାକେ ଚାଇ ?

—ମିଃ ଚଟ୍ଟରାଜେର ସମେ ଦେଖା କରିବ । ବଲୁନ ଫିଲ୍ସ ଅ୍ୟାକଟ୍ରେସ ଡଲି ଦନ୍ତ ଏସେଛେନ ।

ସାର୍ଜନ୍ଟେର ନାମଟା ଶୋନା ଛିଲ, ବଲଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରନ, ଆମି ଖବର ଦିଚ୍ଛ—ବଲେ ସାର୍ଜନ୍ଟ ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଢୁକେ ଗେଲ । ପରମ୍ବହୁତେଇ ବେରିଯେ ଏସେ ବଲଲେ, ଯାନ, ଭିତରେ ଯାନ—

ଚଟ୍ଟରାଜ ତାର ନିଜେର ଅଫିସ ଘରେ ବସେ ଏକଟା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେନ । ଡଲି ଦନ୍ତ ଭିତରେ ଢୁକତେଇ ତିନି ବଲନେନ, ବସୁନ—

—ଶୁନଲାମ ଥାନା ଥେକେ ଆମାର ବାଡ଼ିତେ କେଉଁ ଆମାର ଖୋଜେ ଗିଯେଛିଲେନ, ଆମି କଳକାତାଯ ଛିଲାମ ନା—ଡଲି ଦନ୍ତ ବଲଲେ ।

ଚଟ୍ଟରାଜ ଚେଯେ ଛିଲେନ ଡଲି ଦନ୍ତର ଦିକେ । ବ୍ୟେବେସ ଯା-ଇ ହୋକ ଦେଖିତେ ସାତାଶ-ଆଟାଶେର ବେଶୀ ବଲେ ମନେ ହୟ ନା । ଫିଲ୍ସ ଫିଗାର, ବଗଲ-କାଟା ବୁକ-ଖୋଲା ବ୍ଲାଉ୍ ଗାୟେ, ପରନେ ଏକଟା ଡିପ ବୁଲୁ ରଙ୍ଗେ ଦାମୀ ଜର୍ଜ୍ ଶାଡ଼ି । ଗଲାଯ ଏକଟା ସୋନାର ସର୍କ ଚେନ, ଦୁ' କାନେ ଦୁଟୋ ହୀରାର ଫୁଲ । ହାତେ କିଛୁ ନେଇ, ଡାନ ହାତେ ଛୋଟ ଏକଟା ଦାମୀ ସୋନାର ଘଡ଼ି । ମାଥାର ଚଳ ଛୋଟ କରେ ଛାଟା, ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରା ।

ଡଲି ଦନ୍ତ ଚୋଯାରଟା ଟେନେ ନିଯେ ବସତେ ବସତେ ବଲଲ, ତା ଆମାକେ ହଠାତ୍ ଆପନାଦେର କି ପ୍ରୟୋଜନ ହୟ ବଲୁନ ତୋ ?

—ଆପନି ନିଶ୍ଚଯିଇ ସଂବାଦ ପେଯେଛେନ—ହିନ୍ଦୁହାନ ରୋଡ଼େର ମାଲକ୍ଷ ଦେବୀକେ ହତ୍ୟା କରା ହେଯେ ?

—ହଁଁ, ନିଉଝପେପାରେ ପଡ଼େଛି—

—ଆମରା ଶୁନେଛି ତିନି ଆପନାର ଏକଜନ ଘନିଷ୍ଠ ବାନ୍ଧବୀ ଛିଲେନ ।

—ବାନ୍ଧବୀ ! Not at all, ସାମାନ୍ୟ ପରିଚଯ ଛିଲ । ଆମାର ଏକଜନ admirer ଛିଲେନ ତିନି । ଏକଟା ଫାଂଶନେ ଆଲାପ ହେଯେଛି ଓର୍ବ ସଙ୍ଗେ ।

—ଆପନି ପ୍ରାୟଇ ତାର ହିନ୍ଦୁହାନ ରୋଡ଼େର ବାଡ଼ିତେ ଯେତେନ ?

—ପ୍ରାୟଇ ନଯ, ବାର ଦୁଇ ବୋଧହୟ ଗିଯେଛି ।

বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের নাইট ক্লাব দি রিট্রিটে আপনার যাতায়াত আছে—মালংশ
দেবীকে আপনি সেখানে দেখেছেন!

—দেখেছি।

—ডাঃ সমীর রায়কে চেনেন? এই শহরের নামকরা ফিজিসিয়ান?

—নাম শুনেছি, পরিচয় নেই।

—কিন্তু ডাঃ রায় বলেছেন, সেই নাইট ক্লাবেই তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়।
আপনারা উভয়েই উভয়ের পরিচিত এবং আপনি প্রায়ই ডাঃ রায়ের সঙ্গে মালংশ দেবীর
হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেতেন।

—ডাঙ্কার রায় বলেছেন তৈ কথা?

—হ্যাঁ। নচেৎ আমরা জানব কি করে?

—All bogus! দু-একদিন সামান্য একটু কথাবার্তা বললেই যদি যথেষ্ট পরিচয় হয়,
তাহলে তো যাদের সঙ্গে কখনো দু'-চারটে কথা বলেছি, তারা সকলেই আমার যথেষ্ট
পরিচিত।

—আপনি লেক রোডের দীপ্তি ভৌমিককে চেনেন?

—সামান্য পরিচয় আছে।

—তার সঙ্গে, তার গাড়িতে মাঝে মধ্যে আপনি বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের নাইট
ক্লাবে যেতেন আমরা জানতে পেরেছি—

—মাঝে মধ্যে নয়, বার দুই হয়তো গিয়েছি—

—And you stayed there till midnight—কথাটা সত্যি?

—তা মাঝে মধ্যে একটু বেশী সময় থাকতাম।

—গতকাল evening flight-এ বস্বে থেকে ফিরেই এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ট্যাক্সি
করে আপনি তার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন?

ডলি দন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ চট্টরাজের মনে হল হঠাৎ যেন ডলি দন্ত একটু
বিব্রত বোধ করছে। ডলি দন্ত কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

—কি ভাবছেন মিসেস দন্ত? সংবাদটা তাহলে মিথ্যে নয়?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। মানে—

—নিশ্চয়ই কোন জরুরী ব্যাপার ছিল—নচেৎ বাড়িতে না গিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে
সোজা একেবারে তার লেক রোডের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন কেন?

—হ্যাঁ একটু কাজ ছিল, মানে তার এক বন্ধু বস্বে থেকে একটা প্যাকেট তাকে পোঁছে
দিতে বলেছিলেন। জরুরী। তাই সোজা সেখানেই গিয়েছিলাম।

—জরুরী প্যাকেট! তা কি ছিল তার মধ্যে জানেন?

—না, আমি তা জানব কি করে?

—কিন্তু আমি বোধহয় অনুমান করতে পারি—প্যাকেটটার মধ্যে ছিল নিষিদ্ধ নেশার
বস্তু, হাসিস সিগারেট—

—Oh Christ! কি বলছেন আপনি?

—মিসেস দন্ত—গন্তীর গলায় চট্টরাজ বললেন, if I am not wrong, কথাটা

ଆପନି ଜାନତେନ ।

—ନିଶ୍ଚଯାଇ ନା, କଥନୋଇ ନା ।

—ଜାନତେନ, ଆପନି ଜାନତେନ । ଆର ଆପନି ବୋଷାଇ ଗିଯେଛିଲେନ କୋନ ଫିଲ୍ମେର contract-ଏର ବ୍ୟାପାରେ ନୟ, ଏହି ପ୍ୟାକେଟଟାଇ ନିଯେ ଆସତେ—

—What do you mean !

—ମିମେସ ଦତ୍ତ, ଆପନି ନିଃସନ୍ଦେହେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, କିନ୍ତୁ ଅସୀକାର କରେ କୋନ ଲାଭ ନେଇ । ଆପନି ଜାନତେନ ହିନ୍ଦୁହାନ ରୋଡ଼େର ବାଡ଼ିଟା ଏକଟା ଡେନ ଛିଲ, ଆର ଏଖାନେଇ ଏହି ନିଯିନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହ୍ୟାମିସେର ଲେନଦେନ ଚଳତ—

—Believe me officer, ଆ—ଆମି ଓସବ ବ୍ୟାପାରେ କିଛୁଇ ଜାନତାମ ନା, ଜାନଲେ ଏହି ବାଡ଼ିର ତ୍ରିସୀମାନାତେଓ ଯେତାମ ନା ।

—ମିମେସ ଦତ୍ତ, କୋନ୍ ବ୍ୟାକେ ଆପନାର ଅୟାକାଉଁଟ ଆଛେ ?

—ବ୍ୟାକେ ଅୟାକାଉଁଟ ?

—ହଁଁ, କାରଣ ଆମର ଥବର ପେଯେଛି, ରୋଜଗାର ଆପନାର ଭାଲଇ, ଏବଂ ସେଟା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ଥେକେ ନୟ—

—ଆପନି ଜାନେନ ନା ଆମର ସ୍ଵାମୀ ଏକଜନ ବ୍ୟାକାର ଏବଂ ମେ ସେ ସ୍ଥେଟ୍ ରୋଜଗାର କରେ । ମେ ପ୍ରତି ମାସେ ଆମାକେ ଅନେକ ଟକା ହାତଥରଚ ଦେଇ । Film-ଏ ଅଭିନ୍ୟ କରାଟା ଆମର ପେଶା ନୟ, ନେଶା । ହଁଁ, ନେଶାଇ ବଲତେ ପାରେନ । ବ୍ୟାକେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଏକଟା ଅୟାକାଉଁଟ ଆଛେ । ବ୍ୟାକେର ନାମ ଦିଛି, ଆପନାରା ଖୋଜ ନିଯେ ଜାନତେ ପାରେନ—

—ଠିକ ଆଛେ, ଆପନି ଯେତେ ପାରେନ । ତବେ ଆପନାକେ ହୟତୋ ଭବିଷ୍ୟତେ ଆବାର ଆମାଦେର ପ୍ରୋଜନ ହବେ । ଆମାଦେର ନା ଜାନିଯେ ଆପନି କଲକାତାର ବାଇରେ ଯାବେନ ନା ।

—କିନ୍ତୁ କେନ, ଆପନାରା କି ମାଲକ୍ଷର ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପାରେ ଆମାକେ ସନ୍ଦେହ କରାନେ ?

—ସନ୍ଦେହ ସକଳେର ପ୍ରତିଇ ହୁଏ ସ୍ଵାଭାବିକ, ବିଶେଷ କରେ ଯାରା ମାଲକ୍ଷ ଦେବୀର ମୁଦ୍ରା ଘନିଷ୍ଠ ଛିଲ, ଯାଦେର ଓଥାନେ ଯାତାଯାତ ଛିଲ । ଆଛା, ଆପନି ଆସୁନ ।

ଡଲି ଦତ୍ତ ଆମାର ସମୟ ଯେତାବେ ଗଟ୍-ଗଟ୍ କରେ ଏସେଛିଲେନ, ବେରୁବାର ସମୟ କିନ୍ତୁ ତେମନ ନୟ, ଗଠିତ ମନେ ହଲ ଶ୍ରୀତ । ଏକଟୁ ପରେ ଡଲି ଦତ୍ତର ଗାଡ଼ିଟା ଲାଲବାଜାରେର ଗେଟ ଦିଯେ ବେର ହୟେ ଗେଲ ।

॥ ବାରୋ ॥

ଡଲି ଦତ୍ତ ବେର ହୟେ ଯାବାର ପର ଚଟ୍ଟରାଜ କିରୀଟିର ମୁଦ୍ରା ଫୋନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲେନ—ରାଯସାହେବ ଏକବାର ଆମାର ଅଫିସେ ଆସତେ ପାରେନ ?

କିରୀଟି ବଲଲ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ପର ଯାବ ।

ଫୋନେର ରିସିଭାରଟା ନାମିଯେ ରେଖେ କିରୀଟି ତଥୁନି ବେରୁବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଲ । ଏକବାର ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବତୀର ଓଥାନେ ଯେତେ ହେବ ।

କୃଷ୍ଣ ଜିଙ୍ଗାସା କରଲ, ବେରଛୁ ନାକି ?

—ହଁଁ, ଏକବାର ସୁଶୀଳର ଓଥାନେ ଯାବ ।

—ଯେତେ ହବେ ନା ଦାଦା, ଆମି ଏମେ ଗିଯେଛି—ବଲେ ହାସତେ ସୁଶୀଳ ଚଞ୍ଚବତୀ ଘରେ ମଧ୍ୟେ ଏମେ ଢୁକଲେନ ।

—ଆରେ ଏମୋ ଏମୋ ସୁଶୀଳ, ତୋମାର କାହେଇ ଯାଇଲାମ ।

—ବୌଦ୍ଧ, କହି—

କୃଷ୍ଣ ଘର ଥିକେ ବେର ହେୟ ଗେଲ ।

ସୁଶୀଳ ବଲିଲେନ, ଆପନାର ଅନୁମାନଇ ଠିକ ଦାଦା, ଓ ଗୁଲୋ ହ୍ୟାସିସ ସିଗାରେଟ—

—ତୋମାକେ ଯେ ବଲେଇଲାମ ମାଲଙ୍ଗର ଘରଟା ଆର ଏକବାର ଭାଲ କରେ ସାର୍ଟ କରନ୍ତେ ?

—କରେଛି । କିନ୍ତୁ ଘରଟା ତମ ତମ କରେ ଖୁଜେଓ କୋନ ହାଇପୋଡାର୍ମିକ ସିରିଙ୍ଗ ବା ପେଥିଡିନ ଅୟାମ୍ପୁଲ ତୋ ପେଲାମ ନା ।

—ହିସେବ ଯେ ମିଳିଛେ ନା ଭାଯା । କିରୀଟି ଯେନ ଏକଟୁ ଚିନ୍ତିତ ।

—କି ଭାବଛେନ ଦାଦା ! ସୁଶୀଳ ଚଞ୍ଚବତୀ ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ, କିମେର କି ହିସେବ ଆବାର ମିଳିଛେ ନା ?

—ଭାବଛି ତାହଲେ ପେଥିଡିନ ଅୟାମ୍ପୁଲ ବା ଏକଟା ହାଇପୋଡାର୍ମିକ ସିରିଙ୍ଗ ପାଓୟା ଗେଲ ନା କେନ ? ଯେ ପେଥିଡିନ ଅୟାଡିକ୍ଟେଡ ତାର ଘରେ ଏଇ ଦୂଟି ବଞ୍ଚି ଥାକବେ ନା ତା ତୋ ହତେ ପାରେ ନା । ତବେ କି ହତ୍ୟାକାରୀ କାଜ ଶେଷ ହେୟ ଯାବାର ପର ଏଇ ଦୂଟି ବଞ୍ଚି ସର ଥିକେ ନିଯେ ଗିଯେଛେ ? ତାହି ଯଦି ହୁଏ ତୋ, ଆମରା ଦୁଟୀ definite conculsion-ଯେ ପୌଛାତେ ପାରି ସୁଶୀଳ ।

—କି କନ୍ରମିଶନ ?

ପ୍ରଥମତ, ହତ୍ୟାକାରୀ unknown third person ନାମ, ସେ ମାଲଙ୍ଗର ବିଶେଷ ପରିଚିତେର ମଧ୍ୟେଇ ଏକଜନ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତ, ମାଲଙ୍ଗ ଯେ ପେଥିଡିନ ଅୟାଡିକ୍ଟେଡ, ସେଟା ସେ ଭାଲ କରେଇ ଜାନନ୍ତ, ଏବଂ ସେଟା ତାର ପକ୍ଷେ ସୁବିଧାଇ ହେୟାଇଲ ।

ସୁଶୀଳ ଚଞ୍ଚବତୀ କିରୀଟିର ଇମିଟଟା ସମ୍ମେ ସମେଇ ବୁଝିତେ ପାରେନ—ବଲେନ, ତାହଲେ ତୋ ଏଇ ପରିଚିତ ପାଂଜନ୍ୟର ମଧ୍ୟେଇ ଏକଜନ—

—ହୁଁ, ମାଲଙ୍ଗର ସ୍ଵାମୀ ସୁଶାନ୍ତ ମଲିକ, ତାର ବାବୁ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲ, ଦୀପ୍ତନ ଭୌମିକ ଏବଂ ଡାଃ ସମୀର ରାୟ, ତାର ପେଯାରେର ଚୋରାଇ କାରବାରେର ପାଟନାର ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଡଲି ଦୃଢ଼—କିରୀଟି ବଜାଲେ ।

କିରୀଟିର ମୁଖେର ଦିକେ ଚେଯେ ଥାକେନ ସୁଶୀଳ ଚଞ୍ଚବତୀ ।

—ଏଥନ କଥା ହଚ୍ଛେ ସୁଶୀଳ, ଓରା ସକଳେଇ ମାଲଙ୍ଗର ବିଶେଷ ପରିଚିତ ଜନ ହଲେଓ ଓରା ସକଳେଇ କି ଜାନନ୍ତ ଯେ ମାଲଙ୍ଗ ପେଥିଡିନ ଅୟାଡିକ୍ଟେଡ—ଏକ ଡାକ୍ତାର ଛାଡ଼ା ?

—ଏକସମେ ମେଲାମେଶା, ଏକଇ ସୂତ୍ରେ ବାଁଧା, ଏକଇ ଇଟ୍ଟାରେସ୍ଟ—ଓଦେର ସକଳେର ଜାନାଟାଇ ତୋ ସ୍ଵାଭାବିକ ଦାଦା—

—କି ଜାନି, ହତେଓ ପାରେ । ତବେ ଆମାର କେନ ଯେନ ମନେ ହଚ୍ଛେ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲକେ ଅନାୟାସେଇ ଏଇ ଲିନ୍‌ସ୍ଟ ଥିକେ elemenate କରା ଯେତେ ପାରେ ଆପାତତ ।

କେନ ?—

—ହାଜାର ହଲେଓ ମାଲଙ୍ଗ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲେର କିପିଂଯେ ଛିଲ, ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ମେ ନିଶ୍ଚଯାଇ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲକେ ବ୍ୟାପାରଟା ଜାନନ୍ତେ ଦେବେ ନା, ବିଶେଷ କରେ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲ ସମ୍ପର୍କେ ଖୋଜ ନିଯେ ଯା ଜାନା ଗିଯେଛେ, ମଦ ତୋ ଦୂରେର କଥା, ଭଦ୍ରଲୋକ ସ୍ନୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେନ ନା !

মালঞ্চ সম্পর্কে তাঁর চরিত্রের ঐ বিশেষ দুর্বলতাটুকু ছাড়া সত্যিই তিনি একজন যাকে বলে ভদ্রলোক। আজকের সো-কল্ড সোসাইটির কোন ভাইস-ই তাঁর ছিল না। সেদিক দিয়ে বাকী চারজন তোমার সন্দেহের তালিকাভুক্ত সুশীল।...

—ঐ চারজনের মধ্যে কাকে আপনি—

—সুশীল, মাকড়সার জালে চার-পাঁচটা বিষাঙ্গ মাকড়সা বিচরণ করছে, এবং ঐ প্রত্যেকটি মাকড়সার ক্ষেত্রে মালঞ্চকে হত্যা করার যথেষ্ট মোটিভ থাকতে পারে। কাজেই এই মুহূর্তে ওদের চারজনের মধ্যে বিশেষভাবে একজনকে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ, সার্কামস্টান্সিয়াল এভিডেন্স যাকে বলে, তার দ্বারাই একমাত্র ওদের একজনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা চলতে পারে, অন্য কাউকে নয়। অবিশ্য বোধ যাচ্ছে ওরা সকলেই একটা ঢোরাকারবার চালাত এবং প্রত্যেকেরই ঐ হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেমন যাতায়াত ছিল তেমনি ছিল আরো একটা মিটিং প্লেস, এই নাইট ক্লাবটি, সেক্ষেত্রে ওদেরই কেউ একজন হত্যাকারী হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হত্যাকারী বললেই তো হবে না, আপত্তিপূর্ণভাবে ওদের প্রত্যেকের মোটিভ থাকলেও ঐ সঙ্গে তোমাকে ভাবতে হবে ওদের মধ্যে সে রাত্রে কার পক্ষে মালঞ্চকে হত্যা করা সবচাইতে বেশী সম্ভব ছিল, অর্থাৎ probability-র দিক থেকে কার উপরে বেশী সন্দেহ পড়ে। তার ওপর base করে তুমি যদি এগুলে পারো তাহলেই দেখবে ঐ হত্যারহস্যের কাছাকাছি তুমি পৌঁছে গেছ। হাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আরো প্রমাণ চাই, অতএব তোমায় 'কিছুটা সুতো ছাড়তে হবে—আরো সুতো, তবেই বিবাট কাতলাকে তুমি বঁড়শীতে গাঁথতে পারবে।

পরের দিনই সুশীল চক্ৰবৰ্তী সকাল আটটা নাগাদ লেক রোডে দীপ্তেন ভৌমিকের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলেন।

দিনটা ছিল রবিবার। লিফ্টে করে ওপরে উঠে ফ্ল্যাটের কলিং বেলের বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল।

—ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা মধ্যবয়সী ভৃত্যশ্রেণীর 'একটি লোক দরজাটা খুলে বলল, কাকে চান?

—এখানে দীপ্তেন ভৌমিক থাকেন?

—হ্যাঁ। কি নাম বলব সাহেবকে?

—বল একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান, বিশেষ জরুরী প্রযোজন।

—বসুন, আমি সাহেবকে খবর দিচ্ছি। তবে রবিবার তো, সাহেব কারো সঙ্গেই দেখা করেন না, আপনার সঙ্গেও দেখা করবেন কিনা জানি না।

—একটা কাগজ দাও, আমি আমার নাম লিখে দিচ্ছি—

সুশীল চক্ৰবৰ্তীর দিকে একটুকুৱা কাগজ এগিয়ে দিল বেয়ারা। সুশীল চক্ৰবৰ্তী কাগজটিতে নিজের নাম লিখে দিলেন। বেয়ারা কাগজটা নিয়ে চলে গেল।

বেশ বড় সাইজের একটি হলঘর, ওয়াল টু ওয়াল কাপেটি পাতা, বেশ দামী, নরম পুরু কাপেটি। সুন্দরভাবে সাজানো ঘরটি, সোফা সেট, বুককেস, ডিভান, কাচের শো-

কেসে ইংরাজী বাংলা সব বই। দেওয়ালে দীপ্তেন ভৌমিকেরই একটি রঙ্গীন বড় ফটো, জানালা দরজায় দামী পর্দা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পরনে প্লিপিং পায়জামা ও গায়ে গাউন জড়ানো, মুখে সিগারেট, বের হয়ে এলেন দীপ্তেন ভৌমিক।

—আপনি মিঃ চক্ৰবৰ্তী? দীপ্তেন প্রশ্ন কৱল, কি প্ৰয়োজন আমাৰ কাছে?

—বসুন, বলছি।

—একটু তাড়াতাড়ি সারতে হবে কিন্তু মিঃ চক্ৰবৰ্তী, আমাকে এখুনি আবাৰ একটু বেৱলতে হবে।

—হিন্দুস্থান রোডেৰ মাৰ্ডাৰ কেসটাৰ ব্যাপারে আপনাকে পুলিসেৰ তৱফ থেকে আৱও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

—বলুন কি জিজ্ঞাস্য আছে।

—আপনাৰ তো মালংশ দেৰীৰ সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল?

—হৃদ্যতা! Not at all, তবে চিনতাম তাকে।

—আমৰা কিন্তু জেনেছি আপনি প্ৰায়ই হিন্দুস্থান রোডেৰ বাড়িতে যেতেন—

—প্ৰায়ই নয়, কথনো-স্থনো যেতাম।

—ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই যে সেখানে আপনি যেতেন সেটা কিন্তু আমৰা জেনেছি মিঃ ভৌমিক। শুধু সেখানেই নয়, দি রিট্ৰিট নাইট ক্লাবেও আপনি মালংশ দেৰীৰ সঙ্গে যেতেন। মিঃ ভৌমিক, বিভিন্ন সোৰ্স থেকে আমৰা যথাসম্ভব খবৰাখবৰ সংগ্ৰহ কৰেই আপনাৰ কাছে এসেছি। অতএব বুঝতেই পাৱছেন, অৰ্পণাৰ কৰে কোন লাভ নেই!

সুশীল চক্ৰবৰ্তীৰ স্পষ্ট কথায় ও গলাৰ স্বৰে এনে হল দীপ্তেন ভৌমিক যেন একটু থমকেই গিয়েছে।

হঠাতে শয়নঘরেৰ দৱজা খুলে গেল এবং অভিনেত্ৰী ডলি দণ্ড ঘৰ থেকে বেৱ হয়ে এলো। ডলি দণ্ডৰ সঙ্গে পূৰ্বেই কথাবাৰ্তা হয়েছিল সুশীল চক্ৰবৰ্তীৰ, তাই ডলি দণ্ড সুশীল চক্ৰবৰ্তীকে দেখে যেন একটু থমকে দাঁড়াল। কিন্তু পৰমুহূৰ্তে নিজেকে সামলে নিয়ে দীপ্তেনৰ দিকে তাকিয়ে বললে, দীপ্তেন, যাচ্ছি—

—এসো—মৃদুকষ্টে দীপ্তেন বলল।

ঘৰেৰ মধ্যে একটা বিদেশী সেটেৰ সৌৱত ছড়িয়ে ডলি দণ্ড বেৱ হয়ে গেল।

—বেশ স্বীকাৰ কৱলাম না হয় ছিল, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? দীপ্তেন বলল।

—সুৱজিৎ ঘোষাল যে সেটা পছন্দ কৱতেন না তাৰে নিশ্চয় আপনাৰ অজানা ছিল না?

—Don't talk about that old fool!

—কিন্তু সুৱজিৎ ঘোষালেৰই রঞ্জিতা ছিলেন মালংশ দেৰী, আপনাৰ ও মালংশ দেৰীৰ মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, বিশেষ কৰে তাঁৰ অবৰ্তমানে, সুৱজিৎ ঘোষালেৰ না পছন্দ হওয়াটাই স্বাভাৱিক নয় কি?

—ওসব কথা ছাড়ুন মিঃ চক্ৰবৰ্তী, আমাৰ কাছে কি জানতে চান বলুন?

—যে রাত্ৰে দুৰ্ঘটনাটা ঘটে সে রাত্ৰে আপনি মালংশ দেৰীৰ বাড়ি গিয়েছিলেন?

—সে তো আগেই বলেছি।

—হ্যাঁ, আপনি বলেছেন এবং আপনি এও বলেছেন যে সদর দিয়েই বের হয়ে এসেছিলেন আপনি!

—এখনও তাই বলছি, এবং বের হয়ে সোজা আমি ট্রেন ধরি।

—না, সে রাত্রে আপনি তখনই কলকাতা ছেড়ে যাননি, এবং সে রাত্রে আবারও আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন, I mean second time!

—What nonsense! কি সব আবোল-তাবোল বকছেন মিস্টার চক্রবর্তী?

—যথেষ্ট প্রমাণ হাতে না পেয়ে আপনাকে আমি কথাটা বলছি না মিঃ ভৌমিক। আপনাকে আর ডলি দত্তকে সেই রাত্রে বারোটা নাগাদ নাইট ক্লাব দি রিট্রিটে ড্রিংক করতে দেখা গিয়েছে।

—হতেই পারে না।

—বললাম তো, আমাদের হাতে তার প্রমাণ আছে। এবার বলুন মিঃ ভৌমিক, সেদিন সন্ধ্যারাত্রে মালওঁ দেবীর হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বের হয়ে ঐ নাইট ক্লাবে যাবার আগে পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন? কি করেছিলেন?

—আমি নাইট শোতে সিনেমা গিয়েছিলাম।

—তাহলে সে রাত্রে আপনি কলকাতা ছেড়ে যাননি স্বীকার করছেন?

—হ্যাঁ, কলকাতাতেই ছিলাম।

—আপনি সেকেন্ড টাইম আবার হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বলুন কেন গিয়েছিলেন?

—দরকার ছিল।

—কি এমন দরকার পড়ল যে সেকেন্ড টাইম সেখানে যেতে হল মিঃ ভৌমিক?

—সেটা সম্পূর্ণ আমার পার্সোনাল ব্যাপার, ব্যক্তিগত।

—তা কখন গিয়েছিলেন? মানে কটা রাত্রি তখন? যদিও একটু আগে বললেন সিনেমায় গিয়েছিলাম!

—বই দেখতে আমার ভাল লাগছিল না, তাই ইন্টারভ্যালের আগেই বের হয়ে আসি সিনেমা হাউস থেকে।

—ট্যাক্সিতেই বোধহয় গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তখন রাত কটা হবে?

—পৌনে এগারোটা হবে। ঠিক সময় দেখিনি।

—আচ্ছা, মানদা বা রতন কেউই দ্বিতীয়বার আপনাকে সেখানে যেতে দেখেনি, তাহলে ধরতে হয় আপনি নিশ্চয়ই মেখরদের যাতায়াতের জন্য পিছনের সিঁড়ি পথে উঠে বাথরুমের দরজা দিয়েই গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—ওই দরজা দিয়ে আপনি মাঝে মধ্যে যেতেন তাহলে?

—যেতাম।

- ঘরে চুকে কি দেখলেন আপনি? মানে মালঞ্চ দেবী কি করছিলেন সে সময়?
- ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ একটা সোফায় বসেছিল সে।
- তারপর?
- দশ মিনিটের মধ্যেই আমি আমার কাজ সেরে চলে আসি। পরে স্থান থেকে নাইট ফ্লাবে যাই।
- মালঞ্চ দেবী তখন তাহলে জীবিত ছিলেন?
- হ্যাঁ।
- মালঞ্চ দেবী যে একজন স্বাগলার ছিলেন আপনি জানেন?
- স্বাগলার! না তো? কে বললে? ইমপসিবল!
- হ্যাসিমের চোরাকারবার ছিল তাঁর, আপনি জানতেন না বলতে চান?
- না, বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি জানতাম না। I never knew that she was a smuggler!
- হ্যাঁ। তিনি কি পেথিডিন অ্যাডিটেড ছিলেন তাও জানতেন না বোধহয়?
- না তো!
- তাঁর সঙ্গে এতদিন ঘরে এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ঐ দুটি সংবাদ আপনার অবিদিত ছিল মিঃ ভৌমিক, এটা কি একটা বিষাসযোগ্য কথা হল? আপনি জানতেন, জানতেন কিন্তু এখন স্বীকার করছেন না। ঠিক আছে, আপনি ডাঃ সমীর রায়কে চেনেন নিশ্চয়ই?
- চিনি।
- তাঁরও সঙ্গে মালঞ্চ দেবীর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই না?
- ডাঃ রায় ওর ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ছিলেন এইচকুই জানি, তার বেশী কিছু জানি না।
- আপনি কি ব্র্যান্ড সিগারেট খান?
- কেন বলুন তো?
- দেখি আপনার সিগারেট কেসটা—
- দীপ্তেন ভৌমিক নাইট গাউনের পকেট থেকে একটা দামী সিগারেট কেস বের করে দিলেন সুশীল চক্রবর্তীর হাতে। কেসটা খুলে দেখলেন সুশীল চক্রবর্তী, স্বাগল করা সিগারেট স্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫—এবং আরও একটা ব্যাপার নজরে পড়ল ভিতরের দিকে ডালার গায়ে এনগ্রেড করে লেখা—To Dipten—Mala.
- সিগারেট কেসটা ফেরত দিতে দিতে সুশীল চক্রবর্তী বললেন, এই মালাটি কে দীপ্তেনবাবু? Who is she?
- এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার মিঃ চক্রবর্তী।
- আচ্ছা, আপনার সোনার সিগারেট কেস ছিল কি কখনো?
- না তো।
- আপনার পরিচিত জনেদের মধ্যে কারও ছিল বলে কি আপনার মনে পড়ে?
- ডাঃ রায়ের কাছে একটা সোনার সিগারেট কেস দেখেছি বলে মনে পড়ছে।
- তিনি কি ব্র্যান্ড সিগারেট খান?

—ସେମ ବ୍ୟାଡ—State Express 555.

—ଠିକ ଆଛେ, ଆର ଆପନାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରବ ନା । ତବେ ଆପନାକେ ଆବାର ଆମାଦେର ପ୍ରୟୋଜନ ହତେ ପାରେ । କଲକାତାର ବାଇରେ ଗେଲେ ପୁଲିସେର ପାରମିଶନ ଛାଡ଼ା ଯାବେନ ନା ।

—ଠିକ ଆଛେ ।

—ଚଲି । ସୁଶୀଳ ଚତ୍ରବତୀ ଅତଃପର ଉଠେ ଦାଁଢାଲେନ ।

॥ ତେରୋ ॥

ମାଲକ୍ଷ ହତ୍ୟାରହସ୍ୟ ଆରୋ ସନ୍ନୀଭୂତ ହଲ ଏବଂ ତାର ଆଭାସ ପାଓୟା ଗେଲ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ, ସଂବାଦପତ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଂବାଦେ ।

“ଶହରେର କୋନ ଏକ ନାମକରା ଡାଙ୍କାର ଓ କୋନ ଏକ କୋମ୍ପାନିର ବଡ଼ ଅଫିସାରେର ବ୍ୟାକେର ଲକାର ଥେକେ ପ୍ରଚୁର ଗିନି ଓ କାରେଲୀ ନୋଟ ପାଓୟା ଗିଯେଛେ । ଯେ ଅର୍ଥେର କୋନ ବିଦ୍ୟାସମୋଗ୍ୟ ଏକପ୍ଲାନେଶାନ ଓଇ ଦୁଜନେର ଏକଜନେ ଦିତେ ପାରେନନି, ଓରା ଦୁଜନେଇ ନିହିତ ମାଲକ୍ଷ ଦେବୀର ବିଶେଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ପରିଚିତ ଛିଲେନ ।

ଆରୋ ଏକଟି ସଂବାଦ—“ମାଲକ୍ଷ ଦେବୀ ପେଥିଦିନେ ଅୟାଡିକ୍ଟେଙ୍କ୍ ଛିଲେନ । ହିନ୍ଦୁହାନ ରୋଡ଼େର ବାଡ଼ିର ଏକଟି ତାଲାବନ୍ଧ ଘରେ ତଳାସୀ ଚାଲିଯେ ପୁଲିସ୍-ବହୁ ଟାକାର ନିୟିନ୍ଦ୍ର ନେଶାର ବନ୍ଦ ପେଯେଛେ । ଏ ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପାରେର ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ସନ୍ଦେହେ ପୁଲିସ ମାଲକ୍ଷ ଦେବୀର ପେଯାରେର ଦାସୀ ମାନଦା ଦାସୀକେ ଗ୍ରେଣ୍ଟାର କରେଛେ ।”

ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଆବାର ସଂବାଦ ବେରଳ କାଗଜେ କାଗଜେ—

“ଶହରେର ଏକ ନାମକରା ଅୟାଡିଭୋକେଟ୍ ଜଗଣ୍ଠ ଚୌଧୁରୀ, ମାନଦାର ଜାମିନେର ଜଳ ଆଦାଲତେ ଆବେଦନ ରେଖେଛିଲେନ କିନ୍ତୁ ପାବଲିକ ପ୍ରସିକିଉଟାର ସଦାନନ୍ଦ ମିତ୍ର ତାର ବିରୋଧିତା କରେନ । ଜଜ ଆରୋ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷେ ମାନଦାର ଜାମିନ ଅନୁମୋଦନ କରେନନି । ତାକେ ଜେଲହାଜାତେ ରାଖାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରେଛେ । ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲେର ଜାମିନେର ପ୍ରକ୍ଷ ନିୟେ ଜଜସାହେବ ବିବେଚନା କରବେନ ଆଗାମୀ ମଦ୍ଦଳବାରା ।”

ଏଦିନଇ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦିକେ ସୋମନାଥ ଭାଦୁଡ଼ୀ ତାଁ ରେଯାରେ ବସେ କିରୀଟିର ସଙ୍ଗେ ଏ ମାମଲାର ବ୍ୟାପାର ନିୟେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛିଲେନ ।

କିରୀଟି ବଲଛିଲ, ମାନଦା ଯେ ଅନେକ କିଛୁଇ ଜାନେ ଭାଦୁଡ଼ୀ ମଶାଇ, ସେଟା ଅନୁମାନ କରେଇ ଆମି ସୁଶୀଳକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଯେଛିଲାମ ଓକେ ଗ୍ରେଣ୍ଟାର କରତେ ।

—ଆମାରେ ମନେ ହୁଏ କାଜଟା ଭାଲାଇ ହେଁଲେ ରାଯାମଶାଇ, ଆପନାର କାହେ ଯା ଶୁନଲାମ, ତାତେ ମନେ ହଚ୍ଛେ, ହତ୍ୟାକାରୀକେ ନାନାଭାବେ ଏହି ମାନଦାର ସାହାଯ୍ୟ ନିତେ ହେଁଲେ । କିନ୍ତୁ ମାନଦାର ଜାମିନେର ବ୍ୟାପାରେ ଆମାଦେର ଜଗଣ୍ଠ ଚୌଧୁରୀକେ କେ ବିଷ ଦିଯେଛେନ ସେଟାଇ ବୁଝାତେ ପାରଛିନା ।

—ଯାର ବେଶୀ interest ନିଃସନ୍ଦେହେ ସେ-ଇ ଦିଯେଛେ—କିରୀଟି ମୃଦୁ ହେସେ ବଲଲ ।

—କିନ୍ତୁ କେ ସେ ? କାକେ ଆପନାର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ବଲୁନ ତୋ ?

—ସନ୍ଦେହ ଯାର ଓପରେଇ ହୋକ, ଏକଟା ବ୍ୟାପାରେ ଆମି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଁଛି ଭାଦୁଡ଼ୀ ମଶାଇ—କିରୀଟି ବଲଲ, ମାନଦା ଅନେକ କିଛୁଇ ଜାନେ ଆର ତାଇ ବୋଧହୟ ଆମାର ଅନୁମାନ, କିରୀଟି ଅମନିବାସ (୧୩)—୧୧

হত্যাকারী মানদার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে জানে না এই রকমের চরিত্রের এক মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করে কত বড় ভুল সে করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো মানদার হাত দিয়েই ফাঁসির দড়িটা তার গলায় এঁটে বসবে।

—আপনিই তো একটু আগে বলেছিলেন রায়মশাই, সুশাস্ত মল্লিক নাকি এই মানদা সম্পর্কে বলেছিল, she is a dangerous woman!

—হাঁ, বলেছিল, কিন্তু you can't count much upon him! একটা মেরুদণ্ডহীন মাতাল—নিজের স্ত্রীকে অন্যের রক্ষিতা জেনেও তারই আশ্রয়ে যে পড়ে থাকে এবং তারই টাকায় নেশা করে, আর যাই হোক তাকে বোধহয় পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

—আচ্ছা রায়মশাই, এই চিত্রাভিনন্দিত্বাচিকে আপনার কি রকম মনে হয়?

—গোলমালটা হয়তো সেখানেও থাকতে পারে ভাদুড়ি মশাই।

—হাঁ, এটা তো বুবতে পারা গিয়েছে দীপ্তিন ভৌমিককে মালঝ ভালবাসত, তাই হয়তো সে ডলি দন্তের প্রতি দীপ্তিনের আকর্ষণ্গটা ভাল চোখে দেখত না। এবং ডলি দন্তও মালঝকে অনুরূপ সুরজরে দেখত না। ফলে সন্তুষ্ট পরম্পরের প্রতি একটা jealousy হয়তো দেখা দিয়েছিল দীপ্তিন ভৌমিককে ঘিরে। আর কে বলতে পারে, সেই ঈর্ষাকে মষ্টন করেই হয়তো হলাহল উঠে এসেছিল, যে হলাহল মালঝের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

—আর ঐ ডাঙুরাটি?

—আমার যতদূর মনে হয় সে ভদ্রলোকও চোরাকারবারে একজন অংশীদার, এবং সেক্ষেত্রে ঐ মাকড়শার জালে তাঁরও জড়িয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

—আচ্ছা রায়মশাই, আপনার কি মনে হয় মালঝের স্বামী সুশাস্ত মল্লিকও ঐ চোরাকারবারে—

—অংশীদার সে হয়তো এই চোরাকারবারে ছিল না—আর সেটা সন্তুষ্ট নয়।

—কেন?

—আর যাই করক না কেন মালঝ, এই আশ্রিত ও পোষ্য স্বামীকে যে তার চোরাকারবারের মধ্যে নেবে—সেটা সন্তুষ্ট নয়। তবে একই বাড়িতে যখন ছিল লোকটা তখন তার পক্ষে ব্যাপারটা অনুমান করা এমন কিছু অসন্তুষ্ট নয়।

—আচ্ছা রায়মশাই, আপনার কি মনে হয় আমার ক্লায়েন্ট সুরজিৎ ঘোষাল ঐ চোরাকারবারের মধ্যে ছিল?

—মনে হয় না চোরাকারবারের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল। তবে জোর করে কিছুই এই মুহূর্তে বলা যায় না ভাদুড়ী মশাই।

—বাঁচালেন। আমারও তাই ধারণা রায়মশাই।

কিরীটী মৃদু হাসল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, মালঝের মৃত্যুর কারণ দুটোই হতে পারে—হয় ঈর্ষার হলাহল নতুবা চোরা-কারবারের বিষময় পরিণাম।

ভাদুড়ী বললেন, সত্যি রায়মশাই, আজকের সমাজের মানুষগুলো কি ভাবে যে বদলে যাচ্ছে দিনকে দিন, মরাল বা নীতির কোন বালাই নেই।

—কোথা থেকে থাকবে ভাদুড়িমশাই, আজকের জীবনযাত্রা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে কেবল ছুটবার নেশা এসেছে। একটা অস্থিরতা, আর সেই অস্থিরতার

ଜନୋଇ ତାରା ତୃପ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରଛେ ମଦ, ମେଯେମାନୁସ, ଘୋଡ଼ଦୌଡ଼, ଚୋରା-କାରବାର ଆର କାଳୋ ଟାକା ଜମାନୋର ମଧ୍ୟେ । ଏ ମାଲଙ୍ଘ ମେଯେଟିର ଦିକେଇ ତାକିଯେ ଦେଖୁନ ନା, ସ୍ଵାମୀ ଥାକତେଓ ସେ ଆର ଏକଜନେର ରକ୍ଷିତା ହେଯେଛି । କିନ୍ତୁ ହତଭାଗିନୀ ଜାନତ ନା, ଲାଲସା ଲାଲସାକେଇ ବାଡ଼ିଯେ ତୋଳେ, ଓର ମଧ୍ୟେ ତୃପ୍ତି ନେଇ, ଆଛେ କେବଳ ଏକଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନ୍ତିରତା । ମେହି ଅନ୍ତିରତାର ବିଷଇ ଆଜ ଆନଛେ ହତ୍ୟା ଧର୍ଷଣ ଚୋରା-କାରବାର ଆର କାଳୋ ଟାକାର ନେଶା । ଆଛା, ରାତ ଅନେକ ହଲୋ, ଏବାର ଉଠି ଭାଦୁଡ଼ିମଶାଇ—କିରୀଟି ଚେୟାର ଛେଡେ ଉଠେ ଦାଁଡାଳ ।

ଲେକ ରୋଡେ ଦୀପ୍ତନେର ଫ୍ଲ୍ୟାଟେ ତାର ଶୋବାର ସରେ ମୁଖୋମୁଖୀ ବସେ ଛିଲ ଦୀପ୍ତନ ଆର ଡଲି ଦନ୍ତ ।

ତାରା ଜାନତ ନା ଯେ ତାରା ଯେ ସବ କଥା ବଲଛେ, ସବ କିଛୁ ଏକଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଇକ୍ରୋଫୋନେର ସାହାଯ୍ୟେ ଟେପ ହରେ ଯାଚେ ।

କିରୀଟିର ପରାମର୍ଶେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଡି.ସି. ଡି.ଡି. ଚଟ୍ଟରାଜ କରେଛିଲେନ ଦୀପ୍ତନେର ଗୃହଭୂତ୍ୟ ବାମାପଦକେ ହାତ କରେ । ଦୀପ୍ତନେର ଗୃହଭୂତ୍ୟ ବାମାପଦକେ ପୁଲିସେର ହାତ କରତେ କଟ୍ ହେଯନି ।

ବାମାପଦ ବଂସରଥାନେକ ହଲ ଦୀପ୍ତନେର କାହେ କାଜ କରଛେ ।

ବୟାସ ଅଞ୍ଚ, ବଚର ବତ୍ରିଶ-ତେତ୍ରିଶ ହବେ । କାଳୋ ମତନ ରୋଗା ଚେହାରା, କିନ୍ତୁ ବୋବା ଯାଯ ବେଶ ଚାଲାକଚତୁର ? ସୁଶୀଳ ଚତ୍ରବତୀର କଥାଯ ସେଟା ବୁଝିତେ ପେରେଇ କିରୀଟି ବାମାପଦକେ ପୁଲିସେର ଦଲେ ଟାନିତେ ପେରେଛିଲ ।

ବ୍ୟାସିଲାର ମାନୁସ ଦୀପ୍ତନ, ବାମାପଦ ଛିଲ ତାର ଏକାଧାରେ କୁକ ଏବଂ ସାର୍ଭେନ୍ଟ, ଆବାର କେୟାରଟେକାରେ ଓ ବଟେ । ବାମାପଦକେ ପେଯେ ଦୀପ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଛିଲ ।

ବାମାପଦକେ ଆଲାଦା ଭାବେ ଜେରା କରେ ସୁଶୀଳ ଚତ୍ରବତୀ ଥାନାଯ ନିଯେ ଏସେ ଅନେକ କଥାଇ ଦୀପ୍ତନ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନିତେ ପେରେଛିଲେନ ।

ଡଲି ଦନ୍ତ ଯେ ଇଦାନୀଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ରାତ୍ରେଇ ଦୀପ୍ତନେର ଫ୍ଲ୍ୟାଟେ ଆସେ, ତାରପର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଥାନେ କାଟିଯେ ଯାଯ, ମେ କଥା ବାମାପଦର କାହ ଥେବେଇ ସୁଶୀଳ ଚତ୍ରବତୀ ପ୍ରଥମ ଜାନିତେ ପେରେଛିଲେନ । ଏବଂ ବାମାପଦର କାହ ଥେବେଇ ଆରୋ ଶୁନେଛିଲେନ ମାଲଙ୍ଘ ଦେବୀ ଆଗେ ପ୍ରାୟଇ ଆସତ ଦୀପ୍ତନେର ଫ୍ଲ୍ୟାଟେ, ତବେ ଇଦାନୀଂ କେନ ଯେନ ମେ ବଡ ଏକଟା ଆସତ ନା ।

ତାରପର ଏକଦିନ ସୁଶୀଳ ଚତ୍ରବତୀ ଦୀପ୍ତନ ଭୋମିକେର ଅନୁପଞ୍ଚିତିତେ ତାର ଫ୍ଲ୍ୟାଟେ ଗିଯେ ହଜିର ହେଯେଛିଲେନ ।

ସୁଶୀଳ ବଲେଛିଲେନ, ଶୋନ ବାମାପଦ, ପୁଲିସକେ ଯଦି ତୁମି ସାହାଯ୍ୟ ନା କର ପୁଲିସ ତୋମାକେ ଗ୍ରେହାର କରେ ଚାଲାନ ଦେବେ । ପୁଲିସ ସଂବାଦ ପେଯେଛେ ତୋମାର ବାବୁର ସଙ୍ଗେ ତୁମି ଚୋରାକାରବାର କର ।

—ଦୋହାଇ ଛଜୁର, ବିଶ୍ୱାସ କରନ, ଆମି କିଛୁଇ ଜାନି ନା—

—ଜାନି ନା ବଲଲେଇ ତୋ ଆର ତୋମାକେ ପୁଲିସ ଛେଡେ କଥା ବଲବେ ନା ବାମାପଦ !

ବାମାପଦ ହାତମାଟ କରେ କେଂଦେ ଉଠେଛିଲ । ବଲେଛିଲ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ ଛଜୁର, ଆମି କିଛୁଇ ଜାନି ନା ।

—ଠିକ ଆଛେ, ତୁମି ପୁଲିସକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କର—ତବେ ଆମି ତୋମାକେ ବାଁଚାବ—

—ବଲୁନ ଛଜୁର କି କରତେ ହବେ—ଆମି ସବ କିଛୁ କରବ ଆପନାର ଛକୁମମତ ।

—বেশ, তাহলে আগে কয়েকটা কথার জবাব দাও আমার।

—বলুন ছজুর।

—তোমার বাবুর ঘরে একটি মেয়ে আসত?

—কার কথা বলছেন ছজুর, সেই যে সিনেমায় নামে?

—না, সে নয়, আর একজন, মালধি তার নাম—

—মালা দিদিমণি? কিন্তু তিনি তো অনেকদিন আর এখানে আসেন না।

—আসবেন কি করে, তিনি কি আর বেঁচে আছেন, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

—খুন! কি বলছেন ছজুর?

—হ্যাঁ, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

—ছজুর, আপনারা কি আমার বাবুকে সন্দেহ করছেন? আমি হলফ করে বলতে পারি ছজুর, আমার বাবু ঐ দিদিমণিকে খুন করেননি।

—কি করে বুঝলো যে তোমার বাবু—

—কি বলছেন ছজুর, ঐ দিদিমণিকে আমার বাবু খুব ভালবাসতেন। আর দিদিমণিও বাবুকে—

—জানি বামাপদ, সেইজন্যই তো আসল লোককে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর আমাদের ধারণা সেই লোকটা তোমার বাবুর কাছে আসা-যাওয়া করে। হ্যাঁ, তাকে আমরা ধরতে চাই, আর তাতে তোমার সাহায্য চাই আমরা।

—নিশ্চয় ছজুর আমি আপনাদের সাহায্য করব, আমাকে কি করতে হবে বলুন।

—বেশী কিছু না, তোমার বাবুর বসবার আর শোবার ঘর আমরা একটু দেখব, যদি সে লোকটার কোন হন্দিস পাই!

—বেশ তো বাবু, দেখুন।

—হ্যাঁ দেখছি, কিন্তু আমি একা একা দেখব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না।

—ঠিক আছে, আমি দাঁড়াচ্ছি।

সুশীল চক্রবর্তী ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে একটা ভারী সোফার নীচে মাইক্রোফোন আর ছোট টেপ রেকর্ডারটা ফিট করে মিনিট কুড়ি বাদে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এলেন।

—দেখলেন ছজুর?

—হ্যাঁ, পাঁচ-সাতদিন বাদে আবার আসব, তুমি কিন্তু তোমার বাবুকে একেবারেই বলবে না যে আমি এখানে এসেছিলাম। তোমার বাবু জানতে পারলে যদি বেফাস কথাটা বলে ফেলেন তাহলে সে সাবধান হয়ে যাবে, বুঝেছ?

—আজ্জে হ্যাঁ।

সুশীল ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে এসেছিলেন।

॥ চোদ্দ ॥

দীপ্তেন ভৌমিক বলছিল, আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি ডলি। ইউরোপ—

—আমাকে সঙ্গে নেবে দীপু?

—তোমাকে! না বাবা, ওসবের মধ্যে আমি আর নেই, শেষটায় জীবন দন্ত আমার নামে কেস ঠুকে দিক আর কি। একে সুরজিৎ ঘোষালের ঝামেলায় নাস্তানাবুদ হচ্ছি—

—কেন, পুলিস তোমাকে মালঞ্চ-হত্যার বাপারে খুব নাস্তানাবুদ করছে বুঝি?

—আর বল কেন—

—তুমি তো আমার কথা শোননি। কতবার বলেছি ওর সঙ্গে মিশো না অত, তা তুমি রোজই ওখানে যেতে—

—শুধু আমি কেন, তুমি যেতে না? ডাঃ সমীর রায় যেতেন না?

—তা তো সকলেই যেতাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে মালঞ্চর ঘনিষ্ঠতা ছিল—।

—বাজে বকো না। একটা ক্যারেন্টারলেস উওম্যান—

—তার জন্মেই তো তুমি হেদিয়ে মরতে দীপ্তেন।

—She was a fool! সে ভাবত আমি বুঝি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি, কিন্তু মোটেই তা নয়, আমি তাকে ঘৃণা করতাম।

—বাজে কথা বলো না। আমি জানি দীপ্তেন।

—কি জানো?

—সেরাত্রে দু-দুবার গিয়েছিলে তুমি মালঞ্চর ঘরে—

—তুমি জানো?

—আমি জানি। মনে আছে, সেরাত্রে আমাকে নিয়ে তোমার দি রিট্রিটে ডিনার খাবার কথা ছিল, অথচ রাত সোয়া এগারোটা পর্যস্ত যখন তুমি এলে না—

—তুমি বিশ্বাস কর—আমি একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়েছিলাম।

—তাও জানি বৈকি, আর সেই বিশেষ কাজে মালঞ্চর বাড়িতেই যে আটকা পড়েছ তাই ভেবেই তো আমি মালঞ্চর বাড়ি যাই—

—তুমি—তুমি মালঞ্চর বাড়িতে গিয়েছিলে ডলি!

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। রাত তখন প্রায় পৌনে বারোটা হবে। তুমি আমায় দেখনি, আমি যখন পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে বাথরুমের মধ্যে দিয়ে মালঞ্চর ঘরে গিয়ে চুকি, তখন she was dead!

—কি বলছ তুমি ডলি!

—হ্যাঁ, তার গলায় রুমালের ফাঁস লাগানো ছিল, and she was dead, আর যে চেয়ারটায় সে বসেছিল তারই সামনে, অল্প দূরে মালঞ্চর শয়ার ওপরে তোমার এই সিগারেট কেসটা আমি পাই। দেখ, চিনতে পারছ এই নাম এনগ্রেভ করা সোনার সিগারেট কেসটা? এটা বছর কয়েক আগে আমিই তোমার জন্মদিনে তোমাকে প্রেজেন্ট করেছিলাম। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম দীপ্তেন—

—কি—কি তুমি বুঝতে পেরেছিলে ?

—তুমি কিছুক্ষণ আগেও সেখানে ছিলে। রাত সাড়ে দশটায় তুমি আমাকে তোমার এই ঘর থেকে ফোন করেছিলে আধ ঘণ্টার মধ্যে তুমি ক্লাবে যাই, আমি যেন সেখানেই চলে যাই। আমি চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার আগে রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ একবার তোমার বাড়িতে ফোন করে আমি তোমার চাকর বামাপদর কাছ থেকে জেনেছিলাম যে তুমি হিন্দুহান রোডে গিয়েছ। বলে গিয়েছ, তুমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবে।

—কিন্তু ডলি—

—শোন, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। আমি সোয়া এগারোটা পর্যন্ত ক্লাবে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে প্রথমে এখানে আসি, এসে শুনলাম সাড়ে নটা নাগাদ তুমি এসে আবার বের হয়ে গিয়েছ। তোমার এখন থেকে ট্যাক্সিতে দি রিট্রিট মাত্র পনেরো মিনিটের রাস্তা, কাজেই ক্লাবে গেলে তোমার ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল—

—আমার অন্য জায়গায় কাজ ছিল, তাই—

—সে কাজ তোমার মালংঢ়র ওখানেই ছিল। সেই রকম সন্দেহ হওয়ায় আমি গাড়ি নিয়ে সেখানেই যাই। একটু দূরে গাড়িটা পার্ক করে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে মালংঢ়র ঘরে যাই। এখন বুঝতে পারছ, তুমি যে সেরাত্রে দু'বার মালংঢ়র ঘরে গিয়েছিলে কি করে আমি বুঝেছিলাম।

—কিন্তু তুমি—তুমি বিশ্বাস কর ডলি, আমি মালংঢ়কে হত্যা করিনি—

—কিন্তু তোমার এই সিগেটে কেস সেখানে কি করে গেল দীপ্তেন। আমি যদি পুলিসকে এটা জানিয়ে দিই, তাদের তুমি কি বলে বোঝাবে ?

—শোন, তাহলে সব কথাই তোমাকে বলছি। সেরাত্রে দ্বিতীয়বার বিশেষ একটা কারণে মালংঢ়র ঘরে আমাকে যেতে হয়। সেরাত্রে সাড়ে দশটা নাগাদ আমার ফ্ল্যাটে তার আসার কথা ছিল, কিন্তু সোয়া এগারোটা নাগাদও যখন সে এলো না, তখন আমি দ্বিতীয়বার তার ওখানে যাই—

—So you did ! তুমি দ্বিতীয়বার ওখানে গিয়েছিলে, স্বীকার করছ দীপ্তেন ?

—হঁয় গিয়েছিলাম, but she was dead at that time, বিশ্বাস কর, I found her dead, strangled, রুমাল বাঁধা তার গলায়, ঘটনার আক্ষিকতায় I was so much perturbed যে আমি ধপ করে বিছানাটির ওপরে বসে পড়ি, now what to do ! আর ঠিক সেই সময়ে ঘোরানো সিঁড়িতে আমি কার যেন পদশব্দ পাই, পাছে কেউ এসে আমাকে ঐ সময় ঘরের মধ্যে দেখতে পায় সেই ভয়ে আমি খাটের নীচে ঢুকে পড়ি।

—A nice story—বল—বলে যাও।

—Story ! It's a fact, সত্যি। তুমি ঘরে এলে, মালংঢ়কে মৃত দেখে তুমি অর্ধস্বুট গলায় চেঁচিয়ে উঠলে, তারপরেই বের হয়ে গেলে ঘর থেকে, যে পথে এসেছিলে সেই পথে। আমিও সেই পথে তোমার পিছু পিছু বের হয়ে আসি। তারপর সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে রাত বারোটার দু'চার মিনিট আগে ক্লাবে যাই, তুমি তখন সেখানে বসে ড্রিংক করছিলে। বিশ্বাস কর ডলি, আমি তোমাকে যা বললাম তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। কি

ହଲ, ଉଠଇ କେନ—ଡଲି, ସତିଇ କି ତୁମି ଆମାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରଛ ନା, ଡଲି ଶୋନ—

ଟେପ୍‌ଟା ବାଜିଯେ ଶୁଣିଲେନ ମିଃ ଚଟ୍ଟରାଜ, କିରୀଟୀ ଓ ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବତୀ—ଲାଲବାଜାରେ
ମିଃ ଚଟ୍ଟରାଜେର ଅଫିସ କାମରାୟ ।

—ଶୁଣିଲେନ ତୋ ସବ ମିଃ ଚଟ୍ଟରାଜ, କିରୀଟୀ ବଲଲ, ଏ ଥେକେ ଅନ୍ତରେ ଦୁଟୋ ବ୍ୟାପାର
ପ୍ରମାଣିତ ହଛେ—ପ୍ରଥମତ, ମୋଯା ଏଗାରୋଟା ଥେକେ ସାଡ଼େ ଏଗାରୋଟାର ମଧ୍ୟେଇ କୋନ ଏକ
ସମୟ ମାଲକ୍ଷ ଦେବୀକେ ଗଲାଯ ଫାସ ଦିଯେ ହତ୍ୟା କରା ହୁଏ । ଆର ଦ୍ଵିତୀୟତ, ମେରାତ୍ରେ ସାଡ଼େ
ଦଶଟା ଥେକେ ସାଡ଼େ ଏଗାରୋଟା ବା ପୌନେ ବାରୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ୍ତନ ଭୌମିକେର movement
suspicious, ଏ ସମରଟା ଓକେ ଘିରେ ଏକଟା ସନ୍ଦେହେର କୁଯାସା ଜମାଟ ବେଁଧେ ଆଛେ ।

—ଆପଣି କି ମନେ କରେନ ମିଃ ରାୟ, ଚଟ୍ଟରାଜେର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଦୀପ୍ତନ ଭୌମିକ ଡଲି ଦନ୍ତର
କାହେ ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲେଛେ?

—ଶୁଦ୍ଧ ମେ କେନ, ଡଲି ଦନ୍ତର ମିଥ୍ୟା ବଲେ ଥାକତେ ପାରେ । ଯାକ୍ ଗେ ମେ କଥା ଆମାର
ମନେ ହଚ୍ଛେ ଆମି ଯେଣ ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ଆଲୋର ଇଶାରା ଦେଖତେ ପାଞ୍ଚିଛି ଏକଟୁ ।

—କି ରକମ?

—ଦେଖା ଯାଚେ ମେରାତେ ଅକୁହଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲେର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ନାଟକୀୟ
ଭାବେ ପ୍ରହ୍ଲାନ, ତାର ଆଗେ ଦୀପ୍ତନ ଭୌମିକେର ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ପରେ ରାତ୍ରି ମୋଯା
ଏଗାରୋଟା ଥେକେ ସାଡ଼େ ଏଗାରୋଟାର ମଧ୍ୟେ ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେଛିଲ, ଏ ସମୟେଇ
ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେଛିଲ ଆରୋ ଏକଜନେ, ଯେଟା ଆମରା ଶୁନେଛି ଏକଟୁ ଆଗେ ଟେପ ଥେକେ,
ଶ୍ରୀମତୀ ଡଲି ଦନ୍ତର ଏବଂ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ହଚ୍ଛେ ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଦୀପ୍ତନ ଭୌମିକ ଓ ଡଲି
ଦନ୍ତର ଆବିର୍ଭାବ ଘୋରାନୋ ସିଁଡ଼ିର ପଥେ । ଏଥିନ ଆମାଦେର ଦେଖତେ ହବେ ମେ ରାତ୍ରେ ଘୋରାନୋ
ସିଁଡ଼ିପଥେ ଏଇ ତିନଜନ ଛାଡ଼ା ଆର କାର ଏଇ ଘରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେଛିଲ । ଏବଂ ଆମାର ଅନୁମାନ
ଯଦି ମିଥ୍ୟା ନା ହୁଏ ତୋ ଜାନବେନ that is the person we are searching for, ତାକେଇ
ଆମରା ଖୁଜାଇ, ମାଲକ୍ଷ ହତ୍ୟାରହସ୍ୟର ମେଘନାଦ ।

—ଏ ତିନଜନ ଛାଡ଼ା ମେରାତ୍ରେ ଏଇ ଘରେ ଆର କେ ଯେତେ ପାରେ ବଲେ ଆପନାର ମନେ ହୁଏ
ଦାଦା? ହଠାତ୍ ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବତୀ କିରୀଟୀକେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରଲେନ ।

କିରୀଟୀ ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବତୀର ମୁଖେ ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲ, ତୋମାର କୀ ମନେ ହୁଏ ସୁଶୀଳ,
who else—ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲ?

—ନା, ତିନି ଯାନନି । ତୁମି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ତୋମାର ଏଇ ତାଲିକା ଥେକେ ତାକେ ବାଦ ଦିତେ
ପାରୋ! ଦେଖ ସୁଶୀଳ, ସାଧାରଣ କମନ ସେସ ଅନୁଯାୟୀ ଭେବେ ଦେଖ—ସେଟୀ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲେର
ରକ୍ଷିତାର ସର, ଏବଂ ମାଲକ୍ଷ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲେରଇ ରକ୍ଷିତା ଛିଲ । ମେକ୍ଷେତ୍ରେ ନିଜେର ରକ୍ଷିତାକେ
ହତ୍ୟା କରାର ପ୍ରୋଜନ ହଲେ ପ୍ରଥମତ ଏ ରକମ crude ଭାବେ ତିନି ମାଲକ୍ଷକେ ହତ୍ୟା କରନେନ ନା, ଅନ୍ୟତମ
exhibit ହିସାବେ ଯେତି ଆଦାଲତେ ପେଶ କରା ଯେତେ ପାରେ । ତୃତୀୟତ ଏବଂ lastly, ଏଇ
ଧରନେର ଏକଟା କାଜ ସୁରଜିଂ ଘୋଷାଲେର ମତ ଏକଜନକେ ଦିଯେ ସଞ୍ଚବ ହତେ ପାରେ ବଲେ ମନ
ଆମାର ସାଯ ଦେଇ ନା । ନା, ତୁମି ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଭାବୋ—

—ତବେ କି ଏ ଡା: ମେର ରାୟ?

ସୁଶୀଳ ଚକ୍ରବତୀର କଥା ଶେଷ ହଲ ନା, ତାକେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦିଯେଇ କିରୀଟୀ ବଲଲେ, he

is a doctor, মানুষকে হত্যা করবার অনেক উপায় জানা আছে তার, সুতরাং একজনকে ঐ ভাবে গলায় ফাঁস দিয়ে সে মারবে না।

—তবে কি ডলি দন্ত?

—হতে পারে। She had a strong motive also, তার দিক থেকে motive ও provocation দুই-ই ছিল—তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল কিরীটী।—মিঃ চট্টরাজ, আমি চলি; সুশীল তুমি যেমন এগোচিলে এগিয়ে যাও, ব্যাপারটা আদৌ খুব একটা জটিল কিছু নয়—

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আদালত কারোরই জামিন দেয়ানি।

তদন্তসাপেক্ষে সুরজিৎ ঘোষাল ও মানদাকে জেলহাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত এবং পরবর্তী শুনানীর তারিখ পড়েছে আবার দশদিন পরে।

সোমনাথ ভাদুড়ীর চেম্বারে বসে কিরীটীর সঙ্গে সোমনাথ ভাদুড়ীর আলোচনা হচ্ছিল মালঞ্চ হত্যা-মামলা নিয়েই।

সোমনাথ বলছিলেন, রায়মশাই, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, দীপ্তেন ভৌমিক আর ডলি দন্তকে কেন আপনি সুশীল চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করবার পরামর্শ দিচ্ছেন না।

—প্রথমত, ওদের গ্রেপ্তার করলে উপযুক্ত প্রমাণ ও তথ্যাদির অভাবে ওদের আপনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবেন না।

—কিন্তু ঐ টেস্টা—

—ওতে কেবল প্রমাণ করতে পারবেন দুর্ঘটনার দিন রাত্রে আগে ও পরে দীপ্তেন ভৌমিক দু'বার হিন্দুশাহ রোডের বাড়িতে গিয়েছিল আর ডলি দন্ত একবার গিয়েছিল—তার দ্বারা প্রমাণ হবে না তারাই দুজন অথবা দুজনের একজন হত্যাকারী। ওদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে চোরাকারবারী বলে চিহ্নিত করে, এবং তারপর ঐ চোরাকারবারকে কেন্দ্র করে হত্যার ব্যাপারে আপনি আসতে পারবেন বটে, কিন্তু তখনো ঐ একই কথা থেকে যায়, প্রমাণ কই।

—আমার কিন্তু ওদের দুটিকেই সন্দেহ হয়, হত্যারহস্যের সঙ্গে ওরাও লিপ্ত।

—সেটা হতে পারে একমাত্র যদি প্রমাণ করা যায় যে ঐ চোরা-কারবারকে কেন্দ্র করেই ঐ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

—সেটা কি আদালতে প্রমাণ করা যাবে না?

—সবটা আপনার জেবার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু একটা কথা তো আমাদের ভুললে চলবে না ভাদুড়ীমশাই, দীপ্তেন ভৌমিক, ডাঃ সুশীল রায় এবং ডলি দন্ত—কাউকেই এখনও আমরা চোরাকারবারী বলে প্রমাণ করবার মত উপযুক্ত তথ্যাদি পাইনি।

—আচ্ছা রায়মশাই, আপনি সুশাস্ত মল্লিককে একেবারে বাদ দিচ্ছেন কেন?

—না, বাদ দিইনি। বরং বলতে পারেন আমার একটি চোখ সর্বক্ষণ তার ওপরে রয়েছে। যেহেতু তার দিক থেকে হত্যার মোটিভ অত্যন্ত strong ছিল, তেমনি তার দিক থেকে possibility ও যথেষ্ট ছিল, সর্বশেষে ওর একটা strong alibi রয়েছে—হত্যার

দু'দিন আগে থাকতে ভদ্রলোক হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই ছিলেন না, পুনরায় আবির্ভাব হয় তাঁর হত্যার পরদিন সকালে রীতিমত নাটকীয় ভাবে—

—লোকটা এখন কি হান রোডের বাড়িতেই আছে, তাই না রায়মশাই?

মৃদুহেমে কিরীটি বললে, যাবেই বা কোথায়, তার কোন আস্তানা নেই, সংস্থান নেই, দু'মুঠো পেটের ভাতের, নেই কোন ভবিষ্যৎ, completely wrecked!

॥ পনেরো ॥

সোমনাথ ভাদুড়ীর ওখান থেকে ফিরতে বেশ রাতই হয়ে গিয়েছিল কিরীটির, প্রায় পৌনে এগারোটায় ঘবে চুকেই থমকে পড়ে কিরীটি—একটা চেয়ারে বসে ডাঃ সমীর রায়—

—কি বাপার ডাঃ রায়, কতক্ষণ?

—তা প্রায় ঘটা দেড়েক তো হবেই।

—কিন্তু বাড়ির সামনে আপনার গাড়ি তো দেখলাম না—

—না, আমি গাড়ি নিয়ে আসিনি, ট্যাক্সিতে এসেছি—মান কঢ়ে বললেন ডাঃ রায়, আমি আপনার সঙ্গে বিশ্বে কারণে দেখা করতে এসেছি কিরীটিবাবু।

—বলুন—

—যা আমি পুলিসের কাছে বলতে পারিনি তা আপনার কাছে বলব।

—বেশ তো, যা বলবার বলুন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার বা সাহায্য করা সম্ভব হয় নিশ্চয়ই করব।

—মিঃ রায়, আপনি নিশ্চয় বুঝবেন, মালঞ্চর হত্যা-মামলার সঙ্গে আজ যদি আমার নামটা জড়িয়ে পড়ে, তাহলে আমার পক্ষে আর এ শহরে বাস করা সম্ভব হবে না। তারপর একটু থেমে বললেন, আজ সকালে আমার বাড়ি ইনকাম ট্যাক্সির লোকেরা raid করেছে এবং সেটা যে পুলিসেরই নির্দেশে, তাও আমি বুঝতে পেরেছি। সেজন্যে অবশ্য আমি ডরাই না, ইনকাম করে tax হয়তো পুরোপুরি দিইনি, তার জন্যে হয়তো punishment হবে, তা হোক, কিন্তু ঐ scandal-এর সঙ্গে আমার নাম জড়ালে my future will be doomed! তাই ভেবে দেখলাম, আপনাকে সব কথা খুলে বলাই ভাল।

—তা বলুন না—

—মালঞ্চর সঙ্গে পেসেন্ট আর ডাক্তারের সম্পর্ক ছাড়াও অন্য সম্পর্ক ছিল আমার—বললে শুরু করলেন সমীর রায়, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে সম্পর্কটা কোন ভালবাসা বা প্রেমের সম্পর্ক নয়, she had a tremendous sex, প্রচণ্ড একটা যৌন আবেদন ছিল মালঞ্চর আর বলতে সংকোচ করব না, তাতেই আমি trapped হয়েছিলাম। প্রায়ই রাত বারেটার পর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে হিন্দুস্থান রোডে ওর বাড়িতে যেতাম, তারপর পিছনের লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যেতাম। বুঝতে পারতাম কি জবন্য নেশায় আমি জড়িয়ে পড়েছি, but I could'nt get out of it! হত্যার রাত্রে ঝোঁক থেকে বের হয়ে সোজা আমি হিন্দুস্থান রোডে মালঞ্চর বাড়িতে যাই—

—রাত তখন ক'টা হবে ডাঃ রায়?

—ঠিক মনে নেই, তবে round-about সাড়ে বারোটা পোনে একটা হবে, যে পথে আমি রোজ যাই সেই পথেই ওপরে গেলাম—

—বাথরুমের দরজাটা খোলাই পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—বাথরুম অন্ধকার ছিল, চেনা পথ, ঘরে পা দিয়ে দেখি ঘরও অন্ধকার—

—পরের দিন সকালে দরজা ভেঙে কিন্তু সুমীল চক্রবর্তী ঘরের আলোটা জুলছিল দেখতে পায়—

—আমি ঘরের আলোটা জুলাই এবং জুলাতেই দেখলাম মালঞ্চ চেয়ারে বসে আছে আর তার গলায় ফাঁস, বুরাতে আমার কষ্ট হয়নি she was dead! বুরাতেই পারছেন আমার তখনকার মনের অবস্থা, কি ভাবে যে ঘর থেকে বের হয়ে বাথরুমে ঢুকেছি জানি না—তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটতে ছুটতে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখি সদরে একজন দাঁড়িয়ে আছে—

—কে সে?

—জানি না, ভাল করে তাকাইনি, তবে সে যে আমায় ছুটে গাড়িতে গিয়ে উঠতে দেখেছিল সেটা ঠিকই—

—দরজার কাছে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে পুরুষ না নারী?

—পুরুষ।

মনে হল কিরীটী যেন একটু অন্যান্য হয়ে কি বুঝি ভাবছে—

—রাত সোয়া বারোটার সময়ও বাথরুমের দরজাটা তাহলে খোলাই ছিল—পরে someone সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল, আশচর্য, কথাটা আমার মাথায় আগে আসেনি কেন, —কিরীটী কথাগুলো যেন কতকটা আঘাতভাবে বলে।

—কিছু বলছেন, কিরীটীবাবু?

—একটা চাবির কথা ভাবছি।

—চাবি!

—হ্যাঁ, মালঞ্চের শয়নকক্ষে ইয়েল লকের ডুপলিকেট চাবিটার কথা ভাবছি ডাঃ রায়। সেটাও ছিল সুরজিৎ ঘোষালের কাছে?

—হ্যাঁ, তার কাছেই থাকত সেটা।

—ঠিক আছে ডাঃ রায়, আপনি এখন বাড়ি যান।

পরের দিনই কিরীটী চট্টরাজকে সঙ্গে নিয়ে হাজতে গেল সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা গেল সুরজিৎ ঘোষাল একটা খাটিয়ার ওপর বসে আছেন। প্রচণ্ড গরম ঘরটার মধ্যে, ঘামছিলেন সুরজিৎ ঘোষাল। এই কয়দিনেই তাঁর চেহারার যেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

—মিঃ ঘোষাল—

কিরীটীর ডাকে সুরজিৎ ঘোষাল বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন।

—হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির সদরের আর মালঝর ঘরের ইয়েল লকের ডুপলিকেট চাবি দুটো আপনার কাছেই থাকত না?

—হ্যাঁ। কিন্তু যে চাবির রিংয়ে ঐ চাবি দুটো ছিল, সেটা ঐ ঘটনার দিন সাতেক আগে হারিয়ে যায়—

—কি করে হারাল?

—জানি না। আমার মনে হয়, যাতে আমি যথন-তখন সেখানে না যেতে পারি, surprise visit না দিতে পারি সেইজন্যে মালঝই রিংটা সরিয়েছিল।

—কেন আপনি surprise visit দিতেন?

—আগে কখনো দিতাম না, দেবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু মানদার কাছ থেকে যখন জানতে পারলাম আমি চলে আসার পর প্রায়ই রাতে মালঝর ঘরে দীপ্তেন ভৌমিক আসে, তখন আমি দু'চারবার surprise visit দিয়েছি।

—আচ্ছা, আপনি কোনদিন কি দীপ্তেন ভৌমিককে মালঝর ঘরে পেয়েছেন?

—না, কিন্তু আমি দু'বারে অস্তত টের পেয়েছি, তার ঘরে লোক ছিল—কথাবার্তা শুনেছি, ঘরে আলো জুলতে দেখেছি। কিন্তু নিঃশব্দে তালা খুলে ঘরে চুকে দেখেছি ঘরের আলো নেভানো—মালঝও ঘুরোচ্ছ।

কিরীটী মৃদু হেসে বলল, চোরের ওপর বাটপাড়ি—

—আপনি কি বলতে চান, তাহলে—

—হ্যাঁ, আপনার আসার আগেই তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যেত যে আপনি আসছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের লোক বাথরুম-পথে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে স্টকে পড়ত, আপনি তাই কোনদিনই পাখিকে খাঁচার মধ্যে দেখেননি।

—কি বলছেন মিঃ রায়!

—If I am not wrong মিঃ ঘোষাল, ঐ মানদাই দু'পক্ষের কাছ থেকে টাকা খেয়ে দু'পক্ষের দৌত্যগিরি করত—

—মানদা! মানদার এই কাজ!

—আচ্ছা মিস্টার ঘোষাল, আপনিই কি ডাঃ সমীর রায়কে ঐ বাড়িতে প্রথম নিয়ে যান?

—হ্যাঁ, ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। মাঝে মধ্যে মালঝর পেটে প্রচণ্ড কলিক হত, তাই আমি একবার ডাঃ রায়কে ডেকে আনি, ডাঃ রায় তাকে তখন পেথিডিন ইনজেকশন দেন, ক্রমশ সেই পেথিডিনে মালঝ অ্যাডিস্টেড হয়ে যায়—

—আপনি তাহলে পেথিডিনের ব্যাপারটা জানতেন?

—জানতাম। কিন্তু বুবাতে পারিনি কি করে মালঝ পেথিডিন জোগাড় করত—

—শুনলে আপনি হয়তো অবাক হবেন মিঃ ঘোষাল, কিরীটী বলল, আমার ধারণা আপনার ঐ বন্ধু ডাঙ্কার সমীর রায়ই তাকে পেথিডিন সাপ্লাই করতেন।

—না না, মিঃ রায়, এ আপনি কি বলছেন! অ্যাবসার্ড! আমি জানি ডাঃ রায় ওকে পেথিডিনের অভ্যাস ছাড়াবার জন্যে সর্বদাই চেষ্টা করতেন, ওকে বকাবকা করতেন—

—আবার গোপনে তিনিই পেথিডিন জোগাড় করে দিতেন মালঝকে। কারণ ডাঃ সমীর রায়ের মালঝকে প্রয়োজন ছিল।

—কি বলছেন আপনি!

—ঠিকই বলছি, যদিও আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। কিন্তু এ পেথিডিন রহস্যের চাইতেও বড় রহস্য আপনার অঙ্গাতে এ হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই দানা বেঁধে উঠেছিল।

—বড় রহস্য!

—হ্যাঁ, চোরাকারবার—হ্যাসিসের চোরাকারবার।

—না না, তা কখনই হতে পারে না কিরীটীবাবু।

—এ হিন্দুস্থান রোডের নীচের একটা ঘর সর্বদা তালা দেওয়া থাকত, আপনার নজরে পড়েনি? কিরীটীর প্রশ্ন।

—গড়েছ। কিন্তু আমি ভেবেছি এমনিতেই বুঝি তালা দেওয়া থাকে ঘরটায়।

—সেই ঘরেই একটা দেওয়াল-আলমারির মধ্যে থাকত চোরাই মাল। ঐখানেই এসে জমা হত, তারপর খোন থেকেই পাচার হত তার উদ্দিষ্ট পথে।

—মালঞ্চ ত্রিসর করত?

—একা যেয়েমানুষ কি তা করতে পারে, না তাই সন্তুর! এই দলে আরো কে কে আছে জানি না, তবে তাদের মধ্যে দুজনকে আমরা জানতে পেরেছি। তাঁরা হলেন দীপ্তেন ভৌমিক আর শ্রীমতী ডলি দল। আর বাদবাকী যারা আছে এখনো তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

—তাই—তাই ইদানীং টাকার কথা কখনো বলত না মালঞ্চ, আমি ভেবেছি দীপ্তেন ভৌমিক ওকে টাকা দিচ্ছে দুঃহাতে। উঃ, এখন মনে হচ্ছে আমিই যদি ওকে খুন করতে পারতাম—

জেলহাজাত থেকে একসময় বের হয়ে এলেন কিরীটী ও চট্টরাজের গাড়িতেই লালবাজারে যেতে যেতে কিরীটী বললে, বতমান হত্যা-মামলার একটা জটিল পর্যন্তের সমাধান আজ পেয়ে গিয়েছি মিঃ চট্টরাজ।

—কি করে সমাধান হল? চট্টরাজ শুধালেন।

—ঐ ডুপলিকেট চাবি।

—যেটা হারিয়েছেন ঘোষাল?

—হারায়নি।

—তবে?

—সেটা চুরি গিয়েছে।

—কে চুরি করেছে? মালঞ্চ?

—হ্যাঁ। এক ফাঁকে সুরজিং ঘোষালের পকেট থেকে মালঞ্চই সরিয়ে ফেলেছিল চাবিটা। কিন্তু বেচারী ভাবতেও পারেনি যে এ চাবিই শেষ পর্যন্ত হবে তার মৃত্যুবাণ।

—তাহলে কি মিঃ রায়—

—হ্যাঁ মিঃ চট্টরাজ, এ চাবির সাহায্যেই হত্যাকারী সেরাত্তে কোন এক সময়ে মালঞ্চের ঘরে চুকে তার কাজ শেষ করে বের হয়ে এসেছিল সকলের অলঙ্ক্ষে—যখন সন্তুর সে পেথিডিনের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল—

—সত্যি বলছেন!

—হ্যাঁ। আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো সাড়ে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটার মধ্যে কোন এক সময় ব্যাপারটা ঘটেছিল। মালঞ্চ নিশ্চিন্ত ছিল সুরজিং ঘোষালের পকেট থেকে চাবিটা হাতিয়ে নিয়ে, কিন্তু সে বুঝতে পারেনি যে, যে নাগরের হাতে সে চাবিটা তুলে দিয়েছিল সে সেই চাবির সাহায্যেই তার ঘরে চুকে তার গলায় মৃত্যু ফাঁস দেবে। চলুন মিঃ চট্টরাজ, একবার হিন্দুস্থান রোডের বাড়িটা হয়ে যাওয়া যাক। সুশাস্ত্র মল্লিককে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

চট্টরাজকে নিয়ে কিরীটী যখন হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে পৌঁছাল তখন সুশাস্ত্র মল্লিক তার ঘরেই খাটের উপর বসে একা একা নিশ্চিন্ত মনে সিগেট টানছিল। ওদের দুজনকে ঘরে চুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—বসুন, বসুন সুশাস্ত্রবাবু, আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস নিতে এসেছি।

—জিনিস! কি জিনিস?

—এই বাড়ির সদরের আর মালঞ্চের ঘরের দরজার ডুপলিকেট চাবি দুটো?

—ডুপলিকেট চাবি?

—হ্যাঁ, যেটা মালঞ্চ হাতিয়েছিল সুরজিং ঘোষালের পকেট থেকে, তারপর চোরের ওপর বাটপাড়ি করে তার কাছ থেকে আপনি যেটা হাতিয়েছিলেন?

—কি বলছেন কিরীটীবাবু! আমি সে চাবির সম্পর্কে কিছুই জানি না।

—অঙ্গীকার করে কোন লাভ নেই সুশাস্ত্রবাবু, আমি জানি সে চাবি আপনিই হাতিয়েছিলেন কোন এক সময়—

—বিশ্বাস করুন, সত্যিই সে চাবি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল—চলুন মিঃ চট্টরাজ। তারপর একটু এগিয়েই কিরীটী ফিরে দাঁড়াল, হ্যাঁ একটা কথা সুশাস্ত্রবাবু, মিঃ চট্টরাজ কিন্তু জানতে পেরেছেন মালঞ্চের হত্যাকারী কে।

—কে? কে মালঞ্চের হত্যা করেছে?

—আপনি তো জানেন।

—আমি জানি!

—হ্যাঁ, আপনি জানেন সুশাস্ত্রবাবু, কিরীটীর গলার স্বর গভীর। আপনি বলতে চান সেরাত্রে আপনি তাকে দেখেননি?

—আমি দেখব কি করে, আমি তো সে-সময় এ বাড়ির ত্রিসীমানাতেও ছিলাম না।

—You are telling lie—আপনি মিথ্যা কথা বলছেন সুশাস্ত্রবাবু, আপনি ঐ সময়টা এই বাড়িরই আশেপাশে বা বাড়ির মধ্যেই কোথাও ছিলেন, নচেৎ আপনি জানলেন কি করে যে মালঞ্চকে হত্যা করা হয়েছে? সে আর সাড়া দেবে না?

—বিশ্বাস করুন, আমি তাকে হত্যা করিনি।

—তবে সেরাত্রে আপনি কেন ঘোরানো সিডিপথে চোরের মত মালঞ্চের ঘরে চুকেছিলেন?

—হঁয়া আমি গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু she was dead at that time—she was dead.

—সেরাত্রে চোরের মত কেন এসেছিলেন এ বাড়িতে?

—সেদিন তাকে আমি দুপুরে ফোন করেছিলাম, বলেছিলাম তার প্রস্তাবেই আমি রাজি, আপাতত দশ হাজার টাকা পেলে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত আছি। সে বলেছিল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ এসে টাকাটা নিয়ে যেতে। আর ওই পিছনের সিডি দিয়েই ওপরের ঘরে গিয়ে সে টাকা নিয়ে আসতে বলেছিল আমায়। কিন্তু ঘরে চুকে যখন দেখলাম সে মৃত, তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে পালাই—

—হঁ। তাহলে আপনিও সেরাত্রে তাকে ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখেছিলেন?

—হঁয়া।

—মিঃ চট্টরাজ, ওঁকে আ্যারেস্ট করুন, কিরীটী গন্তীর গলায় বললে।

—বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি বলছি, মলিকে আমি খুন করিনি—খুন করিনি। কান্নায় ভেঙে পড়ল সুশাস্ত মল্লিক।

॥ ঘোলো ॥

পরের দিন সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হল—মালঞ্চ মলিকের স্বামী সুশাস্ত মল্লিক স্বীহত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার।—

বেলা তখন সকাল সাড়ে নটা। লালবাজারে মিঃ চট্টরাজের অফিস ঘরে এসে চুকল কিরীটী।

—আসুন মিঃ রায়, চট্টরাজ বললেন, দেখেছেন বোধ হয় আজ নিউজপেপারে নিউজটা ফ্ল্যাশ করা হয়েছে?

—দেখেছি। কিন্তু আপনাকে যেমন বলেছিলাম, ফোন করেছিলেন? কিরীটী শুধাল।

—হঁয়া, এখুনি হয়তো আসবেন ওঁরা—

আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রথমে ডাঃ সমীর রায় এবং তাঁর পৌছবার মিনিট দশেক পরেই দীপ্তেন ভৌমিক এসে পড়লেন।

কিরীটীই বললে, মিঃ ভৌমিক, ডাঃ রায়, খুব অবাক হচ্ছেন বোধ হয় আপনারা, কেন এ সময় ফোনে আপনাদের জরুরী তলব দিয়ে মিঃ চট্টরাজ এখানে ডেকে আনিয়েছেন, তাই না?

দুজনেই মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন।

—শুনুন, উনি মালঞ্চের হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পেরেছেন—

দুজনেই একসঙ্গে অর্ধসুট প্রশ্ন করলেন,—কে—কে?

—যখন আপনাদের ডেকে আনা হয়েছে জানতে পারবেন বৈকি। একটা ধৈর্য ধরুন। এরপর গন্তীর কঠে কিরীটী বলল, ডাঃ রায়, সেরাত্রে চিনতে পারেননি আপনি কাকে হিন্দুহান রোডের সদরে দেখেছিলেন?

—না।

—যার কাছে এ বাড়ির সদর দরজা আর দোতলায় মালঝর ঘরের ডুপলিকেট চাবি দুটো ছিল তাকেই আপনি দেখেছিলেন।

—ডুপলিকেট চাবি?

—হ্যাঁ, আপনাকে মালঝ দেবী দেননি সে চাবিটা?

—না।

—দীপ্তেনবাবু—আপনাকে?

—না।

—মিথ্যা বলছেন দীপ্তেনবাবু, সুরজিৎ ঘোষালের পকেট থেকে হাতিয়ে মালঝ আপনাকেই দিয়েছিল ডুপলিকেট চাবিটা, যাতে আপনি যে কোন সময়েই এ ঘরে আসতে পারেন।

—বলতেই হবে আপনার মস্তিষ্ক রীতিমত উর্বর—ব্যঙ্গভরা গলায় দীপ্তেন ভৌমিক বললেন।

—দীপ্তেনবাবু, আমি কিরীটী রায় এবং কিরীটী রায় বলতে যে কি এবং কতখানি বোঝায় তা আপনার সন্তুষ্ট জানা নেই বলেই এখনো আপনি পালাবার পথ খুঁজছেন। আপনি জানেন না যে আপনার ফাঁদে আপনি নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন—

—ফাঁদে!

—হ্যাঁ! পরে কোন এক সময় এসে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এ চাবির সাহায্যেই আবার পরে এক সময় রাত্রে এসে প্রথমে সদর ও পরে মালঝর শোবার ঘর খুলে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন আপনার ফেলে যাওয়া সিগ্রেট কেসটা নেবার জন্য, কিন্তু আপনি ভাবতেও পারেননি ইতিমধ্যে সেটা ডলি দত্ত এসে নিয়ে গিয়েছে। আর সিগ্রেট কেসটা না পেয়েই আপনি ফিরে যাবার সময় বাথরুমের দরজাটা ভিতরে থেকে বন্ধ করে যান, and that was your second thought, একবারও আপনার মনে হল না যে, যে মালঝকে হত্যা করল সে কোন্ পথে বের হয়ে যাবে এবং সে ব্যাপারটা প্রথমেই পুলিসের মনে জাগতে পারে।

চট্টরাজের ঘরের মধ্যে যেন একটা শ্বাসরোধকারী স্তুতা নেমে আসে। দীপ্তেন ভৌমিক স্থিরদৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকেন। ডাঃ সমীর রায়ও স্তুত।

কিরীটীর ঝজু কঠস্বর আবার শোনা গেল, আপনি হত্যাকাণ্ডটা যথেষ্ট কুল ব্রেনেই পরিকল্পনা করেছিলেন and it was pre-planned murder—সুরজিৎ ঘোষালের নাম লেখা একটা রুমাল সেই কারণেই আপনি হাতিয়েছিলেন পূর্বানু, যদিও জানি না কি করে সেটা আপনার হস্তগত হয়েছিল, আশ্চর্য হব না যদি শুনি যে আপনার প্রেয়সীই সেটা আপনার হাতে তুলে দিয়েছিল। সবই প্লান অনুযায়ী হয়েছিল, কিন্তু আপনার second thought অনুযায়ী over-cautious হতে গিয়ে আপনি যদি এই ঘরে ফিরে এসে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে না যেতেন তাহলে এ চাবির প্রশংস্তা আমার মাথায় হয়তো এত সহজে উঁকি দিত না, আর আপনিও এই একটিমাত্র ভুলের জন্যে এত সহজে exposed হয়ে যেতেন না।

—ঐ একটি মাত্র ভুলই আপনার গলায় ফাঁস দিয়েছে দীপ্তেনবাবু—উঁহ, দরজার দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না, ওখানে তিন-চারজন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ চট্টরাজ প্রস্তুত হয়েই আপনাকে আজ এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন, আর আপনার মনে নিশ্চয়তা আনবার জন্মেই আজকের সমস্ত কাগজে সুশাস্ত মাল্লিকের গ্রেপ্তারের সংবাদটা ফ্ল্যাশ করা হয়েছিল। আপনি হয়তো ভাববেন দীপ্তেনবাবু, মালঞ্চকে আপনিই যে হত্যা করেছেন, পুলিসের হাতে তার কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু মালঞ্চ-হত্যার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পুলিসের হাতে না থাকলেও, হ্যাসিস সিগেটের চেরাকারবারের সঙ্গে যে আপনি লিপ্ত ছিলেন তার অনেক প্রমাণই পুলিসের হাতে এসেছে। আদলতে যখন আপনি সোমনাথ ভাদুড়ীর সওয়ালের সামনে দাঁড়াবেন তখন দেখবেন মুক্তির কোন রাস্তাই খোলা নেই—

থামল কিরীটী, তারপর চট্টরাজের দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ চট্টরাজ, আপনার কাজ এখন আপনিই করুন।

মিঃ চট্টরাজ বললেন, you are under arrest মিঃ ভৌমিক।

দীপ্তেন ভৌমিক নিঃশব্দে চট্টরাজের দিকে তাকালেন।

BARTIAGAR.NET

রক্তের দাগ

PATHIAGAR.NET

॥ এক ॥

ফিরতে ফিরতে রোজই রাত হয়ে যায়।

কখনো সাড়ে এগারোটা—কখনো রাত বারোটাও বেজে যায়। আজও রাত হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল।

হাতঘড়ির দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিল সুদীপ। বাড়ির প্রায় কাছাকাছি যখন এসেছে—সেই শব্দটা কানে এলো সুদীপের। একটা জুতো পায়ে হাঁটার শব্দ। শব্দটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল সুদীপ আজও।

আশচর্য! সঙ্গে সঙ্গে পিছনের শব্দটাও থেমে গেল। আর কারো হেঁটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

সুদীপ জানে আবার সে হাঁটতে আরস্ত করলেই পেছনে সেই শব্দটা শোনা যাবে। প্রথম প্রথম অতটা ভাবায়নি সুদীপকে; ভেবেছে কেউ তার পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে।

দু'দিন ধরে ওই একই শব্দ শুনে শুনে তৃতীয় দিন থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিল কে তার পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে অত রাত্রে। কিন্তু কাউকে সে দেখতে পায়নি। যতদূর দৃষ্টি চলে একেবারে ফাঁকা রাস্তাটা।

ছোট শহর। কলকাতা থেকে বেশী দূর নয়। গোটা তিনিক স্টেশন মাত্র। বাঁধানো রাস্তাটা সোজা স্টেশন থেকে কিছুদূরে এসে ডাইনে একটা বাঁক থেয়ে সোজা চলে এসেছে তার বাড়ির দিকে। স্টেশন থেকে দেড় মাইলের বেশী হবে না।

আগে রাস্তার দু'পাশে কোন আলোর তেমন ভালো ব্যবস্থা ছিল না। দশ-পনেরো হাত দূরে দূরে মিডিনিসিপ্যালিটির লাইটপোস্ট। তাও বেশীর ভাগ দিন বাল্ব ফিউজ হয়ে যাওয়ায় আলোই জুলত না।

ইদানীং সমবেদ্ধবাবু স্থানীয় এম. এল. এ. হওয়ায় মধ্যে মধ্যে কয়েকটা লাইটপোস্ট বসাবার পর—বেশ আলো থাকে রাস্তাটায়।

পথে যেতে যেতে দু'পাশে কিছু ঘর-বাড়ি ও দোকানপাট আছে—কিন্তু অত রাত্রে কোন বাড়ির আলো জ্বলে না—দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাও একেবারে নির্জন হয়ে যায়। বোধ হয় একমাত্র সুদীপই শেষ ট্রেনের যাত্রী। লোকাল ট্রেন ওই সময় থাকে না—রাত এগারোটায় শেষ লোকাল ট্রেনটা চলে যায়।

পরের জংশন স্টেশনে মেল গাড়িটা থামে—সেই গাড়িতেই ফিরে সুদীপ পিছু হেঁটে আসে জংশন থেকে, নচেৎ অত রাত্রে ফিরবার আর কোনো উপায় নেই। জংশনটা মাইলখানেক দূরে—তাদের স্টেশনের আর জংশনের মাঝামাঝি জায়গাটা।

আজ দিন-দশেক হলো ওই শব্দটা শুনছে সুদীপ।

স্পষ্ট মনে আছে সুদীপের—খুনের মামলায় আদালতে সাক্ষী দেবার পর যেদিন সে ফিরে আসছে, সেইদিনই প্রথম ওই জুতো পায়ের শব্দটা সে শুনতে পেয়েছিল।

তারপর থেকে প্রতি রাত্রেই সে শুনছে ওই জুতো পায়ে চলার শব্দটা।

সুদীপ বোধ হয় অভ্যাসমতই হঠাত থেমে আজও পিছনপানে ফিরে তাকাল একবার। না, কেউ নেই—যতদূর দৃষ্টি চলে, রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা—জনপ্রাণী নেই।

তবু আজ দাঁড়িয়ে থাকে সুদীপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে। আজ আবার রাস্তার কয়েকটা আলো জুলছে না।

কেমন একটা আধো আধো ছায়া থমথম করছে। হঠাত সেই আধো আলো আধো ছায়ার মধ্যে দুটো যেন নীল আগুনের মারবেল ভেসে উঠলো।

নীল আগুনের মারবেল দুটো এগিয়ে আসছে তার দিকে।

এমনিতে ভীতু নয় সুদীপ। কিন্তু ওই মুহূর্তে হঠাত যেন তার সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। হঠাত আবার নীল আগুনের মারবেল দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। দপ্তরে যেন নীল আগুনের মারবেল দুটো নিভে গেল।

শীতের রাত। তবু সুদীপের কপালে বিন্দু ঘাস জমে উঠেছে, কোথাও কিছু নেই—যতদূর দৃষ্টি চলে একটা আলো-ছায়ার থমথমানি।

নিশ্চয়ই ভুল দেখছে সুদীপ। ঢোকের ভুল। সুদীপ আবার চলতে শুরু করে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ। হেঁটে হেঁটে কেউ যেন আসছে তার পিছনে, ঠিক তার পিছনে।

আসুক।

সুদীপ আর থামবে না। পিছন ফিরে তাকাবে না। সুদীপ চলার গতি বাড়িয়ে দিল। বাড়ির সামনাসামনি পৌঁছে দেখে জানঙ্গা-পথে ঘরে আলোর ইশারা। ঘরে আলো জুলছে—রমা জেগে আছে তার জন্য আজও।

প্রথম প্রথম রমা বলতো, ইদানীং এত রাত করে ফের কেন? একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পার না আগের মত?

কাজ শেষ হবে—তবে তো আসবো। এখন অনেক বেশী কাজ। সুদীপ বলতো।

কি এমন কাজ তোমার যে রাত দুপুর গড়িয়ে যায়। একা তুমি ছাড়া বোধ হয় কেউ এত রাতে আর এদিকে ফেরে না।

সুদীপ কোন জবাব দেয় না। চুপ করে রমার কথাগুলো শুনে যায়। জামা-কাপড় খুলে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। কনকনে ঠাণ্ডা তোলা ড্রামের জলে ঐ রাত্রে স্নান করে।

কতদিন বলেছে রমা—অভিযোগ তুলেছে সুদীপের অত রাত করে বাড়ি ফেরা নিয়ে। কিন্তু এখন আর বলে না। বোধ হয় অভ্যন্ত হয়ে গিয়েছে রমা ব্যাপারটায়। কিংবা হয়ত বুঝতে পেরেছে রমা—রাত করে বাড়ি ফেরার ব্যাপারে সুদীপকে বলে কোন লাভ নেই। সুদীপ তার কথায় কান দেবে না। অথবা রমাই হয়ত সুদীপকে একই কথা বলে বলে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

হন হন করে হেঁটে এসে সুদীপ দরজার সামনে দাঁড়াল। এবং আজ বেল বাজাবার আগেই দরজাটা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে রমা।

রমা কেন কথা বলল না। দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সুদীপ কিন্তু তখনি ভিতরে প্রবেশ করল না। দরজার উপর দাঁড়িয়ে পশ্চাতে যতদূর

দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছু তার চোখে পড়ল না।

শীতের মধ্যরাত্রের রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। কোন জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও চোখের দৃষ্টিতে পড়ে না। তবুও কয়েকটা মুহূর্ত সুনীপ সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাতে রমার কঠস্থরে চমকে ফিরে তাকাল।

রমা যেন কখন এসে আবার তার পাশে দাঁড়িয়েছে। বললে, কি দেখছো?

না। কই, কিছু না তো!

তবে অমন করে দেখছিলে কি?

চল। ভিতরে চল। সুনীপ বললে।

মনে মনে একটা হিসাব করছিল সুনীপ। কথাটা আজই তার মনে হয়েছে সর্বপ্রথম। ঠিক দশদিন ধরে রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় সে ওর পক্ষচাতে পদক্ষেপটা শুনছে।

ঠিক দশদিন। পনেরোই নভেম্বর আজ। তিন, চার ও পাঁচই নভেম্বর পর পর তিন-তিনটে দিন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আদালতে তাকে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল তপন ঘোষের হত্যার ব্যাপারে।

আদালতের রায় বের হয়েছে কিনা জানে না সুনীপ। কোন খোঁজ রাখে নি। তবে এটা সে বুঝেছিল তার সাক্ষীর পর বিজিতের ফাঁসি হবে না। সোমনাথ ভাদুড়ী সেই রকমই বলেছেন। এবং সে সাক্ষ্য না দিলে হ্যাত বিজিতের ফাঁসিই হতো। কারণ মৃতের গুলিবিদ্ধ রক্তাঙ্গ দেহটার সামনে সেও পড়েছিল জ্ঞান হারিয়ে। হাতের মুঠোর মধ্যে তার যে পিস্তলটা ছিল সেই পিস্তলের চেম্বারে পাঁচটি গুলি ছিল। একটি ছিল ফাঁকা। এবং বালেস্টিক পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে। সেই পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। এবং যে গুলিটা মৃতদেহকে ভেদ করে গিয়ে পাশের দেওয়ালে বিধেছিল সেটা ওই পিস্তল থেকেই যে ফায়ার করা হয়েছিল তাও প্রমাণিত হয়েছিল।

মৃণালের পাশের ঘরের লোকটি অবিনাশ সেন ও মেয়েটি মিনতি—তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল আদালতে। সন্ধ্যার কিছু পরে মৃণাল নামে মেয়েটির ঘরে তারা বিজিত মিত্রকে ঢুকতে দেখেছে। বিজিত মিত্র নাকি প্রায়ই মৃণালের ঘরে আসত। ঘন্টা দু'তিন থাকত। আরো প্রমাণিত হয়েছিল—বিজিত মিত্র তপন ঘোষের সঙ্গে চোরাকারবার করত। এবং মধ্যে মধ্যে মৃণালের ঘরে ওরা দুজন কখনো একো, কখনো একত্রে যাতায়াত করত।

মৃণালের কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সুনীপ সাক্ষ্য দিয়েছিল আদালতে স্থতঃপ্রবৃত্ত হয়ে : যে রাতে দুর্ঘটনা ঘটে, সে-রাতে ওই পল্লীর সামনে দিয়ে সে ও বিজিত মিত্র একত্রে ফিরছিল—হঠাতে দুজন লোক তাদের আক্রমণ করে—বিজিতের মাথায় একটা ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে। বিজিত সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়—সুনীপ ছুটে পালায় প্রাণভরে। কিছুদূর গিয়ে একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে সে দেখে সেই লোক দুটো বিজিতের জ্ঞানহীন দেহটা একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। রাত তখন পৌনে দুটো।

কাজেই রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ যদি মৃণালের ঘর থেকে পিস্তলের আওয়াজ শোনা গিয়ে থাকে এবং ময়না তদন্তে যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে কোন এক সময় গুলির আঘাতে তপন ঘোষের মৃত্যু হয়েছে, সেক্ষেত্রে

তপন ঘোষের হত্যাকারী বিজিত মিত্র হতেই পারে না। সারকামস্টানশিয়াল এভিডেন্স যেমন তার বিরুদ্ধে নেই—তেমনি আছে রিজেন্সেল ডাউট।

সুনীপ মকদ্দমার রায় বের হয়েছে কিনা জানে না কিন্তু বিজিত মিত্র যে দোষী সাব্যস্ত হবে না সোমনাথ ভাদুড়ীর কথায় সেটা সে বুঝেছিল। তাছাড়া মৃণাল নামক মেয়েটির সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি—একমাত্র হয়ত যে ছিল প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

ন্মান ও আহারাদির পর সুনীপ জানালার সামনে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে একটা পাতলা শাল গায়ে দিয়ে বসে বসে সিগ্রেট টানছিল।

আজ রাত আরো বেশী হয়েছে, বোধ করি রাত দুটো।

রমা রামাঘরের কাজ সেরে এসে পাশে দাঁড়াল, কি হলো? শুতে যাবে না?

বোসো রমা, তোমার সঙ্গে কথা আছে। সুনীপ বললো।

আমার বড় ঘূম পাচ্ছে।

ঘূম পাচ্ছে!

হ্যাঁ।

দাঁড়াও—আসছি। সুনীপ পাশের ঘরে গেল। আলমারি খুলে একটা স্মাগল করা স্কচ হইস্কির ছোট চ্যাপটা বোতল থেকে দুটো প্লাস হইস্কি ঢালল, একটু জল মেশাল কুঁজো থেকে—পরে ফিরে এলো প্লাস দুটো হাতে পাশের ঘরে।

নিজে একটা প্লাস নিয়ে, অন্য প্লাসটা রমার দিকে এগিয়ে দিল সুনীপ। নাও এটা খেয়ে নাও।

কি এটা?

খেয়ে ফেল।

না! বল কি?

বিষ নয়। খাও।

রমা আর আপনি জানায় না। এক চুমুকে প্লাসটা শেষ করে ফেলে, গলার ভিতরটা জুলে ওঠে।

মাগো, কি এটা—

হইস্কি।

তুমি আমাকে মদ খাওয়ালে?

মধ্যে মধ্যে খাওয়া ভাল।

ভাল?

হ্যাঁ। শরীরের উপকার হয়। ডাক্তাররা বলেন, অ্যালকোহল ইজ দ্য বেস্ট ফুড।

রমার মাথাটা তখন যেন বিষ করছে।

আমার বোধ হয় নেশা হচ্ছে—রমা বলল।

সুনীপ বলল, কিছু হবে না। অতচুকু হইস্কিতে নেশা হয় না কারো। কিছুক্ষণ বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। বোসো ঐ চেয়ারটায়।

রমা বসলো সামনের চেয়ারটার উপরে।

রমার বুকটা গরম গরম লাগছে। কান দুটোও।

জান রমা, আজ কদিন ধরে দেখছি বাড়ি ফেরার পথে কে যেন আমাকে ফলো করে।

ফলো করে তোমায়?

হ্যাঁ।

কে ফলো করে?

তা জানি না।

দেখতে পাওনি লোকটাকে?

না।

তবে বুবালে কি করে ফলো করছে কেউ তোমাকে?

করে। আমি জানি।

কিন্তু কেই বা তোমায় ফলো করবে—আর কেনই বা করতে যাবে!

হয়ত—

কি?

কেউ কিছু বলতে চায় আমায়।

কে আবার কি বলতে চাইবে তোমাকে? আর যদি বলতে চায় তো সামনাসামনি এসে বললেই তো পারে। ফলো করবার কি দরকার?

আমার কি মনে হয় জানো রমা—

কি?

তপন ঘোষ আমাকে কিছু বলতে চায়।

তপন ঘোষ! কে সে?

আমার সঙ্গে লোকটার পরিচয় ছিল। মানে তাকে আমি চিনতাম।

তা তার সঙ্গে একদিন দেখা করে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই পারো।

তার যে কোন উপায়ই আর নেই।

উপায় নেই! কেন? রমা বিশ্বয়ের সঙ্গেই যেন তাকায় সুদীপের মুখের দিকে।

না। তপন ঘোষ মাস তিনেক হলো মারা গিয়েছে—পিষ্টলের গুলিতে।

কি বলছো তুমি আবোল-তাবোল?

এই দেখো রমা, আমার গায়ে কঁটা দিয়ে উঠেছে। আমি ঠিকই বলছি। এ তপন ঘোষ ছাড়া আর কেউ নয়।

রমা কিছুক্ষণ চূপ করে রইলো। তারপর বলল, রাত অনেক হয়েছে। এবারে শোবে চল।

আর এক পেগ হইফ্ফি খাবে রমা? সুদীপ বলল।

না।

একটা কথা ভাবছি রমা।

কি?

কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনবো।

ফ্ল্যাট কিনবে কলকাতায়! কি বলছো? রমার কষ্টে বিশ্বয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অত টাকা

তুমি পাবে কোথায় ?

ফ্ল্যাট আমি দেখেছি—এখন হাজার দশেক মত দিতে হবে, তারপর বাকী চল্লিশ হাজার টাকা মাসে মাসে ত্রিশটা ইনস্টলমেন্টে—সে হয়ে যাবে।

কিন্তু ওই দশ হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে ? রমা আবার প্রশ্ন করে।

ব্যাকে কিছু আছে। কিছু ফিল্ড ডিপোজিট তোমার নামে আছে—আর বাকীটা ধার করবো বন্ধুবন্ধবদের কাছ থেকে।

না না—এই তো বেশ আছি আমরা। ফ্ল্যাট নিয়ে কি হবে ?

ফ্ল্যাটটা দেখলে তোমার খুব পছন্দ হবে দেখো। বালিগঞ্জে—একেবারে স্টেশনের কাছাকাছি। সাততলার উপরে। হ ষ্ট করে বাতাস বইতে থাকে সর্বক্ষণ। রোত্রে ট্রেনের শব্দ শুনতে পাবে। ট্রেন আসছে—যাচ্ছে—

না। ওসব ধার-কর্জের মধ্যে যেও না।

সত্যি রমা—তোমার কোন অ্যামবিশন নেই। আমি কিন্তু ফ্ল্যাটটা কিনবো ঠিক করেছি।

দেখো ধার-কর্জের মধ্যে যেও না।

চল—শুইগে। সুনীপ গা-বাড়া দিয়ে উঠে পড়ল।

॥ দুই ॥

বিছানায় শুয়ে সুনীপের ঘূর কিন্তু আসে না। অঙ্ককারে বালিশে মাথা রেখে সামনের খোলা জানালাটার দিকে চেয়ে থাকে।

সব টাকাটাই অবিশ্য সে নগদ এখনি দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাহলে টাকাটার সোর্স নিয়ে গোলমাল বাধবে। ব্যাকে মাত্র হাজার তিনেক আছে আর ফিল্ড ডিপোজিটে আছে হাজার পাঁচকে—হিসাবে মিলাতে পারবে না; বন্ধুবন্ধবের কাছ থেকে আর কত সে ধার পেতে পারে, বড়জোর হাজার দৃঢ়িন। অথচ তার অফিসের ড্রয়ারের মধ্যে করকরে চল্লিশ হাজার টাকার নেট রয়েছে। ওই চল্লিশ আর ফিল্ড ডিপোজিটের পাঁচ—ব্যাকের তিনি—মাত্র হাজার দুই টাকা বেশী—সে তো অফিস থেকেই লোন পেতে পারে।

কিন্তু হিসাব মেলাতে পারবে না। চল্লিশ হাজার টাকা ধার দেবে কে তাকে ? মাত্র তো তিনিশে টাকা মাসমাহিনা তার।

না। রমা ঠিকই বলেছে। ফ্ল্যাট কেনার এখন দরকার নেই। ওই সময় আবার মনে পড়লো বিজিত মিত্রের কথা।

কাল একবার অফিসের পর বিজিতের অ্যাডভোকেট সোমনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা করবে। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন বুকের মধ্যে কেমন দুপুরুপ করতে থাকে।

সুনীপ শুনেছে ক্রিমিন্যাল সাইডের একজন বাধা অ্যাডভোকেট সোমনাথ ভাদুড়ী।

চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে লোকটা যখন তাকায় মনে হয় যেন অপর পক্ষের পেট থেকে কথা টেনে বের করবেন। রোমশ জোড়া জ্ব। বয়েস প্রায় এখন সন্তুরের কাছাকাছি। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে।

বেঁটে-খাটো মানুষটা। কথা বলার সময় ডান হাতে ধরা পেনসিলটা দু' আঙুলের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে নাচান। ভরাট ভারী গলা।

কথা বললে মনে হয় যেন একটা জালার ভিতর থেকে কথাগুলো গম গম করে বের হয়ে আসছে।

সুদীপের সাক্ষ্য দেবার কথাটা বলতে শুনে মানুষটা এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো যেন সুদীপ কত বড় অপরাধ করে ফেলেছে।

আপনি সাক্ষ্য দেবেন?

আজ্ঞে। মানে—হঠাৎ যেন তোতলাতে শুর করেছিল সুদীপ সেদিন।

কি নাম আপনার বললেন যেন! রোমশ জ্ঞ-যুগলের নীচে চশমার পূরু লেপের ওধার থেকে তাকালেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

সুদীপ রায়।

নিহত তপন ঘোষকে আপনি চিনতেন? প্রশ্ন এলো যেন তৌকু ছুরির ফলার মত—
বিন্দু করলো সুদীপকে।

না। তবে আসামী বিজিত মিত্রকে চিনি।

চেনেন? কতদিনের পরিচয় আপনাদের?

তা বলতে পারেন অনেক দিনের। বিজিত তপন ঘোষকে মারেনি। মানে হত্যা করেনি।
হত্যা করেনি?

না। আমার সব কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন স্যার—ব্যাপারটা সব সাজানো বলেই
আমার মনে হয়।

বলতে চান কনককটেড?

হ্যাঁ, মানে—

কি রকম!

সুদীপ তখন আদালতে যা পরে বলেছিল সেই কথাগুলো সোমনাথ ভাদুড়ীকে বলল।
মন দিয়ে সুদীপের সব কথা শুনলেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

ইঁ। তা এসব কথা আগে পুলিসকে জানানী কেন?

তায়ে।

কি বললেন? ভয়ে?

হ্যাঁ—বুঝতেই তো পারছেন খুনের মামলা। এই সব মামলায় কে সেধে জড়িয়ে
পড়তে চায় বলুন, স্যার।

তবে আজকেই বা বলতে চান কেন?

একজন নির্দোষীর ফাঁসি হবে—

রোমশ জ্ঞ তলায় পূরু লেপের ওধার থেকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন
অতঃপর সোমনাথ ভাদুড়ী সুদীপের মুখের দিকে।

সুদীপের ওই মুহূর্তে মনে হয়েছিল সেই দৃষ্টির মধ্যে যেন সন্দেহ-অবিশ্বাস তার
আপাদ-মস্তককে জরীপ করে চলেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটার অধিকা সান্যাল—তার জেরার মুখে দাঁড়াতে পারবেন তো?

তিনি আপনাকে পোস্টমর্টেম করবেন। বাধা বাধা সাক্ষীও তাঁর জেরার মুখে নার্ড হারায়।
যা সত্যি তা বলবো—ভয় পাবো কেন, আপনিই বলুন না স্যার।

ঠিক আছে, আদালতে একটা এফিডেবিট করতে হবে। যা করবার আমিই করবো।
আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। সময়মত সমন পাবেন।

সমন!

হ্যাঁ, সাক্ষীর সমন যাবে আদালত থেকে। আপনার ঠিকানাটা বলুন।
সুনীপ তাঁর অফিসের ঠিকানাই দিয়ে এসেছিল।

চলে আসবার আগে সোমনাথ আবার শুধিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবেন না
তো?

না, না।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দণ্ডযামান সুনীপ রায়কে সরকারপক্ষের কৌসুলী অঙ্গীকা সান্যাল
রীতিমত প্রশ্নে পর্যন্ত করেছিলেন।

অঙ্গীকা সান্যাল প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি তো আদালতে জবানবন্দী
দিয়েছেন, বিজিত মিত্র আসামীর মাথায় পশ্চাত দিক ঘেঁষে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে
তিনি মাটিতে জ্বান হারিয়ে পড়ে যান আর আপনি ছুটে পালান?

হ্যাঁ।

ছুটে কত দূরে পালিয়েছিলেন?

সামনেই একটা গলির মধ্যে।

সেটা ঘটনাস্থল থেকে কত দূরে?

হাত আট-দশ হবে—সেই গলি থেকেই আঘাতগোপন করে দেখি ব্যাপারটা—পরে
ওরা বিজিতকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

অত রাত্রে আপনারা কোথা থেকে ফিরেছিলেন? আপনি আগে বলেছেন রাত তখন
দুটো হবে।

অফিসের ইয়ার-এনডিংয়ের সময়—অনেক রাত পর্যন্ত তখন কাজ করতে হতো
আমাদের—কাজ সারতে সারতে প্রায় দেড়টা হয়ে যায়—ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি তখন কিছুই
ছিল না; তাই হেঁটে ফিরেছিলাম দুজনে।

আপনি জানেন কি তপন ঘোষের সঙ্গে বিজিত মিত্র চোরাকারবারে লিপ্ত ছিল?
না।

আদালতে তা প্রমাণিত হয়েছে। আপনারা এক অফিসে একই ডিপার্টমেন্টে এতদিন
কাজ করছেন, এত পরিচয় ছিল তাঁর সঙ্গে আপনার, অথচ ওই কথাটা জানতেন না?
জানতেন—সবই জানতেন—প্রকাশ করেননি কখনো।

ওই সময় সোমনাথ ভাদুড়ী বলে উঠেছিলেন, অবজেকশন, ইয়োর অনার।

জজ সাহেব কিন্তু অবজেকশন নাকচ করে বলেছিলেন, প্রসিড মিঃ সান্যাল।

তারপরই প্রশ্ন করেছিলেন অঙ্গীকা সান্যাল, যে পথ দিয়ে অত রাত্রে ফিরেছিলেন সেদিন
আপনারা দুই বন্ধু—নিশ্চয়ই জানতেন তাঁর কাছাকাছি একটা কুখ্যাত পল্লী এবং সেখানে
মৃগাল নামে বারবনিতা থাকতো। সেখানে বিজিতবাবুর রীতিমত যাওয়া-আসা ছিল।

না, আমি জানতাম না।

জানতেন না?

না।

ওই পথ দিয়ে আপনি আগে আর কখনো যাতায়াত করেছেন?

ঠিক মনে করতে পারছি না! বোধ হয় আগে কখনও যাইনি।

ওই রাত্রেই প্রথম তাহলে?

বলতে পারেন তাই। বিজিতবাবু বলেছিল ওই পথটা শর্টকাট হবে শেয়ালদহে যেতে, তাই ওই পথে যাচ্ছিলাম।

অত রাত্রে তাহলে ঠিক ঠিক ভাবে রাস্তার নামটা বললেন কি করে যদি ওই পথে কখনো আগে না গিয়ে থাকেন?

বিজিত বলেছিল।

তা অত রাত্রে শেয়ালদহের দিকে যাচ্ছিলেন কেন?

মধ্যে মধ্যে ফিরতে বেশী রাত হলে ট্রেন থাকত না। ট্রেনের লাইন ধরে আমি হেঁটে চলে যেতুম বাড়ি। তাই—

কিন্তু বিজিতবাবু বাগবাজারে থাকতেন। তিনি ওই পথে যাচ্ছিলেন কেন?

আমাকে শেয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত পৌছে দিতে।

আসলে সোমনাথ ভাদুড়ী বেশ করে তালিম দিয়েছিলেন সুদীপকে কয়েক দিন—নচেৎ সুদীপ নিঃসন্দেহে গোলমাল করে বসত জেরার মুখে।

বিজিতের সঠিক সংবাদ পেতে হলে তাকে একবার ওই সোমনাথ ভাদুড়ীর কাছেই যেতে হবে। একবার জানা দরকার কোর্টের রায় বের হয়েছে কিনা—আর না বের হলে কবে বেরুবে বা বেরুতে পারে জানা প্রয়োজন।

মৃণালের কথাও মনে পড়ে এই সঙ্গে সুদীপের। মৃণালের ঘরে যে বিজিতের যাতায়াত ছিল সেটা সুদীপ জানত। একদিন সেও গিয়েছিল মৃণালের ঘরে—ওই বিজিতের সঙ্গেই। মৃণালকে সেও চিনত। অবিশ্য কথাটা সে বরাবর চেপে গিয়েছে জটিলতা এড়াবার জন্যই। বস্তুত আদালতে গিয়ে বিজিতের হয়ে সাক্ষ দেবার কথা কখনো তার মনেও হয়নি। মামলায় জড়িয়ে পড়বার ভয়ে আদালতের ধার-কাছ দিয়েও প্রথমটা সে যায়নি।

নাঃ, ঘুম বোধ হয় আজ আর আসবে না।

সুদীপ শ্যায়ার উপর উঠে বসল।

কপালের পাশে শিরা দুটো দপ দপ করছে।

পাশের ছোট টুলটার উপর থেকে সিগেটের প্যাকেটটা ও লাইটারটা তুলে নিল সুদীপ। প্যাকেট থেকে একটা সিগেট বের করে লাইটারের সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করল।

সিগেট টানতে টানতে সুদীপের মনের মধ্যে নানা কথা আনাগোনা করতে থাকে। আদালতে হলফ করে বলে এসেছে যে তপন ঘোষকে সে চিনত না।

কথাটার সত্য-মিথ্যা আজ আর অবিশ্য প্রমাণিত হবার কোন আশা নেই।

তপন ঘোষ আজ মৃত। পোস্টমর্টেমের পর তার মৃতদেহটা কেওড়াতলায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

রাত হয়ে গিয়েছিল মৃতদেহটা শ্বশানে নিয়ে যেতে। তপনের পাড়াপ্রতিবেশীরাই মৃতদেহটা শ্বশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যা থেকে সেদিন আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছিল, প্রবল বৃষ্টি। কেউ জানে না, সুদীপ সর্বাঙ্গে একটা চাদর জড়িয়ে শ্বশানে গিয়েছিল—বাইরে একটা গাছের নীচে অঙ্ককারে দাঁড়িয়েছিল। কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

হঠাতে কে একজন তার পাশে এসে দাঁড়াল। একটি স্ত্রীলোক, মাথায় দীর্ঘ গুঁঠন। প্রথমটায় সে জানতে পারেন তার উপস্থিতি। জানতে পেরে কথা বলবার চেষ্টা করতেই স্ত্রীলোকটি সরে গিয়েছিল।

চকিতে যেন অঙ্ককারে মিলিয়ে গেল।

পরে ব্যাপারটা নিয়ে সুদীপ কোনৱকম মাথা ঘামায়নি।

সুদীপ সিগ্রেট টানতে সেই রাত্রের কথাটাই ভাবতে থাকে।

পরের দিন অফিস-ফ্রেরতা সুদীপ সোমনাথ ভাদুড়ীর ওখানে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বিরাট টেবিলটার উপর একরাশ কাগজপত্র ও মোটা মোটা আইনের বই ছড়ানো। ঠিক তার উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসে ছিল আর একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি। চশমার আড়াল থেকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি যেন অস্তর বিদ্ধ করে।

মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। মুখে একটা জুলন্ত সিগার। পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, গায়ে একটা শাল জড়ানো। দুজনে মধ্যে মধ্যে কথা বলছিল।

ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকলো, বাবু—

কি?

একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

কোথা থেকে আসছেন—কি নাম?

নাম বললেন সুদীপ রায়।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সোমনাথ ভাদুড়ীর চোখের দৃষ্টি যেন তৈক্ষ হয়ে ওঠে।
বললেন, যা, পাঠিয়ে দে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সুদীপ এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন—বসুন। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন।

স্যার, একটা সংবাদ নিতে এসেছিলাম।

কি সংবাদ?

বিজিতের মামলার রায় কি—

আজই বের হয়েছে রায়। বেকসুর খালাস পেয়েছেন আপনার বক্তু।

পেয়েছে?

হ্যাঁ।

সুদীপবাবু!

বলুন।

বিজিতবাবু যে অপরাধী আমি জানতাম—হঠাতে বললেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

আজে ? থতমত খেয়ে যায় সুদীপ।

আপনি তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে।

না, না। আমি—

আপনার স্টেরিটা আগাগোড়াই কনককটেড। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন সব বুঝেও আপনাকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ালাম কেন, তাই না?

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে তখন সুদীপ সোমনাথ ভাদুড়ীর মুখের দিকে। বোবা অসহায় দৃষ্টি।

আপনি বলেছেন তপন ঘোষকে আপনি চিনতেন না। বাট আই অ্যাম শিয়োর, আপনি তাকে চিনতেন; ভাল করেই চিনতেন।

সুদীপ বোবা।

আপনাকে আমি তবু সব জেনেশনেও কেন আদালতে সাক্ষী দেওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম জানেন ? নট ফর ইউ। একটি নিরাপরাধিনী মেয়ে আমাকে বাবা বলে আমার পায়ের উপর কেঁদে পড়ে তার স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে বলেছিল বলে—শুধু সেই মেয়েটির জন্যই। যান—আর কখনো আমার ঘরের দরজা মাড়াবেন না—যান—

সুদীপ উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

বুকটার মধ্যে তখন তার ফেন হিম হয়ে গিয়েছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ।

যান।

সুদীপ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আর সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ সোমনাথ ভাদুড়ী। তারপর এক সময় ফিরে তাকালেন সোমনাথ ভাদুড়ী তাঁর সামনে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির দিকে এবং বললেন, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন রায় মশাই, এই সেই লোক যার মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে শেষ পর্যন্ত মেয়েটির স্বামীকে আমি ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে পেরেছি—নচেৎ আইন তাকে এমনভাবে কোণঠাসা করেছিল যে আমিও প্রায় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু সত্যই যদি জানতে পারতাম—

কে সে রাত্রে তপন ঘোষকে হত্যা করেছিল স্টেই তো? কিরীটি বলল।

হ্যাঁ রায় মশাই।

আপনার কি মনে হয় বলুন আগে শুনি। আপনি নিশ্চয়ই একটা কিছু ভেবেছেন—
কিরীটি বলল।

আমার মনে হয়—

বলুন।

সে-রাত্রে তপন ঘোষকে কে হত্যা করেছিল সম্ভবত স্টে ওই সুদীপ জানে।

কেন কথাটা মনে হলো আপনার মিঃ ভাদুড়ী? কিরীটি বলল।

দেখুন রায় মশাই, সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন, জীবনের অনেকগুলো বছর এই ক্রিমিন্যালদের নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছি। ক্রিমিন্যালদের চরিত্রের নানাদিক দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে—অনেক ক্রিমিন্যালকে আদালতে জেরা করে আইনের ম্যারপ্যাঞ্জে জেলখানা ও ফাঁসির দড়ি থেকেও বাঁচিয়ে দিয়েছি। মিথ্যা বলব না, তাতে করে এক ধরনের ভ্যানিটিরও আস্বাদ হ্যাত পেয়েছি অনেক সময়। কিন্তু—

কি? সহায়ে কিরীটী তাকাল সোমনাথ ভাদুড়ীর দিকে প্রশ্নটা করে।

মানুষের বিবেক বলে যে বস্তুটি মনের মধ্যে আছে, তার কাছে আমাকে জবাবদিহি দিতে হয়েছে। কিন্তু এই কেসটা যেন অন্য ধরনের। বিজিত মিত্র যে নিরপরাধ, মনে মনে কথাটা আমি হয়ত বিশ্বাস করেছিলাম—কিন্তু কেসের প্রমাণাদি তাকে এমনি কোণ্ঠাসা করে দিয়েছিল যে আমি যেন আমার সামনে কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আইনের সাহায্যে কেন্ পথ ধরে লোকটাকে মুক্ত করে আনতে পারি, ওই সঙ্গে বিজিত মিত্রের স্ত্রীর চোখের জল আর কাকুতি আমাকে যেন অস্থির করে তুলেছিল। এমন সময় ওই ফ্লাউন্ডেলটা এলো—বাধ্য হয়েই কতকটা ওকে আমি গ্রহণ করলাম বিজিত মিত্রকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু মনের কাছে কিছুতেই যেন সহজ হতে পারলাম না।

ভাদুড়ী মশাই, কিরীটী বললে, সব সময়ই আমাদের মন কি সত্য কথা বলে! এমনও তো হতে পারে আপনি যা ভাবছেন তা সত্য নয়। সত্য হয়ত বিজিত মিত্র হত্যাকারী নয়।

কিন্তু—

কিরীটী বলতে লাগল, ওই সুদীপ রায় লোকটি সত্যিই তার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ফাঁসির দড়ি থেকে?

ভেবেছি, আমি অনেক ভেবেছি কথাটা রায় মশাই—কিন্তু তবু আপনি যা বলছেন সেটা মেনে নিতে যেন পারিনি।

কিরীটী মন্দ হেসে বললে, ঠিক আছে। যদিও অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে, আমাদের একটিবার চেষ্টা করে দেখতে কোন ক্ষতি নেই। মামলার সমস্ত রিপোর্টই তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে আছে।

হ্যাঁ আছে—সম্পূর্ণ মামলার নথিটা আমি একটা ফাইল করে রেখেছি আপনার এখানে আসবার পূর্বে। এই সেই নথি—বলে একটা বিরাট ফাইল এগিয়ে দিলেন সোমনাথ ভাদুড়ী কিরীটীর দিকে।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে ফাইলটা টেনে নিল।

ভাদুড়ী আবার বললেন, আমি জানি ওই ফাইলটা খুঁটিয়ে পড়লেই হয়ত আসল সত্যটা আপনার দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিরীটী বললে, রাত হলো, তাহলে উঠি ভাদুড়ী মশাই।

উঠবেন?

হ্যাঁ।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল।—একপক্ষে ভালই হলো। ঘটনাচক্রে লোকটিও আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তবে এটুকু অস্পষ্ট নেই আমার কাছে যে, বিজিত মিত্র ছাড়া পেল কিনা কেবল সে কথাটুকু আপনার মুখ থেকে শোনবার জন্যই আজ লোকটি এখানে আসেনি।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ—মামলার রায় যে এখনো বের হয়নি সেটা অনুমান করতে পেরেছিল, আর রায় বেরুলে সেটাও সে খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ থেকেই একদিন-না-একদিন জানতে পারত। লোকটা কেন এসেছিল জানেন ভাদুড়ী মশাই?

কেন ?

আপনি নিজে তার সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটা কি ভাবে নিয়েছেন সেটাই জানবার জন্য।
সত্য বলছেন ?

মনে তো হয় তাই। আচ্ছা চলি—

কিরীটী গাড়িতে উঠে বসল। সর্দারজী গাড়ি ছেড়ে দিল।

সোমনাথ ভাদুড়ী কিন্তু আরো কিছুক্ষণ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই রইলেন।

॥ তিন ॥

গৃহে ফিরতেই কৃষ্ণ শুধাল, হঠাৎ সোমনাথ ভাদুড়ী তোমাকে ফোন করে ডেকেছিলেন
কেন ?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, চল, আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

আহারাদির পর দুজনে এসে বসবার ঘরে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসল।

জংলী এসে দু'কাপ কফি রেখে গেল। কফির পাত্র শেষ করে কিরীটী একটা সিগারে
অগ্নিসংযোগ করল।

বাইরে শীতের রাত্রি—ঝিমঝিম করছে যেন।

কিরীটী একসময় বললে, ভাদুড়ী মশায় একটা খুনের মামলার ব্যাপারে আমাকে
ডেকেছিলেন। তবে আদালতে একপক্ষ ব্যাপারটার চরম নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে—মানে
আজ আদালত তার রায় দিয়েছে। হত্যাকারী বলে যে ব্যক্তি ধৃত হয়েছিল—দীর্ঘদিন ধরে
যার বিচার হয়েছে—আদালত তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মুক্তি দিয়েছে।

তবে ?

সেই তবেই ভাদুড়ী মশায়ের প্রশ্ন, কৃষ্ণ।

বুঝলাম না ঠিক। কৃষ্ণ বলল।

মামলায় আসামীর বিরুদ্ধে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ছিল যে সোমনাথ ভাদুড়ীর মত দুঁদে
লইয়ারও হালে পানি পাছিলেন না। এমন সময় এক সাক্ষীর আবর্তাব—

কি রকম ?

সে এসে সোমনাথ ভাদুড়ীকে বলল, আসামী নির্দোষ—সে সাক্ষী দেবে। সোমনাথ
ভাদুড়ী কিন্তু খুশি হলেন না—যদিও আসামীর স্তৰী চোখের জলের মিনতিতে তিনি তখন
রীতিমত বিচলিত—আপাণ চেষ্টা করছেন আইনের কোন ফাঁক বের করতে, যাতে করে
আসামীকে মুক্ত করে আনতে পারেন।

তারপর—

আসামী ওই লোকটির সাক্ষ্যর জোরেই শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেল—কিন্তু ভাদুড়ী
মশাইয়ের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থেকে গিয়েছে।

কিসের দ্বন্দ্ব ?

সাক্ষী যা বলছে তা পুরোপুরি সত্য নয়। দেখ, যা বুঝলাম, তা হচ্ছে—
কি ?

ওই সাক্ষীকেই সোমনাথ ভাদুড়ী সন্দেহ করছেন।

সত্য?

হ্যাঁ।

ওই ফাইলটা বোধ হয় সেই মামলার? কৃষ্ণ শুধালো।

হ্যাঁ।

রাত্রের ঘূমও তাহলে গেল আজ—

না, না—তুমি শুয়ে পড়গে কৃষ্ণ—আমি ফাইলগুলো একটু উল্টেই আসছি।

ঠিক আছে। বেশী দেরি করো না কিন্তু!

কিরীটী সহধর্মীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

ফাইলের টাইপ করা পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে অন্যমনক্ষভাবে একটা পাতায় এসে তার দৃষ্টি নিবন্ধ হলো।

আদালতের প্রশ্ন : আপনার নাম?

উত্তর : শ্রীমতী দেবিকা মিত্র।

আসামীর কাঠগড়ায় যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে আপনি চেনেন?

চিনি। আমার স্বামী।

কতদিন আপনাদের বিবাহ হয়েছে?

সাত বছর।

ছেলেপুলে?

না। কোন সন্তান হয়নি আদৌ।

সন্তান চান না আপনারা?

চাই বৈকি।

তা কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেননি?

নিয়েছিলাম। ডাঃ গোরাচান নন্দী, স্বীরোগ-বিশেষজ্ঞ।

তিনি কি বলেছিলেন পরীক্ষা করে?

বলেছিলেন—

বলুন।

আমাদের নাকি কখনো কোন সন্তানাদি হবার আশা নেই।

কেন?

তা তিনি বলেননি।

কিরীটী দ্রুত কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে গেল। নিশ্চয়ই আদালত ডেকেছিল ডাঃ নন্দীকে তার সাক্ষ্য দেবার জন্য। তার অনুমান মিথ্যা নয়।

পাওয়া গেল—ডাঃ নন্দী তার পুরাতন রেকর্ড দেখে বলেছেন, ওদের সন্তান হবার কোন সন্তানবনাই ছিল না। কারণ—বিবাহের আগেই বিজিত মিত্র কুৎসিত এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু তখন চিকিৎসা করেননি ভদ্রলোক—ফলে সেই রোগ স্তুর দেহে সংক্রমিত হয়, পরে অবিশ্য বেশ কিছুদিন পরে চিকিৎসা করান দুজনই। কিন্তু ঐ রোগ

যা ক্ষতি করবার করে দিয়েছিল—স্বামীর প্রজনন-শক্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আদালতের প্রশ্ন, আপনি কথাটা বলেননি ওদের?

স্বামীকে বলেছিলাম।

চিকিৎসা কোনরকম করেননি?

করেছিলাম কিন্তু কোন ফল হয়নি।

লোকটির চরিত্র কিরীটীর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিরীটী একটা সিগারে নতুন করে অগ্রিসংযোগ করে।

দেওয়াল-ঘড়িটা ঢং করে একটা শব্দ তুলে থেমে গেল সময়ের সমুদ্রে।

বাইরে শীতের ঝিমঝিম রাত।

কিরীটী আবার অন্যমনক্ষভাবে ফাইলের পাতা ওল্টাতে থাকে আর মনের মধ্যে তার অলক্ষ্যে একটা অদেখা মানুষের ছবি যেন একটু অন্ধকারে স্পষ্ট আকার নিতে থাকে, আজ রাত্রেই সোমনাথ ভাদুড়ীর মুখ থেকে শোনা কাহিনী থেকে।

মানুষটার চেহারা—সোমনাথ ভাদুড়ী বলেছিলেন, অত্যন্ত সাদামাটা—মোস্ট আনইমপ্রেসিভ যাকে বলে। গাল দুটো ভাঙা—কিছুটা যেন গর্তে ঢেকানো। পাতলা জ্ব। গোল বর্তুলাকার দুটি চক্ষ। কিন্তু চেখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। গালের হনু দুটো বদ্বীপের মত যেন ঠেলে উঠেছে।

মাথায় পাতলা চুল। শরীরটার উপর মনে হয় অনেক অত্যাচার হয়েছে।

কিন্তু আপনাকে তো আগেই বলেছি রায়মশাহ, ওই হত্যা-মামলা আমার হাতে নেবার কোন সন্তানবানাই ছিল না, নিতামও না, কিন্তু যেয়েটি এসে হঠাত একদিন আমার চেম্বারে দু'পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়ল।

কে? কি ব্যাপার? আরে, উঠুন—উঠুন।

আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান, বাবা।

উঠুন—বলুন কি হয়েছে আপনার স্বামীর?

না। আগে বলুন দয়া করবেন।

কি হয়েছে আপনার স্বামীর?

খুনের মামলার আসামী সে আজ।

খুনের মামলা!

হঁ বাবা, আমার স্বামীর চরিত্রের মধ্যে যত দোষই থাক—সে ওই তপন ঘোষকে খুন করেনি।

উঠে বসুন। ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন।

আগে আমাকে কথা দিন।

ঠিক আছে, তুমি উঠে বসো।

যেয়েটি উঠে বসে মাথার ঘোমটা খুলে দিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে—কিন্তু মধ্য-যৌবন অতিক্রান্ত হতে চললেও যেমন এখনও দেহের বাঁধুনি, তেমনি ঝুপ, ঝুপের যেন অবধি নেই। দু'চোখে অবিরত অঙ্গ ঝারে চলেছে।

যেয়েটি বলল, বাবা, এ সংসারে আমার আর কেউ নেই—ওই স্বামী ছাড়া। গরীবের কিরীটী অমনিবাস (১৩)—১৩

মেয়ে। দয়া করে উনি আমাকে বিয়ে না করলে হয়ত শেষ পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হতো—কিংবা—

কি নাম তোমার স্বামীর?

বিজিত মিত্র—

সোমনাথ ভাদুড়ীর মনে পড়লো মাত্র কয়েকদিন পুরৈই আদালতে এক অ্যাডভোকেটের মুখে শুনেছিলেন ওই কেসটা সম্পর্কে।

বিচার চলেছে তার আদালতে।

মেয়েটি তখন আবার বলল, বাবা, আপনার ফিস দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবু এসেছি আপনার কাছে—এই গরীবকে দয়া করুন।

সোমনাথ ভাদুড়ী বলেছিলেন, তুমি দু'দিন বাদে এসো।

বাবা!

বললাম তো দিন দুই বাদে এসো।

মেয়েটির হাতে দু'গাছি সোনার বালা ছিল। সে দুটি হাত থেকে খুলতে দেখে সোমনাথ ভাদুড়ী বাধা দিলেন, কি করছো—

মেয়েটি বলল, বাবা, এই বালা জোড়া রাখুন; এ দুটো বেচে—

না—ও তুমি হাতে পরে নাও, কোন টাকা-পয়সা লাগবে না তোমার। কি নাম তোমার?

দেবিকা।

মেয়েটি সোমনাথ ভাদুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল।

সোমনাথ ভাদুড়ী পরে বলেন, পরের দিন আদালতের যে ঘরে মামলাটা চলছিল সেই ঘরে গিয়ে চুকলাম। আসামীর কাঠগড়ায় লোকটা দাঁড়িয়েছিল, ভেরি ফারস্ট শাইটেই আমার মনে হয়েছিল রায়মশাই, লোকটা দুশ্চরিত্ব এবং যে কোন ক্রাইমই ওর দ্বারা সম্ভব। ভাঙা গাল, হনু দুটো ঠেলে উঠেছে? বাঁদিকাকার গালে একটা জড়ুল আছে—সেই জড়ুলে গোটা দুই বড় বড় লোম।

কিরীটী মনে মনে ভাবে, ভাদুড়ী মশাইয়ের অনুমান হয়ত মিথ্যা নয়, তপন ঘোষকে যখন হতো করা হয় সেরাত্রে ওই বিজিত হয়ত সেখানে উপস্থিত ছিল।

মৃণাল মেয়েটি একটি বারবনিতা। দুশ্চরিত্বা মেয়ে।

অনেকেই রাত্রে তার ঘরে যেত। তাদের দলে হয়ত বিজিত, সুদীপ ও তপন ঘোষ ছিল। তারাও হয়ত ওই মৃণাল নামে বারবনিতার ঘরে যাতায়াত করত।

সুদীপ যে তার জবানবন্দিতে বলেছে তপন ঘোষকে সে চিনত না, কথাটা হয়ত মিথ্যা। মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার ভয়েই হয়ত সুদীপ সত্য কথাটা প্রকাশ করেনি।

তাছাড়া সত্যিই যদি সুদীপ সম্পূর্ণ নির্দোষ থাকত—বন্ধু ও সহকর্মীকে বাঁচানোর জন্য সে অনেক আগেই বিজিতের নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করত।

সম্ভবত ওই খুনের ব্যাপারে সুদীপ জড়িত ছিল বলেই কোন-না-কোন ভাবে প্রথমটায় সে আদালতের ধারে-কাছেও যায়নি।

পরে যে সে সোমনাথ ভাদুড়ীর কাছে গিয়ে সাক্ষী দেবার কথা বলেছে ওই মামলায়,

তার পশ্চাতেও হয়ত কোন কারণ ছিল।

কোন গুট স্বার্থ!

যাহোক, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সুদীপ এবং বিজিত দুজনাই ওই হত্যা-মামলার সঙ্গে জড়িত।

ওই হত্যা-মামলায় সবচাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ওই বারবনিতা মেয়েটি—মৃগাল।

গুলির শব্দের পর পাশের ঘরের লোকেরা ভীত হয়ে পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস এসে দেখে তপন ঘোষ মৃত, রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে আর তার পাশে জ্বানহীন হয়ে পড়ে আছে বিজিত মিত্র।

তার জামা কাপড়ে রক্তের দাগ। হাতে ধরা পিস্তল একটি, সে পিস্তল থেকে গুলি চালিয়েই তপন ঘোষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং ঘরের মধ্যে মৃগাল নামে মেয়েটি নেই।

মৃগাল একেবারে উধাও।

কোথায় গেল মৃগাল?

সে কি পালিয়েছে—না কারোর পরামর্শে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে? যদি কারো পরামর্শেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকে তো কার পরামর্শ?

পুলিস নাকি এখনো চারিদিকে মৃগালকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সোমনাথ ভাদুড়ীর ধারণা—মৃগাল হত্যাকারী নয়। তবে সম্ভবত মৃগাল হয়ত হত্যা করতে দেখেছে।

কিগো, আজ কি শুতে যাবে না?

কৃষ্ণের গলা শুনে কিরীটি তাকাল কৃষ্ণের মুখের দিকে।

কিরীটি বলল, অনেক রাত হয়েছে, না!

অনেক রাত মানে—সোয়া তিনটে বাজে!

বল কি!

চল! এবারে একটু শোবে চল।

আর কি ঘূম হবে কৃষ্ণ, বেড়াতে বেরবার সময় হলো।

সারাটা রাত না ঘুমিয়ে এখন বেড়াতে বেরোবে! কৃষ্ণ বললে।

তাহলে আজ আর না হয় না-ই বেড়াতে বেরকলাম। জংলীকে বলো কফি দিতে।

কৃষ্ণ কোনো কথা বললো না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জংলীকে তোলেনি কৃষ্ণ, নিজেই কফি করে নিয়ে এল দু'কাপ।

কফির কাপটা কিরীটির হাতে তুলে দিয়ে মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় বসলো কৃষ্ণ।

রাত্রিশেষের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে। হাওয়ায় এখনো বেশ শীতের আমেজ আছে—যদিও ফাল্গুন মাস পড়ে গিয়েছে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কৃষ্ণ বললে, দেখ ভাবছিলাম, কিছুদিনের জন্য এ সময় বেনারস গিয়ে ঘুরে এলে কেমন হয়, ঠাণ্ডা আছে কিন্তু তীব্রতা নেই।

তা মন্দ হয় না—কিন্তু—

ভাদুড়ী মশাইয়ের মামলার কথা ভাবছো?

হঁ। মনে—

ওখনে বসেই না হয় ভাববে।

কেবল ভাবলেই তো হবে না, একটা কনকুশনে পৌছতে হবে তো?

কৃষণ হেসে বললে, বাবা বিশ্বনাথের চরণে বসে দেখো, তোমার কনকুশন ঠিক এসে যাবে। তাছাড়া—

কি, থামলে কেন, বল। কথাটা বলে কিরীটী কৃষণের মুখের দিকে তাকাল।

তোমার কাহিনীর ঐ মৃগাল মেয়েটি—এমনও তো হতে পারে শেষ-মেশ গিয়ে ঐ বিশ্বনাথের চরণেই আশ্রয় নিয়েছে—

মৃগালের জন্য আমি তত ভাবছি না কৃষণ।

ভাবছো না!

না। ঘটনাস্থলে সে ছিলই সে-রাত্রে। কাজেই নিহত তপন ঘোষের দু'-এক ফেঁটা রক্ত কি তার গায়ে আর লাগেনি! লেগেছে নিশ্চয়ই—সে-রক্তের দাগ সে মুছবে কেমন করে। সেই রক্তের দাগ থেকেই ঠিক তাকে আমি চিনে নিতে পারবো। যাকগে সে কথা। তুমি টিকিটের ব্যবস্থা করো—আমরা যাবো।

ঠিক তো?

ঠিক।

পরের দিন বিকালে।

কিরীটী আবার গোড়া থেকে মামলার কাগজগুলো পড়ছিল—সোমনাথ ভাদুড়ী আদালত-ফেরতা এসে কিরীটীর গৃহে হাজির হলেন।

আসুন আসুন ভাদুড়ী মশাই। মনে হচ্ছে কোন সংবাদ আছে।

ভাদুড়ী একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, সংবাদটা বোধ হয় তেমন কিছু নয় রায়মশাই। তবু মনে হলো—আপনাকে যাবার পথে জানিয়ে যাই—তাই এলাম।

কিরীটী সপ্তর্ষ দৃষ্টিতে তাকাল ভাদুড়ী মশাইয়ের দিকে।

আজ দুপুরে আদালতে বিজিতের স্তৰী—

কে, দেবিকা—

হঁ। দেবিকা এসেছিল আমার কাছে।

কেন?

বিজিত নাকি ঘরে ফিরে যায়নি জেল থেকে খালাস পাবার পর।

যায়নি!

না। সে জানত না বিজিত ছাড়া পেয়েছে। আজ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারে গতকালই বিকালের দিকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে আদালতের রায় বেরবার পরই বেলা পাঁচটা নাগাদ। কিন্তু আজও সে ঘরে ফেরেনি—তাই দেবিকা এসেছিল আদালতে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি তখন সেন্ট্রাল জেলে অভিযন্তাবাবুকে ফোন করি।

তিনি কি বললেন?

জেল-গেটের অদূরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এক ভদ্রমহিলা নাকি অপেক্ষা করছিলেন—
ভদ্রমহিলা!

জেলের প্রহরী সেইরকমই বলেছে। ভদ্রমহিলার মাথায় নাকি ঘোমটা ছিল। গায়ে
একটা ঝুঁ রঙের র্যাপার ছিল।

তারপর—

বিজিত মিত্র জেল থেকে বেরিয়ে যখন রাস্তার দিকে চলেছে, ভদ্রমহিলা ট্যাক্সি থেকে
নেমে বিজিতের নাম ধরে ডাকতেই সে সোজা গিয়ে ট্যাক্সিতে নাকি উঠে বসে। ট্যাক্সিটা
ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

ট্যাক্সি—গুঠনবতী মহিলা!

হ্যাঁ।

কিন্তু সেই মহিলা ঠিক ওই সময়ই বিজিত মিত্রকে ছাড়া হবে জানলেন কি করে?
কিরীটীর প্রশ্ন।

ঐ ভদ্রমহিলাই কিনা জানা যায়নি, তবে আগের দিন নাকি এক ভদ্রমহিলা বেলা
পাঁচটা নাগাদ এসেছিলেন জেলখানায়—জেলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জেলারের
মুখ থেকেই নাকি সে শুনেছিল আদালতের রায়ে তাকে মুক্তি দিলেই তাকে ছেড়ে দেওয়া
হবে জেল থেকে।

মামলার রায় পরের দিনই বেরংবে আপনার অমিয়বাবু কি জানতেন?

জানতেন আর এ-ও জানতেন বিজিত মিত্র বেকসুর খালাস পাবে।

কি করে জানলেন?

আমিই বলেছিলাম।

আপনি?

হ্যাঁ। অমিয়বাবু যেদিন রায় বের হয় তার আগের দিন সকালে আমাকে ফোন
করেছিলেন।

আশ্চর্য!

কি?

হঠাৎ অমিয়বাবু আপনাকে ফোন করতে গিয়েছিলেন কেন, বিশেষত ওই বিচারাধীন
কয়েনী সম্পর্কে! কথাটা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেননি?

না।

কিরীটী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে, চলুন।

কোথায়?

অমিয়বাবুর কোয়ার্টারে—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

বেশ, চলুন। কিন্তু এখনি যাবেন?

হ্যাঁ।

সোমনাথ ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ান।

জেলের নিকটেই অমিয়বাবুর কোয়ার্টার। অমিয়বাবু গৃহেই ছিলেন। সোমনাথ ভাদুড়ী

কিরীটীকে নিয়ে এসে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন।

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর বসবার ঘরে বসে ওইদিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন। বয়স অনুমান চলিশ থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যে হবে তাঁর।

বেশ হাট্ট-পুষ্ট গোলগাল চেহারা। একজোড়া বেশ ভারী গৌফ। লম্বা জুলপী। জুলপীর চুলে কিছু পাক ধরেছে। চোখে চশমা।

সোমনাথ ভাদুড়ীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সহাস্যে সম্মোধন করলেন, মিঃ ভাদুড়ী যে—আসুন—আসুন। তারপরই কিরীটীর প্রতি নজর পড়তে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

পরিচয় করিয়ে দিই অমিয়বাবু—

অমিয়বাবু বললেন, পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না মিঃ ভাদুড়ী। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও ওঁকে আমি চিনি। আজ ওঁকে চেনে নাই বা কে? কিরীটীবাবু, বসুন—বসুন।

সোমনাথ ভাদুড়ী ও কিরীটী উপবেশন করে।

অমিয়বাবু! সোমনাথ বললেন।

বলুন—

তপন ঘোষ হত্যা-মামলার আসামী বিজিত মিত্রকে কাল বিকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ—আপনাকে তো সে-কথা বলেছি।

সেজন্য আমরা আসিনি অমিয়বাবু। এসেছি অন্য একটা ব্যাপারে, কিরীটী এবার কথা বললে।

কি বলুন তো?

পরশ্ব, মানে বিজিতবাবুকে যেদিন ছেড়ে দেওয়া হয় তার আগের দিন এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

হ্যাঁ—আমার কোয়ার্টারে—বিজিতবাবুর সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করতে। মানে যদি সে আদালত থেকে মুক্তি পায় তো কখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে—সেটাই জানতে।

সেই মহিলার ঠিক বয়স কত হবে বলে আপনার মনে হয়? অমিয়বাবু? প্রশ্ন করল কিরীটী।

বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ হবে। দোহারা পাতলা চেহারা, বেশ সুন্দর দেখতে। পরনে একটা দামী শাড়ি, পায়ে চপ্পল।

আচ্ছা অমিয়বাবু, তাঁর চেহারার মধ্যে বিশেষ কিছু আপনার নজরে পড়েছিল কি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

না। সেরকম তো কিছু মনে পড়েছে না। তবে—

কি? কিরীটী সোৎসুক ভাবে তাকাল অমিয়বাবুর মুখের দিকে।

আমার নজরে পড়েছিল তাঁর বাঁ হাতে উল্কিতে লেখা ছিল একটা ইংরেজী অক্ষর ‘এম’।

‘এম’! কথাটা মৃদু গলায় উচ্চারণ করে কিরীটী সোমনাথের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ। অমিয়বাবু বললেন।

আর কিছু—তাঁর মুখের ঢংটা?

না। তার মুখটা আমি দেখতে পাইনি।

কেন?

মুখে ঘোমটা ছিল। চিবুকটা কেবল নজরে পড়েছে। উপরের ও নীচের ঠোঁট ও চিবুকের কিছুটা অংশ।

তার চলার বা বসবার—দাঁড়াবার ভঙ্গি?

না, আমি সেটা তেমন লক্ষ্য করিনি কিরীটীবাবু। আর তিনি বসেননি—আগাগোড়া দাঁড়িয়েই ছিলেন মুখে ঘোমটা টেনে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করেননি? কোন পরিচয় দেন নি?

নাম বলেননি। আমি জিজ্ঞাসাও করিনি। তবে অবিশ্য বলেছিলেন তিনি বিজিতবাবুর স্ত্রী।

কিরীটী সোমনাথ ভাদুড়ীর দিকে তাকাল।

দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

চলুন ভাদুড়ী মশাই, এবার যাওয়া যাক। কিরীটী বললে।

॥ চার ॥

ধন্যবাদ জানিয়ে অমিয়বাবুর কাছ থেকে বিদ্য নিয়ে দুজনে বের হয়ে এলেন।

গাড়িতে উঠতে উঠতে কিরীটী বললে, আপনি তো দেবিকাকে দেখেছেন ভাদুড়ী মশাই?

হ্যাঁ। আজও তো মেয়েটি আদালতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কখনো সে মাথায় ঘোমটা দিয়ে আসেনি। তাছাড়া তার হাতে কোন উষ্ণি দেখিনি। তার রং অবিশ্য ফসাই। আমার মনে হয় সে দেবিকা নয় রায় মশাই।

আমারও তাই অনুমান। কিরীটী বললে, তাই ভাবছি কে হতে পারে মেয়েটি?

ভাদুড়ী মশাই!

বলুন।

মৃগালের চেহারার কোন ডেসক্রিপশন আপনার জানা আছে?

মেয়েটিকে তো আমরা কেউ দেখিনি।

আচ্ছা ঘটনার দিন পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ও মেয়েটি ছিল?

অবিনাশ সেন আর মিনতি দন্ত।

মেয়েটির নাম মিনতি দন্ত?

হ্যাঁ।

সে মেয়েটি তো মৃগালের পাশের ঘরেই থাকত। সেও রাপোপজীবিনী ছিল।

তার সাক্ষ্যও তো নেওয়া হয়েছে আদালতে।

জানি। আমি বলছিলাম—

কি বলুন?

মৃগালের ডিটেলস ওই মিনতির কাছে পাওয়া যেতে পারে।

তা অবিশ্যি পারে। তা এখনো তো বেশী রাত হয়নি। সেই পল্লীটা একবার ঘুরে যাবেন নাকি? সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন।

গেলে আমার মনে হয় ভালোই হতো।

বেশ, চলুন।

সোমনাথ ভাদুড়ী ড্রাইভার সমরেশকে বললেন, কলেজ স্ট্রীটে যে শিবমন্দিরটা আছে সেদিকে যেতে।

গলিটা কুখ্যাত ছিল এককালে! বর্তমানে অবিশ্যি আর ততটা নেই—তাহলেও সেখানকার পুরাতন বাসিন্দারা কিছু কিছু সেখানে এখনো ছড়িয়ে আছে।

গলির মধ্যে গাড়ি নিলেন না সোমনাথ ভাদুড়ী। ট্রাম রাস্তার উপরেই একপাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দূজনে হেঁটে চললেন। সন্ধ্যার পর থেকেই গলিটাতে মানুষের চলাচল যেন বৃদ্ধি পায়। সোমনাথ ভাদুড়ী বাড়িটা ঠিক চিনতেন না কিন্তু বাড়ির নম্বরটা মনে ছিল। নম্বরটা খুঁজে পেতে দেরি হল না।

একটা দোতলা লাল রংয়ের পুরনো বাড়ি!

মিনতিকে একটি মেয়ে ডেকে দিল।

মিনতি বোধ হয় ঘরে বসে সাজসজ্জা করছিল। ডাক শুনে বের হয়ে এলো।

কি রে টাপা!

এই ভদ্রলোক দুটি তোকে খুঁজছেন।

মিনতি তাকাল। সোমনাথ ভাদুড়ীকে আদালতে দেখেছে। চিনতে তার কষ্ট হলো না।
বললে, উকিলবাবু—

মিনতি, তোমার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।

মিনতি মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলো। তারপর বললে, আসুন উকিলবাবু ঘরে।

তিনজনে মিনতির ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরটি বেশ গোছানো। ছিমছাম। একদিকে একটি পালক পাতা। উপরে ধৰ্মবেশ শয্যা পাতা। দুটি দুটি চারটি মাথার বালিশ, একটি মোটা পাশ-বালিশ। একধারে একটি কাঁচের পাণ্ডাওয়ালা আলয়ারি। কিছু রূপোর, কাঁচের ও কাঁসার বাসনপত্র। নানা ধরনের পুতুল, খান দুই চেয়ারও আছে একধারে।

বসুন উকিলবাবু। একটু চায়ের জোগাড় করি।

না না মেয়ে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন চেয়ারে বসতে বসতে।

মিনতি আর কথা বলে না। ওদের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকায়।

মিনতি—

বলুন!

এই ভদ্রলোক তোমাকে মৃণালের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন।

মৃণাল!

কিরীটী দেওয়ালে একটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়েছিল। সেই ফটোর দিকে তাকিয়েই

কিরীটী প্রশ্ন করল, ওই ফটোটার একজনকে তো চিনতে পারছি—মনে হচ্ছে তুমিই, তাই না?

মিনতি বললে, হ্যাঁ, আমিই। আমার পাশে—

তোমার বোন বা কোন আঙীয়া বুঝি? কিরীটী বললে।

না। আমার পাশে ওই মৃগাল। মিনতি বললে।

মৃগাল! মানে যে মেয়েটি—

ঠিকই ধরেছেন। যে মৃগালকে নিয়ে এতদিন ধরে মামলা চললো। যার খৌজ পাওয়া যায়নি—

ফটোটা কবেকার তোলা? কতদিনের?

তা প্রায় বছর দুই হবে। হঠাৎ একদিন মৃগালের খেয়াল হলো একটা ফটো তুলবে আমাকে নিয়ে—কথাটা বলতে বলতে মিনতির চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে।

বছর দুই আগেকার ও ফটো তাহলে?

হ্যাঁ। মৃগালই একদিন আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে হ্যারিসন রোডের একটা স্টুডিও থেকে ফটোটা তোলায়। একটা কপি তার ঘরে ছিল, অন্যটা আমার ঘরে আমি বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু—

কি?

পুলিসের লোক খানা-তল্লাসী করতে এলে ফটোটা কিন্তু তার ঘরে পায় না। মনে হয় বাড়ি ছেড়ে সে-রাত্রে যাবার আগে ফটোটা সে সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছে।

পুলিস সেদিন তোমার ঘর খানা-তল্লাসী করেনি?

করেছিল।

ওই ফটো সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেনি?

না।

মৃগালের সঙ্গে মনে হচ্ছে তোমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল, তাই না?

ঠিক ধরেছেন, পুলিশকেও বলেছি—আপনাকেও বলছি, মৃগাল অত্যন্ত লক্ষ্মী ও শাস্তি স্বভাবের ছিল। এ বাড়িতে একমাত্র আমার সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে মিশতো না, কথাও বলতো না বড় একটা।

মৃগাল তো তোমার পাশের ঘরেই থাকত?

হ্যাঁ।

ওই ঘরে এখন কে আছে?

কেউ নেই, ঘরটা আজও খালিই পড়ে আছে মৃগাল চলে যাবার পর থেকে।

কেন?

কেউ ও-ঘরে থাকতে চায়নি। মৃগাল খুব ভাল গান গাইতে পারত—নাচতেও পারত। আজও মধ্যে মধ্যে রাত্রে নাকি ওর ঘর থেকে ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়।

তুমি শুনেছো?

না। সত্যি বলবো, আমি কোনদিন কিছু শুনিনি। কিন্তু মৃগালের কথা এত শুনতে থাইছেন কেন?

কথাটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলি, কিরীটী বলল—তপন ঘোষের হত্যাকারীকে আজও পুলিস সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু বাবু, বিশ্বাস করুন, মৃণাল তপনবাবুকে হত্যা করেনি।

আমিও সে-কথাটা বিশ্বাস করি—কিরীটী বলল।

বিশ্বাস করেন?

করি, আর তাই তো মৃণালের সন্ধান আমিও করছি।

আপনি—

সোমনাথ ভাদুড়ী ওই সময় বললেন, এই ভদ্রলোকের পরিচয় তুমি জান না। কিরীটী রায়ের নাম শুনেছে?

না তো!

উনি সত্যসন্ধানী। সে-রাত্রে পাশের ঘরে সত্যই কি ঘটেছিল উনি সেটাই জানবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু বাবু, আমি তো মৃণালের কোন সন্ধানই জানি না। বিশ্বাস করুন।

হয়তো জানো না, কিরীটী বললে, কিন্তু তুমি মৃণালের কথা যতটা জানো—অন্য কেউ হ্যাত সেটা জানে না।

মিনতি বললে, পাশের ঘরে ছিল মৃণাল। দিনের বেলাটা প্রায়ই তার আমার ঘরেই কেটে যেত—তবে—

কি?

বড় চাপা মেয়ে ছিল মৃণাল। তাছাড়া নিজের কথা বড় একটা বলতো না কখনও। বিশেষ করে এখানে আসার আগে তার সব কথা জানায়নি।

তুমি জিজ্ঞাসা করোনি কখনো সে-সব কথা তাকে? কিরীটীর প্রশ্ন।

না। আর জিজ্ঞাসা করেই বা কি করবো বলুন।

কেন?

এ লাইনে যারা আসে তাদের ইতিহাস তো প্রায় সকলেরই এক—অন্যরকম আর কি হবে।

আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? হঠাৎ সে পালাল কেন?

আমার মনে হয় বাবু, খুনখারাপি দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে হ্যাত সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

আচ্ছা মিনতি, কিরীটী বলল, এমন তো হতে পারে তপন ঘোষের খনের ব্যাপারে সে-রাত্রে ওই মৃণালও জড়িত ছিল বা তার পরোক্ষ হাত ছিল?

না, না বাবু, না। কখনো তা হতে পারে না। মৃণালকে তো আমি জানি।

সে-রাত্রে কি ঘটেছিল বা না ঘটেছিল তুমি তো আর কিছু দেখেনি!

তা হলেও আমি জোর গলায় বলতে পারি—মৃণাল সম্পূর্ণ নির্দোষ, সে ওই ধরনের মেয়েই নয়, অমন শাস্তি স্বভাবের মেয়েকে—না বাবু, না।

তুমি তো একটু আগে বললে, তোমাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল।

হ্যাঁ। পাশাপাশি ঘরে থাকতাম। দিনের বেলা বেশীর ভাগ সময় তো সে আমার ঘরেই

থাকত, আমার সঙ্গে থেতো—এক বিছানায় দুজনে শুয়ে থাকতাম।

মৃগালের ঘরে কে আসতো নিশ্চয় তুমি জানতে ?

জানতাম বৈকি, তপনবাবুরই যাতায়াত ছিল তার ঘরে।

আর কেউ আসতো না ? বিজিতবাবু ?

আসতো। তবে মধ্যে মধ্যে।

তপন ঘোষ তখন থাকত ?

না। তপন ঘোষ থাকলে বিজিতবাবু আসতো না। তবে একটা কথা। আমার মনে হয় বিজিতবাবুর উপরে মৃগালের বোধ হয় একটা দুর্বলতা ছিল।

হ্যাঁ। আচ্ছা মিনতি—সুদীপবাবুকে কখনো মৃগালের ঘরে আসতে দেখেছো ?

দেখেছি।

একা একা ?

না—তপন ঘোষের সঙ্গেই বারকয়েক আসতে দেখেছি।

আদালতে সাক্ষী দেবার সময় তো কথাটা তুমি বলেনি !

না, বলিনি।

কেন, কেবল বিজিতবাবুর কথাটি বা বলেছিলে কেন ?

মিনতি চূপ করে থাকে।

অবিশ্যি তোমার আপত্তি থাকলে আমি শুনতে চাই না।

না, তা নয়—

তবে ?

আমার মনে হয় বাবু—বিজিতবাবু কোন চোরাকারবারে লিপ্ত ছিল—তপনবাবুর সঙ্গে তাঁর হয়ত সেই নিয়েই শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি হয়েছে। আদালতে সে-কথাটা আমি বলেছিলামও।

আর কেউ কখনো মৃগালের ঘরে আসেনি ? আসতে দেখনি ?

না।

মৃগালের আঞ্চল্য-স্বজন কেউ ছিল না ?

জানি না ? বলতে পারবো না।

তার দেশ বা বাড়ি কোথায় ছিল জানো ?

না, সেও কোনদিন তার বাড়িয়ারের কথা বলেনি, আমিও সে-সব কথা কখনো তাকে শুধাইনি।

কতদিন এখানে মৃগাল ছিল ?

তা প্রায় আড়াই বছর তো হবেই।

তার আগে কোথায় ছিল সে ?

জানি না।

কথাটা তুমি তাকে কখনো জিজ্ঞাসা করনি ?

না।

জানবার কখনো ইচ্ছা করেনি তোমার ?

না।

তার অতীত জীবনের কথা তাহলে তুমি কিছুই জানো না?

না।

কিছু না?

কথায় কথায় একদিন সে বলেছিল—

কি?

তার স্বামী তাকে প্রচণ্ড মারধোর করতো প্রতি রাত্রে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে এসে।
এক রাত্রে মারধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে দরজায় তালা দিয়ে চলে যায়।

তারপর?

দু'দিন বাড়ির দরজার সামনেই সে বসে ছিল। তৃতীয় দিন বিকেলে হঠাতে তার স্বামীর
এক বন্ধু সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার স্বামীর কাছে তাকে পৌঁছে দেবে বলে
কলকাতায় নিয়ে আসে।

সেই বন্ধুটিকে মৃগনের স্বামী চিনতো?

হ্যাঁ—প্রায়ই সে যেতো ওদের বাড়িতে।

কে সে? কি নাম তার জানো?

না।

তারপর?

তারপর আর কি, এখানে বাড়িউলী মাসীর হাতে তাকে তুলে দিয়ে বন্ধুটি চলে যায়।
পরে জেনেছিল মৃগাল, ওই লোকটির নাকি মেয়ে চালান দেবার ব্যবসা ছিল। আর সেই
ব্যবসায় তার স্বামীও একজন ভাগীদার ছিল। সন্তুষ্ট ওই লোকটি মৃগালকে চালান দেবার
মতলব করেছিল।

কিন্তু এখানে এলো কি করে মৃগাল?

সে আর এক দৈবচক্র—

কি রকম?

স্বামীর সেই বন্ধুর আশ্রয় থেকে পালিয়ে এল রাত্রে মৃগাল। রাস্তায় এসে নামল।
হাঁটতে হাঁটতে নিমতলার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকল। সেখানে আমাদের বাড়িউলী
মাসীর সঙ্গে দেখা—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ফুফ ফুফইং প্যান টু দ্য ফায়ার!

কি বললেন বাবু?

না, কিছু না, তোমাদের বাড়িউলী মাসী তখন তাকে এখানে এনে তুলল, তাই না?

আজ্ঞে! এ পাপ দেহের ব্যবসায় সে নামতে চায়নি, কিন্তু পালাবার তো আর পথ ছিল
না, মাসীর চার-পাঁচজন তাঁবেদার গুণ্ঠা আছে—মাসীর পোষ্যও তারা—তারা সর্বক্ষণ
চোখ মেলে থাকত। কাজেই বুঝতে পারছেন বাবু—

কিরীটী প্রত্যন্তে মৃদু হাসলো।

আচ্ছা সে-রাত্রে ঠিক কি ঘটেছিল, মানে যতটা তুমি জানো বা জানতে পেরেছিলে
আমাকে বলতে পার! কিরীটী প্রশ্নটা করে মিনতির দিকে তাকাল।

বাবু, সে রাত্রে আমার ঘরে কেউ ছিল না রাত দশটার পর। আমার বাবু পোনে দশটা
নাগাদ চলে যান—

কিন্তু আদালতে বলেছো, অবিনাশ সেন নামে এক ভদ্রলোক আর তুমি—

ঠিকই বলেছি—যার কথা বলেছি সে আমার স্বামী।

স্বামী!

হাঁ, আট বছর আগে তার ঘর ছেড়ে আমি চলে আসি—

কেন?

তার জঘন্য চরিত্র ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য। কিন্তু সে আমাকে বছর তিনেক বাদে
খুঁজে বের করে এখানে। এবং তারপর থেকে মধ্যে মধ্যে সে আসতো আমার কাছে।
কেন? টাকার জন্য?

না, সোনার বেনে—মস্তবড় জুয়েলারী ফার্ম তার, টাকার অভাব তো নেই। অনেক
টাকা তার। টাকার জন্য সে আমার কাছে আসবে কেন!

তবে কি জন্যে আসতো?

আমাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য।

ফিরে গেলে না কেন?

না। কারণ আমি জানতাম সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। তাছাড়া—
কি?

এই পাপ নিয়ে আর কি সেখানে ফিরে যেতে পারি।

তোমার কোন সন্তানাদি—

না, হয়নি। তবে তার প্রথম পক্ষের দুটি সন্তান ছিল—আমি তার দ্বিতীয় পক্ষ। আরো
অনেক কথা আছে, যা বলতে পারবো না।

থাক, বলতে হবে না। কিন্তু তুমি আদালতে সে সব কথা তো প্রকাশ করনি?

না, করিনি।

কেন?

ওই সব কি প্রকাশ করবার মত কথা দশজনের সামনে আদালতে দাঁড়িয়ে?

এবার বল, সে রাত্রে ঠিক কি ঘটেছিল।

রাত সাড়ে দশটার পর, বোধ হয় এগারোটা হবে তখন—আমার স্বামী এলো।

বললে, সে আমাকে না নিয়ে ফিরবে না। আমিও যাবো না। সেও নাছোড়বান্দা। আমি
বললাম আর আমি জীবনে কোনদিন তার ঘরে ফিরে যাবো না, সেও যেন আর না আসে।

॥ পাঁচ ॥

মিনতি বলতে লাগল, রাত বোধ হয় বারোটা। হঠাৎ পর পর দুটো গুলির আওয়াজ—
আর একটা আর্ত চিক্কার—

দুটো গুলির আওয়াজ শুনেছিলে? প্রশ্ন করলেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

হ্যাঁ।

কিন্তু আদালতে বলেছ একটা গুলির আওয়াজই তুমি সে রাত্রে শুনেছিলে। আবার প্রশ্ন করলেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

হ্যাঁ, তাই বলেছিলাম বটে।

কিরীটী এবার বললে, দুটো গুলির আওয়াজ শুনেছিলে তবে বলেছিলে কেন একটা গুলির আওয়াজ শুনেছো?

মনে ছিল না।

কিরীটী বললে, হ্যাঁ। ঠিক আছে গুলির আওয়াজ শুনে তুমি কি করলে?

ভয়ে প্রথমে আমরা ঘর থেকে বের হইনি। এদিকে বাড়ির অনেকেই সে আওয়াজ শুনেছে তখন, কিন্তু তারাও কেউ ভয়ে ঘর থেকে বের হয়নি। মিনিট পাঁচেক পরে আমি আর আমার স্বামী দরজা খুলে বের হই। মৃগালের ঘরের দরজা বন্ধ। কোন সাড়া-শব্দ নেই। দরজায় ধাক্কা দিয়ে মৃগালকে ডাকি। কিন্তু মৃগালের কোন সাড়া-শব্দ পেলাম না। বাড়ির অনেকেই তখন এসে ঐ ঘরের দরজার সামনে ভিড় করেছে। হঠাৎ এই সময় আমার মনে পড়ল—আমার আর মৃগালের ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। আমার ঘরের ভিতর থেকেই আমি বন্ধ করে রাখতাম বরাবর। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সেই মধ্যবর্তী দরজাটা খুলে মৃগালের ঘরে গিয়ে চুকলাম। চুকে দেখি তপন ঘোষ রক্তাঙ্গ অবস্থায় মেঝেতে পড়ে। তার পাশে পড়ে বিজিতবাবু। তার হাতে ধরা একটা পিস্তল। আর—মৃগাল ঘরে নেই?

মৃগাল নেই?

না। বাথরুমের দরজাটা খোলা হাঁ হাঁ করছে। আমি তখন প্রথমে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুমের আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে এলাম। আমার স্বামী দেখি দরজার গায়ে লাখি মারছে—বাড়িটুলী মাসীর হকুমে। দরজা ভেঙ্গে আমি আর আমার স্বামীই প্রথমে ভিতরে চুকি—পর পর অন্য সকলে। পরে থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিস আসে।

বাথরুমের ওই দরজা দিয়ে এ বাড়ির বাইরে যাওয়া যায়? কিরীটীর প্রশ্ন।

হ্যাঁ, বাইরে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা বরাবর একতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত গিয়েছে।

বলতে চাও তাহলে ওই সিঁড়িপথেই মৃগাল পালিয়েছে?

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি হবে। তবে পুলিসের খটকা থেকে গিয়েছে—মৃগাল কোন পথে পালাল—বাথরুমের দরজা যখন বন্ধ ছিল। আমিও পুলিসকে কথাটা বলিনি, আদালতেও প্রকাশ করিনি।

কেন করনি?

পুলিস হয়ত আমাকে সন্দেহ করত যে, আমিই তাকে সে-রাত্রে পালানোর সুযোগ দিয়েছি।

এ কথাটা তোমার মনে হলো কেন মিনতি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

তারা যে অনুসন্ধানের সময় আমার ও মৃগালের ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা আবিষ্কার করেছিল এবং আমাকে নানাভাবে জেরা করেছিল।

তা তোমাকে যে তারা শেষ পর্যন্ত সন্দেহ করেনি, তুমি বুঝলে কি করে?

আমি যে একসময় সে-রাত্রে গোলমাল শুনে এক ফাঁকে মৃগালের ঘরের মধ্যে গিয়ে চুকেছিলাম, সে কথাটাও কাউকে আমি বলিনি। তারাও সেটা অনুমান করতে পারেনি। তাই আমার মনে হয়, আমাকে তারা মৃগালের সে-রাত্রে পালানোর ব্যাপারে কোনভাবে সন্দেহ করতে পারেনি।

কিরীটী মুখে কিছু না বললেও বুঝতে পারে মেয়েটি রীতিমত বুদ্ধিমতী।

মিনতি!

বলুন।

আমার কিন্তু মনে হয়, মৃগাল কোথায় আছে, অস্তত আর কেউ না জানলেও তুমি জানো।

কি বলছেন আপনি!

যা আমার মনে হচ্ছে তাই বললাম।

আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি জানি না।

দেখ মৃগালকে আমি খুঁজে বের করবই। সে অস্তত আমার চোখে ধূলো দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না। আচ্ছা আজ আমরা উঠছি আবার কিন্তু আসবো।

নিশ্চয়ই আসবেন। মিনতি বললে, কিন্তু বিশ্বাস করুন বাবু, মৃগালের সন্ধান জানলে নিশ্চয়ই সে-কথা আমি আপনাদের জানাতাম।

কিরীটী মিনতিকে আর কিছু বললে না। উঠে দাঁড়াল এবং সোমনাথ ভাদুড়ীকে বললে, চলুন ভাদুড়ী মশাই, এবার যাওয়া যাক। ভাল কথা, একবার মৃগালের ঘরটা দেখে গেলে হতো।

সোমনাথ ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বেশ তো চলুন।

মিনতি বাড়িটীর মাসীর কাছ থেকে ঘরের চাবিটা নিয়ে এলো। দরজা খুলে ওরা দুজনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

রাত তখন প্রায় সোয়া নটা হয়ে গিয়েছে।

দুজনে ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় এসে কিরীটীর অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠে বসলো।

সর্দারজী, বাবুকে তাঁর কোঠিতে নামিয়ে দাও আগে—কিরীটী বললে।

কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর সোমনাথ ভাদুড়ীই স্তুতা ভঙ্গ করলেন, কি ভাবছেন রায় মশাই?

ভাবছি ওই মিনতি মেয়েটির কথা।

সত্যিই কি আপনার মনে হয়, মেয়েটি জানে মৃগাল কোথায়?

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো জানে।

তবে সে কথা মিনতি প্রকাশ করল না কেন? এত কথা বললে, অথচ ওই কথাটা চেপে গেল কেন!

তার দুটি কারণ হতে পারে ভাদুড়ী মশাই।

কি কারণ?

প্রথমত, কথাটা প্রকাশ করলে সে মামলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তো, যেটা হয়ত সে কোনোভাবেই চায়নি। দ্বিতীয়ত, হয়ত সে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখেছিল সেই রাত্রে।

কি রকম?

গোলাগুলির আগে হয়ত একটা গোলমাল হয়েছিল। আর সে তখন ওই ঘরের মধ্যবর্তী দরজা খুলে ব্যাপারটা সবার অলঙ্কৃতি দেখেছিল। সে যে পিস্টলের শুলির শব্দেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিল কথাটা হয়ত সত্য নয় কিন্তু সে কথাটা প্রকাশ করেনি ওই একটি কারণে—পুলিস তার পেটের গোপন কথা হয়ত টেনে বের করত জেরা করে। একটা কথা ভুলে যাবেন না ভাদুড়ী মশাই, ঘটনার সময় মিনতি আর তার স্বামী অবিনাশ ঠিক পাশের ঘরেই ছিল। অকুস্থানের এক কথায় যাকে বলে সন্নিকটে।

তাহলে—

মিনতির উপর কড়া নজর রাখতে হবে। আপনি ভাববেন না, বাড়ি ফেরার পথেই লালবাজারের সি. আই. ডি. অফিসার প্রতুল সেনকে আমি মিনতির উপর কনস্ট্যান্ট একটা ওয়াচ রাখবার জন্য আজ থেকেই নির্দেশ দিয়ে যাবো।

সোমনাথ ভাদুড়ীকে তাঁর গৃহে নামিয়ে দিয়ে কিরীটী সোজা সার্কাস এভিন্যুতে প্রতুল সেনের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো।

প্রতুল সেন তখন ডিনারে বসেছিলেন।

সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলেন।

কি ব্যাপার মিঃ রায়! এত রাতে?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এত রাত কোথায়, মাত্র তো সোয়া দশটা।

আমি খেতে বসেছিলাম, আপনার নাম শুনে—

ছিঃ ছিঃ, যান আহার শেষ করে আসুন। আমি বসছি।

না না, আপনি বলুন কি দরকার?

বলবো বলেই তো এসেছি। আগে যান ডিনার শেষ করে আসুন, আমি বসছি।
সে হবে খন—আপনি বলুন।

না, এমন কিছু একটা জরুরী ব্যাপার নয়, আপনি যান—ফিনিশ ইওর ডিনার ফাস্ট।

প্রতুল সেন চলে গেলেন এবং মিনিট কুড়ি বাদেই ফিরে এলেন একটা সিগারেট ধরিয়ে। একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, বলুন।

কিরীটী সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুলে বলল। তারপর বললে, আমি যে জন্য এসেছি সেটা হচ্ছে ঐ মিনতির সবরকম গতিবিধির উপর আপনাকে নজর রাখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখুনি।

বেশ, করছি। প্রতুল সেন উঠে গিয়েই ফোনে যেন কাকে নির্দেশ দিয়ে এলেন।

মিঃ রায়, আপনার ধারণা তাহলে মিনতি জানে মৃগালের হোয়ার অ্যাবাউটেস!

হ্যাঁ।

মিনতিকে তাহলে অ্যারেস্ট করলেই তো হয়?

না, এখন নয়।

কিন্তু তার স্বার্থ কি?

স্বার্থ একটা আছে বৈকি কিছু—

কি স্বার্থ থাকতে পারে?

ইফ আই অ্যাম নট রং—আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়ে থাকে তো, কিরীটী
বললে, ঐ বাড়িতে একটা চোরাকারবারের ঘাঁটি ছিল।

চোরাকারবারের ঘাঁটি!

হ্যাঁ। যার মধ্যে জড়িত ছিল তপন ঘোষ, বিজিত মিত্র ও সুদীপ রায় তো বটেই—
ঐ মিনতি ও মৃগাল সম্ভবত ছিল।

সত্যি বলছেন?

বললাম তো আমার অনুমান। এবং তপন ঘোষের মৃত্যুর পশ্চাতেও ওই
চোরাকারবার।

আর মিনতির স্বামী অবিনাশ সেন?

সেও থাকটাই সম্ভব। আপনাকে আরো একটা কাজ করতে হবে মিঃ সেন।
কি?

ওই অবিনাশ সেনকে একবার লালবাজারে ডাকিয়ে আনাতে হবে কালই।

বেশ। কখন?

বেলা দশটা বা এগারোটা নাগাদ—আমরা আপনার অফিসে তাকে জেরা করলে
হয়ত কোন সুন্দরের সন্ধান পেতে পারি।

আমার তো মনে হচ্ছে ওই মিনতি মেয়েটি—

তাকে তো জেরা করবোই—তার আগে তার জানা দরকার, তাকে ও তার স্বামীকে
আমরা সন্দেহ করছি। আচ্ছা এখন তাহলে উঠি। কাল দশটা-এগারোটার মধ্যে আপনার
অফিসে যাবো।

গৃহে ফিরে এলে কৃষণ বললে, টিকিট পাওয়া গিয়েছে সামনের সোমবারে ডুন
এক্সপ্রেসে।

আজ বৃহস্পতিবার—হাতে তাহলে এখনো তিনটে দিন-রাত ও একটা বেলা আছে।
ঠিক আছে, তার মধ্যে আশা করছি তপন ঘোষের হত্যার ব্যাপারে একটি হিসেব হয়ত
পেয়েও যেতে পারি।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি কোন একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কাছাকাছি এসে
গিয়েছো।

তোমাকে সেদিন বলছিলাম না কৃষণ, কিরীটী একটা আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে
বললে, রক্তের দাগ একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে মুছে ফেলা যায় না। যতই চেষ্টা করো মুছে
ফেলতে, একটা আবছা দাগ কোথায়ও-না-কোথায়ও থেকে যায়ই। আর সে-রক্তের দাগ
যদি হত্যার হয় তো—

হত্যাকারী সন্তুষ্ট হয়ে যায়! কৃষণ মুদু হেসে বললে।

তাই। কারণ কোন ক্রাইমই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে একেবারে পারফেক্ট হয় না। হতে
পারে না। ছোট একটা কিন্তু কোথাও-না-কোথাও থেকে যাবেই—সেই ‘কিন্ত’ ধরে যদি
এগুতে পারো—ঠিক সত্যে তুমি পৌছে যাবেই।

কিরীটী অমনিবাস (১৩)—১৪

চল, রাত অনেক হয়েছে, এবারে খাবে চল।

হ্যাঁ, চল।

পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ কিরীটী বেরফল।

লালবাজারে প্রতুল সেনের অফিস কামরায় প্রবেশ করে দেখলো প্রতুল সেন তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

আসুন আসুন সত্যসন্ধানী।

কোন খবর আছে?

প্রতুল সেন বললেন, অবিনাশ সেনকে এখুনি আমার লোক নিয়ে আসবে।

প্রতুল সেনের কথা শেষ হলো না, সাব-ইন্সপেক্টর রঞ্জিত মল্লিক অবিনাশ সেনকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

অবিনাশবাবু এসেছেন, স্যার।

বসুন অবিনাশবাবু। প্রতুল সেন বললেন।

অবিনাশ সেন বললেন।

কিরীটী চেয়ে দেখে আগন্তুকের দিকে।

বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বলেই মনে হয় ভদ্রলোকের। রোগা লম্বা চেহারা। গাল দুটো ভাঙা। মাথার চুলে কলপ দেওয়া। স্যত্ত্ব টেড়ি, মাঝখানে সিঁথি। চোখে সোনার চশমা। নির্খুতভাবে দাঢ়ি কামানো। সরু গোঁফ ঠোঁটের উপর। পরনে দামী শাস্তিপূরী ধূতি ও সাদা সিঙ্কের পাঞ্জাবি। সোনার বোতাম। দু'হাতের আঙুলে গোটা দুই সোনার আংটি, তার মধ্যে একটা হীরা। হীরাটি বেশ বড় একটা বাদামের সাইজের, অনেক দাম যে হীরাটার বোঝা যায়।

লোকটি কেবল ধনীই নয়—বনেদী ধনী। শৌখিন প্রকৃতির।

কিন্তু সারা মুখে যেন একটা দীর্ঘ অত্যাচার ও অসংযমের ছাপ।

কি ব্যাপার স্যার—এত জরুরী তলব দিয়ে আমাকে এখানে ডেকে আনলেন কেন? অবিনাশ বললেন।

কোন রকমের ভনিতা না করেই প্রতুল সেন বললেন, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে তপন ঘোষ হত্যা-মামলার ব্যাপারটা!

সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ সেনের চোখের দৃষ্টি যেন সজাগ, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

মামলায় আপনি তো সাক্ষীও দিয়েছিলেন—

আজ্ঞে।

আপনি ওই বাড়িতে মিনতির ঘরে যেতেন? প্রশ্ন করল এবার কিরীটী।

অবিনাশ সেন চকিতে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

প্রতুল সেন বললেন, উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দিন।

কিন্তু স্যার—সে মামলা তো চুকে-বুকে গিয়েছে।

না, যায়নি।

যায়নি! অবিনাশ সেনের কঠে বিস্ময়।

না, তপন ঘোষের হত্যাকারী এখনো সমাজ হয়নি। কিরীটী আবার বললে, কিন্তু আপনি আমার প্রশ্নের এখনো জবাব দেননি।

হ্যাঁ, তা মধ্যে মধ্যে যেতাম।

আপনার সঙ্গে তার পূর্ব-পরিচয় ছিল, তাই না?

পূর্ব-পরিচয় আর কি স্যার—একজন রাববনিতা—

কিন্তু তা তো নয়—

কি বলতে চান স্যার?

মিনতির সঙ্গে আপনার সত্যিকারের কি সম্পর্ক ছিল?

সম্পর্ক আবার কি থাকবে?

আপনি সত্য গোপন করছেন অবিনাশবাবু—

সত্য!

হ্যাঁ, তিনি ঐ লাইনে আসার আগে আপনার স্ত্রী—বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন, দ্বিতীয় পক্ষের—

অবিনাশ সেনের চোয়ালটা ঝুলে পড়লো সহসা। দু'চোখে বোৰা দৃষ্টি।

কি, তাই না?

বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল কুলত্যাগিনী—

কথাটা আপনি আদালতে চেপে গেলেন কেন?

প্রয়োজন হয়নি—অবাস্তর—

না, অনেক সত্য কথা বের হয়ে পড়ার ভয়ে কথাটা চেপে গিয়েছিলেন।

না, না—

তা সেই কুলত্যাগিনী স্ত্রীর কাছে আবার কেন আসতেন মধ্যে মধ্যে? নিশ্চয়ই ভালবাসার টানে নয়!

সত্যিই তাই স্যার। বিশ্বাস করুন ওকে আমি ভুলতে পারিনি।

তা মিনতি যে ওইখানে আছে খবর পেলেন কি করে?

হঠাৎ-ই—মানে অ্যাকসিডেন্টলি!

মানে ওই সব পাড়ায়—ওই ধরনের মেয়েদের কাছে যেতে যেতে!

অবিনাশ সেন চুপ করে থাকেন।

অবিনাশবাবু!

আজ্জে—

আমরা কিন্তু খবর পেয়েছি—

কি—কি খবর পেয়েছেন?

ওই বাড়িতে একটা চোরাই কারবারের আড়া ছিল।

চোরাই কারবার!

সেই কারবারের সঙ্গে আপনি ও মিনতি যুক্ত ছিলেন।

না, না—বিশ্বাস করুন, ওসব ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

কিরীটী মৃদু হাসলো।

অবিনাশবাবু, আপনি জানেন মৃগাল কোথায় ?

না, কেমন করে জানবো !

জানেন না ?

না ।

কিন্তু আমি যদি বলি আপনি জানেন !

মৃগাল পাশের ঘরে থাকত । মিনতির মুখেই আমি শুনেছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে কোন আলাপ-পরিচয় ছিল না, এমন কি আগে তার নামও জানতাম না ।

তপন ঘোষের সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল না ?

না ।

বিজিতবাবুর সঙ্গে ?

না ।

সুদীপবাবুর সঙ্গে ?

না ।

তাহলে ওদের কাউকেই আপনি চিনতেন না বলতে চান অবিনাশবাবু ? কথাটা বলে কিরীটী অবিনাশ সেনের মুখের দিকে তাকাল ।

না । বিশ্বাস করুন, ওদের কাউকেই আমি চিনতাম না ।

পল্টুকে আপনি চিনতেন ?

পল্টু !

হঁয়া, সে তো মধ্যে মধ্যে আপনার দোকানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করত । কথাটা কি অস্বীকার করতে পারেন ?

ওই নামই জীবনে কখনো শুনিনি ।

কিন্তু মিনতি বলেছে—

কি বলেছে মিনতি ?

মধ্যে মধ্যে আপনি ঐ তপনবাবুর সঙ্গে বিশেষ করে দেখা করবার জন্য তার ঘরে রাত্রের দিকে যেতেন ।

মিনতি বলেছে ?

হঁয়া, আরো বলেছে তপন পাশের ঘর থেকে মিনতির ঘরে আসতো মাঝখানের দরজা-পথে—আবার কথাবার্তা হয়ে চলে যেতো ওই দরজা দিয়েই পাশের ঘরে ।

মিনতি বলেছে ওই কথা আপনাকে ! হারামজাদী ! শেষে শব্দটা কাঁপা আত্মোশভরা গলায় অবিনাশ সেন যেন অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন ।

ঠিক আছে অবিনাশবাবু—আপনি যেতে পারেন ।

ধন্যবাদ । অস্ফুট কষ্টে কথাটা বলে অবিনাশ সেন বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে ।

অবিনাশ ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর প্রতুল সেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন ।

কিরীটী অন্যমনক ভাবে পাইপটায় নতুন তামাক ভরছে তখন ।

কি বুঝলেন মিঃ রায় ! প্রতুল সেন প্রশ্ন করলেন ।

গভীর জলের কাতলা । কিরীটী বললে ।

সে তো বোঝাই গেল। নচেৎ সব শ্রেফ অঙ্গীকার করে যেতে পারে!
তবে কাতলা টোপ গিলেছে।

টোপ!

হ্যাঁ, দেখলেন না—বঁড়শী টাকরায় গিয়ে বিঁধেছে!
মিনতি কি সত্যিই ওইসব কথা বলেছে মিঃ রায়?
না।

তবে যে বললেন—

টোপ ফেলেছিলাম একটা শ্রেফ অনুমানের ওপরে নির্ভর করে—দেখলেন তো,
অনুমানটা মিথ্যে হয়নি। এবারে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে মিঃ সেন।
কি বলুন?

মৃগালের ঘরটা এখনো খালি পড়ে আছে—সেই ঘরটার আমাদের প্রয়োজন।
সে আর এমন কঠিন কি!

এখুনি লোক পাঠান—আর একটা টেপ-রেকর্ডার।
পাবেন।

ওই বাড়ির খিড়কির দরজাটা—

তাও খোলা থাকবে। তার আশেপাশে আমাদের একজন প্লেন ড্রেসে ওয়াচারও
থাকবে। কিন্তু এত আয়োজন কিসের?

কিরীটী তখন তার প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিল প্রতুল সেনকে। তারপর বললে, সন্ধ্যার পরই
যেন সব প্রস্তুত থাকে।

কিন্তু আপনি কি মনে করেন মিঃ রায়—
কি?

টোপ গিলবে লোকটা!

গিলবে বলেই আমার ধারণা। আজ না হয় কাল।
বেশ।

এবার আমি উঠবো।

তা কখন দেখা হচ্ছে?

ঠিক রাত সোয়া আটটায়।

অতঃপর কিরীটী বিদায় নিল।

॥ ছয় ॥

সেদিনটা ছিল রবিবার। অফিস আদালত সব বন্ধ।

লালবাজার থেকে বের হয়ে সোজা কিরীটী সোমনাথ ভাদুড়ীর গৃহের দিকে গাড়ি
চলাতে বলল সর্দারজীকে।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। সোমনাথ ভাদুড়ীর ঘর প্রায় খালিই ছিল। একজন
মাত্র মক্কেল ছিল ঘরে। সোমনাথ ভাদুড়ী তার সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সাদর আহান জানালেন সোমনাথ ভাদুড়ী, আসুন রায়মশাই, বসুন—

কিরীটী উপবেশন করবার পর সোমনাথ ভাদুড়ী তাড়াতাড়ি শেষ মক্কেলটিকে বিদায় করলেন।

আপনাকে ফোন করেছিলাম বাড়িতে—আপনার স্ত্রী বললেন আপনি সকালেই বের হয়েছেন। ভাদুড়ী বললেন।

হ্যাঁ, লালবাজারে গিয়েছিলাম।

আজকের সকালবেলার কাগজ পড়েছেন রায় মশাই?

না, সময় পাইনি। তাছাড়া আমি সাধারণত কাগজ দুপুরে বিশ্রামের সময় পড়ি।

সুদীপ রায়—

কি হয়েছে সুদীপের?

মে খুন হয়েছে—

খুন! কে বললে?

সংবাদপত্রে বের হয়েছে। তার গুলিবিন্দ রক্তাঙ্গ মৃতদেহটা রেল লাইনের ধারে গতকাল সকালে পাওয়া গিয়েছে।

তার মানে যেদিন সন্ধিয়া সে আপনার এখানে এসেছিল, সেইদিনই রাত্রে সে খুন হয়েছে!

হিসাবমত তাই দাঁড়াচ্ছে। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন।

কিন্তু প্রতুলবাবু তো কিছু বললেন না!

বোধ হয় ব্যাপারটা এখনো তিনি শেঁরেননি।

হয়ত তাই, কিন্তু লোকটা যে ওই সুদীপ রায়ই—সেটা জানলেন কি করে?

কাগজে অবিশ্য বের হয়েছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ আবিস্কৃত হয়েছে এবং মৃতের মুখটা কোন ধারানো অঙ্গের সাহায্যে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। আইডেন্টিফাই নাকি করেছে আজই তার স্ত্রী রমা।

থবরের কাগজে কি সংবাদ বের হয়েছে?

না। আসলে আমিও সংবাদপত্রে নিউজটা পড়িনি রায়মশাই—আজ সকালে একটা ফোন পাই—

ফোন!

হ্যাঁ, অঞ্জতনমা এক নারীর কাছ থেকে। সে-ই সংবাদটা দেয়। সংবাদটা দিয়েই সে ফোনের কানেকশন কেটে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ফোন করি সংবাদটা দেবার জন্য।

ফোনে ঠিক কি বলেছিল আপনাকে সেই মহিলা?

বলেছিল রেল লাইনের ধারে যে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছে সেটা সুদীপ রায়ের।

যিনি ফোন করেছিলেন তাঁর কঠস্বর আপনি চিনতে পারেননি।

না।

ঠিক আছে—বলতে সামনেই টেবিলের উপর রক্ষিত ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কিরীটী ডায়েল করল লালবাজারে।

কিন্তু প্রতুল সেনকে তার অফিসে পেল না।

কাকে ফোন করছিলেন? সোমনাথ ভাদুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রতুল সেনকে, পাওয়া গেল না—অফিসে নেই।

আচ্ছা রায়মশাই, কে আপনাকে ফোন করেছিল বলুন তো?

মনে হয় হত্যাকারীর সহকারণি এবং হত্যাকারীরই নির্দেশে?

কিন্তু আমাকে সংবাদটা দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

ভাদুড়ী মশাই, হত্যাকারী বরাবরই সজাগ ছিল। সুদীপবাবু যে আপনার কাছে এসেছিলেন তাও সে জানত। তাই সে আপনাকে জানিয়ে দিল—ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সুদীপবাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

তার মানে—যাতে সে ভবিষ্যতে আরো কিছু প্রকাশ করতে না পারে!

হ্যাঁ—সেই সন্দেহেই তাকে এ পৃথিবী থেকে সরানো হয়েছে। তবে একটা ব্যাপার সুদীপবাবুর মৃত্যুতে পরিষ্কার হয়ে গেল—

কোন্ ব্যাপারের কথা বলছেন?

তপন ঘোষের হত্যার যত্ত্বান্তর মধ্যে সুদীপবাবু না থাকলেও তিনি ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিলেন।

আমি কিন্তু একটা ব্যাপার বুবতে পারছি না রায়মশাই।

সুদীপবাবু এগিয়ে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেন সাক্ষী দিলেন তাই বোধ হয়!

হ্যাঁ। সে যদি যত্ত্বান্তর মধ্যে ছিলই—

সুদীপবাবুর মনের মধ্যে একটা ভয় চুকেছিল।

ভয়! কিসের ভয়?

তার নিজের প্রাণের ভয়।

প্রাণের ভয়!

হ্যাঁ। তার মনে ভয় চুকেছিল, বিজিত মিত্র যদি প্রাণের ভয়ে শেষ পর্যন্ত অ্যাফ্রিডার হয়ে সব কিছু প্রকাশ করে দেয়—

তাই সে সাক্ষী দিয়ে বিজিত মিত্রকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বলতে চান?

হ্যাঁ—বিজিত মিত্রকে আইন-আদালতের এক্সিয়ারের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

কেমন যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার রায়মশাই। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন দু' আঙুলের মাঝখানে মোটা পেনসিলটা নাচাতে নাচাতে।

একটা ব্যাপার কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল ভাদুড়ী মশাই। কিরীটী বললে।

কি বলুন তো? সোমনাথ ভাদুড়ী তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

তপন ঘোষ, বিজিত মিত্র ও সুদীপ রায় সব একদলের এবং সত্যিই ওরা পরম্পর কোন দুষ্কর্মের সঙ্গী ছিল পরম্পরের।

চোরাকারবার!

হতে পারে। আমি কিন্তু ব্যাপারটা পূর্বাহ্নেই অনুমান করেছিলাম—তাই আজ ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করে এসেছি।

ফাঁদ।

হ্যাঁ—আর আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো আজই রাত্রে ফাঁদে নাটোর গুরুকে আটকা পড়তে হবে।

কার কথা বলছেন?

রহস্যের মেঘনাদ যিনি—তারই কথা বলছি। ব্যাপারটা সত্যি কথা বলতে কি, আমি কিন্তু এত সহজে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। ভাবতে পারিনি হত্যাকারী এত বড় একটা ভুল তত্ত্বাদ্বীপ মাথায় করে বসবে বা করে বসতে পারে।

তাহলে সুদীপবাবুর নিহত হওয়াটা এ ক্লিং ইন ডিসগাইজ বলুন রায়মশাই, সোমনাথ বললেন।

তাই।

কিরীটির অনুমান যে মিথ্যা নয় সেটা ওই রাত্রেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

ব্যবস্থামত রাত্রি এগারোটা নাগাদ কিরীটি ও প্রতুল সেন এসে খড়কির দরজাপথে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে খোলা বাথরুমের দরজা দিয়ে মৃগালের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে পূর্ব হতেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ছিল প্রতুল সেনের এক বিশ্বস্ত অনুচর।

ফিসফিস করে প্রতুল সেন শুধালেন, কেউ এসেছে মৃগালের পাশের ঘরে? না, স্যার।

মিনতি আছে তো ঘরে?

আছে।

প্রার্থিত আগন্তুক ঠিক এল রাত বারোটায়।

টুক টুক করে পাশের ঘরের দরজায় নক করলো।

দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল।

তাদের মধ্যে সেরাত্রে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল, পরে টেপ থেকেই তা শোনা যায়। কে? মিনতির প্রশ্ন।

আমি।

তুমি? আবার কেন তুমি এসেছো?

তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে, চল আমার সঙ্গে—

না।

চল।

না, কিন্তু এখানে আর তুমি থেকো না—চলে যাও, আমি টের পেয়েছি পুলিস ছদ্মবেশে এ বাড়ির আশেপাশে ওৎ পেতে রয়েছে।

পুলিসের সাধ্যও নেই আমাকে ধরে।

বিশ্বাস করো, আমি সত্যি বলছি, আর তুমি হয়ত একটা কথা জানো না—
কিরীটী রায়—

সেই ছাঁচের ব্যাটা চামচিকে—তার সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছে। চল—আর দেরি করো না।

তুমি আমার কথা শোন। আমি বলছি তুমি চলে যাও।

একা চলে যাবো—তাই কি হয়, তোমাকে একা ফেলে তো যেতে পারি না।

ওগো—

তারপরই একটা গৌঁ গৌঁ শব্দ।

কিরীটী পাশের ঘরে প্রস্তুতই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরদা তুলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে, তার পশ্চাতে প্রতুল সেন, তাঁর হাতে ধরা পিস্তল।

বলাই বাহ্য, আততায়ী পালাবার পথ পায় না। যে দুটো হাত তার মিনতির গলায় ফাঁস পরিয়েছিল—তার সেই হাতের মুষ্টি আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় প্রতুল সেনের হাতে ধরা উদ্যত পিস্তলটার দিকে। লোকটার পরানে পাজামা ও গায়ে কালো শার্ট। মুখে চাপদাড়ি।

কিরীটী কঠিন কঠিন বললে, মিঃ সেন, ওই তপন ঘোষ ও সুনীপের হত্যাকারী—অ্যারেস্ট করুন।

প্রতুল সেন ডাকলেন, বীরবল, ওর হাতে হ্যান্ডকাপ লাগাও।

বীরবল পশ্চাতেই ছিল, হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এলো। লোকটার হাতে হাতকড়া পরাল।

মিনতিকেও ছাড়বেন না। ওর হাতেও হ্যান্ডকাপ পরান। আর এক জোড়া আনেননি?

বীরবলের কাছে আর এক জোড়া হাতকড়া ছিল; সে সেটার সন্ধ্যবহার করল।

ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে বাড়ির অনেকে সেখানে এসে ভিড় করে।

তারা ব্যাপার দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত।

কিরীটী এবার বললে প্রতুল সেনের দিকে তাকিয়ে, মহাপুরুষটিকে চিনতে পারলেন মিঃ সেন?

না তো।

অবিনাশ—

অবিনাশ সেন!

হ্যাঁ, দাড়িটা উৎপাটন করুন—বেশি লাগবে না—কারণ স্প্রিট গামের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—উৎপাটন করলেই আসল চেহারাটা প্রকাশ পাবে।

কিরীটীর কথা মিথ্যে নয় দেখা গেল।

অবিনাশ সেনই।

সেইদিন রাত্রিশেষে লালবাজারে প্রতুল সেনের অফিস-কক্ষে—

কিরীটীকে ফিরে যেতে দেননি প্রতুল সেন। টেনে এনেছিলেন সঙ্গে করে।

প্রতুল সেন বলছিলেন, ব্যাপারটা কি আপনি বুঝতে পেরেছিলেন আগেই—মানে আসল হত্যাকারী কে?

বুঝতে পেরেছিলাম প্রথমেই বললে ভুল হবে—তবে কিছুটা অনুমান করেছিলাম। কি?

বুঝতে পেরেছিলাম তপন ঘোষ, বিজিত মিত্র ও সুনীপ রায়—আপনার কাহিনীগুলির একবাকের পাথী—বার্ডস অফ দি সেম ফেদার। আর এও বুবেছিলাম ওরা যন্ত্র মাত্র, আসল যন্ত্র ওদের পশ্চাতে কেউ ছিল। কিন্তু কে সে? একটা ধাঁধা থেকে গিয়েছিল। তারপর মিনতির সঙ্গে দেখা করতেই ব্যাপারটাকে ঘিরে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো।

কি রকম?

বিজিত মিত্রের স্তু দেবিকার পরিচয় দিয়ে ভাদুড়ী মশাইয়ের পায়ে যে গিয়ে পড়েছিল
সে আসলে দেবিকা নয়। বিজিত মিত্রের স্তু নেই।

প্রতুল সেন বললেন, কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি। বিজিত মিত্রের কোন স্তুই ছিল না।

তবে কে সে?

সে ওই মিনতি।

মিনতি!

হ্যাঁ। মনে আছে আপনার, অমিয়বাবুর সঙ্গে একটি মেয়ে ঘোমটা মাথায় এসে দেখা
করেছিল?

মনে আছে।

সেই মেয়েটি ও দেবিকা নাম ধরে যে মেয়েটি ভাদুড়ী মশাইয়ের কাছে গিয়েছিল তারা
এক ও অকৃত্রিম।

ও-ই মিনতি কি করে বুঝলেন?

ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেইদিনই, যেদিন আমি আর ভাদুড়ী
মশাই মিনতির সঙ্গে দেখা করতে যাই। মিনতির হাতে উক্ষিতে লেখা ‘এম’ অক্ষরটা
দেখে। একবার ঘোমটা খুলে, একবার ঘোমটা দিয়ে গিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে আমি
অনুমান করছিলাম—মিনতি ওই দলে আছে। আর তাই আজ রাত্রে ফাঁদটা পেতেছিলাম
আপনার সক্রিয় সাহায্যে।

আচ্ছা সেদিন রাত্রে কি ঘটেছিল বলে আপনার মনে হয় মিঃ রায়?

অনুমানে মনে হয়—ওই অবিনাশ সেনই সে-রাত্রে পাশের ঘর থেকে মাঝের দরজা
খুলে ওই ঘরে ঢুকে তপন ঘোষকে হত্যা করে। তারপর এক ঢিলে দুই পাখী মারার ফ্ল্যান
করে বিজিত মিত্রের মাথায় আঘাত করে এবং তার হাতে পিষ্টলটা খুঁজে দিয়ে পালিয়ে
যায়।

আচ্ছা মিনতি যদি ওই দলেরই, তবে সে অত কথা আপনাকে বললে কেন?

তার উপর থেকে সন্দেহটা দূর করবার জন্য। কারণ সে আমাকে দেখে আমার
কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছিল, আদালতে যে মামলা শেষ হয়ে গিয়েছে সেটা আমার
বিচারে শেষ নিষ্পত্তি নয়। এবারে হ্যাত কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরবে। তাই অত কথা
সে বলে আমাদের। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি তখন তার ওই সব কথা তার বিরুদ্ধে
আমার মনে সন্দেহ জাগাবে।

বিজিত মিত্র কি হলো?

সন্তুষ্ট মৃত্যুভয়ে সে আঘাতগোপন করে আছে।

আর মৃগাল?

মনে হয় মৃগালকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এরপর আমি—

নিরস্ত হবেন না, এই তো, তা খুঁজন—যদি কখনো খুঁজে পান তাকে। কথাটা বলে
কিরীটী মৃদু হাসলো।

ବୁ-ପିନ୍ଟ

pathinagar.net

॥ এক ॥

নীল রূমাল হত্যা-রহস্যের উপর যবনিকাপাত করবার পর দুটো দিনও কিরীটি একটু
হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে পারে না। আবার দিল্লীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দণ্ডের সেক্রেটারী
মিঃ সিংয়ের কাছ থেকে জরুরী ট্রাঙ্ক-কল এলো।

মিঃ রায়—

স্পিকিং।

মিঃ রামস্বামীর সেক্রেটারী আমি—সিং।

নমস্তে, নমস্তে—বলিয়ে সিং সাৰ্ব—

আমাদের সেই ব্যাপারটার—মিঃ রামস্বামী আপনাকে তাগিদ দিতে বললেন—কবে
আসছেন বলুন—কাল-পৰশু—প্লেনেই চলে আসুন।

কিরীটি বললে, আপনাদের তো এখন পার্লামেন্টের সেসন চলছে। সেবারেই প্লেনের
টিকিট পেতে আমায় গলদার্ঘ হতে হয়েছিল; তাছাড়া—

বলিয়ে ?

এবাবে আৱে প্লেনে যাবো না ভাৰছি।

কেন, প্লেনেই তো আসা ভাল—

না, পৰে বলবো—আমি ট্ৰেনেই যাবো।

কিন্তু—

ভয় নেই আপনার মিঃ সিং, আমি দুর্ভিন দিনের মধ্যেই ওখানে হাজিৰ হবো বলবেন
আপনার মিনিস্টার সাহেবকে—হয়ত অন্য নামে—অন্য পৰিচয়েও যেতে পারি—

বাট হোয়াই।

কিরীটি হেসে বললে, পৰে জানতে পারবেন। আছা তাহলে ঐ কথাই রইলো।

কিরীটি ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

কৃষ্ণ পাশের সোফায় বসে একটা বই পড়ছিল, শুধাল, কার ফোন গো?

দিল্লীর স্বরাষ্ট্র দণ্ডের সেক্রেটারী মিঃ সিংয়ের। দিল্লী যাবার জন্য জরুরী পৱেয়ানা।

সেই দলিলের ব্যাপারটা ?

কিরীটির সিগার কেস থেকে একটা সিগার তুলে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ কৰতে
কৰতে বললে, মন্ত্রীমশাই খুব বেকায়দায় পড়েছেন।

কিন্তু মন্ত্রীমশাইয়ের অফিসের প্রাইভেট নিজস্ব চেম্বারের আয়ৱন সেফ থেকে
গোপনীয় ডকুমেন্টস-এর ব্লু-প্রিন্ট চুৰি যাইছে বা কি কৰে?

শুধু কি চুৰি—একেবাবে বিদেশে পাচার!

সত্যি সত্যিই পাচার হয়েছে নাকি?

নিঃসন্দেহে।

যাইছে বা কি কৰে?

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা থাকলেই হয়। মীরজাফর—জগৎ শেষ—উমিঁচাদদের
বংশধরেরা তো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি! তারা এখনো বহাল তবিয়তে বিচরণ করে
বেড়াচ্ছে।

কি জগন্য মনোবৃত্তি—নিজের দেশের এত বড় শক্রতা—

বিবেক বা দেশপ্রেম বলে কোন কিছুর বালাই ওদের আছে নাকি?
কবে যাবে?

দেখি কাল না হয় পরশু যেদিন টিকিট পাওয়া যায়।

তা ট্রেনে যাচ্ছা কেন, প্লেনেই তো—

না। প্লেনে যাওয়া মানে সকলের নজরে পড়া।

বাইরে শীতের রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। দিনকয়েক আগে দু'দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায়
শীতটা যেন বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে কনকনে হাড়-কাঁপানো হাওয়া সর্বক্ষণ।

কৃষ্ণ বই থেকে মুখ তুলে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বলে, এখানেই এত শীত, দিল্লীতে
যে কি শীত পড়েছে, সেটা বেশ ভাল ভাবে বুঝতে পারছি। কতদিন থাকবে দিল্লীতে?

কেন বল তো? কিরীটী কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল।

ভাল লাগে না তুমি না থাকলো।

বেশ তো চল না তুমি—ক'টা দিনের জন্য আমার সঙ্গে ঘুরে আসবে।

না।

না কেন? ভাবছি এবারে দেবেশের ওখানে গিয়েই উঠবো।

সরকারী গেস্ট হয়ে যাচ্ছা, হয়ত তারা তোমার থাকবার অন্য ব্যবস্থা করবে—কোন
হোটেলে বা কোন এম. পি. পাড়ার কোন কোয়ার্টারে—তাছাড়া তুমি ব্যস্ত থাকবে।

তা করলেই বা। আমি যদি দেবেশের ওখানে থাকি, ওদের কি আপত্তি থাকতে পারে?
চল, যাবে?

না, এবার থাক—তুমি বরং সুব্রতকে নিয়ে যাও।

তাকে তো নিয়ে যাবেই—একা যাচ্ছে কে? কে জানে কতদিন থাকতে হবে সেখানে।
কারণ জালটা বহুদূর বিস্তৃত বলেই আমার মনে হচ্ছে।

কি করে বুঝলে?

সেবারে মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সেই রকমই মনে হয়েছিল।

দিন-দুই পরেই একটা ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্টে দুটো বার্থ পাওয়া গেল দিল্লী কালকা
মেলে।

কৃষ্ণ হাওড়া স্টেশনে এসে ওদের ট্রেনে তুলে দিল। ট্রেন ছাড়ার আগে সুব্রত বললে,
তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে কৃষ্ণ।

হ্যাঁ—হয়ত দিবারাত্রি এখানে ওখানে ছোটাছুটি করবে, না হয় মুখ গোমড়া করে
পাইপ টানবে আর ঘরের মধ্যে পায়চারি করবে—ওকে তো জানি।

কিরীটী হেসে ফেলে।

হাসছো কি, মাথায় যখন তোমার রহস্যের ভূত চাপে, আয়নায় নিজের মুখের

ଚେହରାଟା ତୋ ଆର କଥନୋ ଦେଖନି । ଦେଖଲେ ବୁଝତେ—କୃଷ୍ଣ ବଲେ ।

କିରୀଟୀ ହାସତେ ହାସତେ ବଲେ, କି ରକମ ଦେଖାଯ ବଲ ତୋ ! ସୁକୁମାର ରାଯେର ହିଁକୋମୁଖେ ହ୍ୟାଙ୍ଗାର ଘତ ?

ସାବଧାନ କୃଷ୍ଣ, ସୁବ୍ରତ ବଲେ ଓଠେ, କଥାଟା ଓର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଦେର କାନେ ଗେଲେ ତୁମି ଓର ଅର୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବଲେଓ ରୋଯାଏ କରବେ ନା ।

କୃଷ୍ଣ ହାସତେ ହାସତେ ବଲେ, ନା କରେ କରକ, ତାଇ ବଲେ ଯା ସତି ତା ବଲବୋ ନା ?

ବୁଝଲି ସୁବ୍ରତ, ଏକେଇ ବଲେ ଗେଂଗୋ ଯୋଗୀର ଭିଥ୍ ମେଲେ ନା ।

ଥାକ ଥାକ—ହେଁଛେ, ଆମାକେ କିନ୍ତୁ ରୋଜ ଏକବାର କରେ ଟ୍ରାଙ୍କ-କଳ କରବେ ।

ଘୟା ଆଙ୍ଗି ପ୍ରବୀ !

ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାର ସନ୍ତା ପଡ଼ିଲୋ ।

ସୁବ୍ରତ ବଲେ, କି ବ୍ୟାପାର—ଆମାଦେର କାମରାଯ ଆର ଦୁଇନ ସହ୍ୟାତ୍ମୀର ଏଥନୋ ଦେଖା ନେଇ !

କିରୀଟୀ ବନଲେ, ବୋଧ ହୁଯ କ୍ୟାନମେଲ କରେଛେ ତାଦେର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ସନ୍ତା ପଡ଼ିଲୋ ଏଇ ସମୟ—

କୃଷ୍ଣ ନେମେ ପଡ଼—ସୁବ୍ରତ ବଲଲେ ।

କୃଷ୍ଣ ନେମେ ଯାବାର ଜନ୍ୟ ଉଠେ ଦାଁଡିଯେ କିରୀଟୀର ଦିକେ ତାକାଲ ।

କିରୀଟୀ ବଲେ ଓଠେ, କି ହଲୋ, ଚୋଖ ଛଲଛଲ କରଛେ କେନ ?

ଇଯାର୍କି କରତେ ହବେ ନା—କିରୀଟୀର ଦିକ ଥେକେ ମୁଖ୍ୟଟା ସ୍ଥାରେ ନିଯେ କୃଷ୍ଣ କାମରା ଥେକେ ବେର ହେଁ ଯାଯ—ଓରାଓ ଉଠେ କରିବୋ ଦିଯେ କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଗୋଯ ।

କୃଷ୍ଣ ନେମେ ଗେଲ ।

ଓରା ଦୁଇନେ ଜାନାଲା—ପଥେ ପ୍ଲ୍ୟାଟଫର୍ମେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥାକେ ।

ଗାଡ଼ି ଚଲତେ ଶୁରୁ କରେଛେ ତଥନ—

କ୍ରମେ ଜନକୋଲାହଳ ମୁଖରିତ ଆଲୋକିତ ପ୍ଲ୍ୟାଟଫର୍ମଟା ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ମିଲିଯେ ଗେଲ । ନାନା କଟେଇ ନାନା ଭାଷାର ମିଶ୍ର ଏକଟାନା ଗୁଞ୍ଜନଟା ଏତକ୍ଷଣ ଯା କାନେର ଉପର ଏସେ ଆଛିଲେ ପଡ଼ିଲି, ତାଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁତିର ଚୌକାଟା ପାର ହେଁ ଗେଲ ।

ଏଥନ କେବଳ ବିର୍ସିପିଲ ଇମ୍ପାଟେର ଲାଇନଗୁଲୋ ଇଯାର୍ଡେର ଉଜ୍ଜୁଳ ଆଲୋଯ ଚିକ ଚିକ କରେ—ଏକ-ଆଧଟା ଟ୍ରେନ ଏଦିକ ଓ ଦିକ ଯାତାଯାତ କରଇ—ଚାକାର ଶବ୍ଦ—ଇଞ୍ଜିନେର ଶବ୍ଦ ।

ଦୂରେ ଦୂରେ ଇଯାର୍ଡେର ଲାଇଟଗୁଲୋ ଆଲୋ ଛାଡ଼ାଇଁ ।

ଓରା ଆବାର ଏକସମୟ କରିବୋ ଦିଯେ ନିଜେର କାମରାର ଦିକେ ଅଗସର ହଲୋ । ଦରଜାଟା ଟେନେ ଦିଯେ ଗିଯେଛିଲ ସୁବ୍ରତ; ଏଥନ ଦେଖଲେ ଦରଜାଟା ଖୋଲା ଆର ନୀଚେର ଏକଟା ବାର୍ଥେ ବସେ ଆଛେ ଦୁଇନ ।

ଅତି ଆଧୁନିକା ଏକଟି ତରଣୀ । କୁପ ଯତ ନା ଥାକ, କୁପେର ଜୌଲୁସକେ ବାଡ଼ିଯେ ତୋଲାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଯ ପ୍ରସାଧନ ଓ ପୋଶାକେର ପାରିପାଟ୍ୟଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୃଷ୍ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ।

ପରନେ ଦାମୀ ସିଙ୍କେର ଶାଡ଼ି—ଡିମ ମେରଳ କାଲାରେର ଅନୁରାପ ଜାମା ଗାୟେ—ବଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା ହାତା । ହାତେ ଛ'ଗାଛି କରେ ସୋନାର ଚାଡ଼ ଆର ରିସଟ୍ୟୁଅଚ । ବୟସ ତିରିଶେର ନୀଚେ ନୟ ବଲେଇ ମନେ ହେଁ । କପାଳେ ଏକଟା ସିନ୍ଦୁରେର ବା କୁମକୁମେର ଟିପ ଥାକଲେଓ ସିଥିତେ

এয়েতির কোন চিহ্ন নেই অথচ দেখলে বাঙালি বলে মনে হয়। হাতে ধরা একটা ইংরাজী ফিল্ম ম্যাগাজিনে দৃষ্টিপাতে নিবন্ধ। পাশে একটা হ্যান্ডব্যাগ পড়ে আছে। ম্যানিকিওর করা আঙুলের দীর্ঘ নখগুলো। পাশে সামান্য ব্যবধানে বসে যে ভদ্রলোকটি—পরনে তার দামী গরম সুট। দাঢ়ির্ণোফ নিখুঁতভাবে কামানো। বেশ হাষ্টপুষ্ট লম্বা চেহারা। চোখে চশমা।

মুখটা গোলগাল। হাতে জুলন্ত একটা সিগারেট। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চলিশের মধ্যেই বলে মন হয়। পায়ের নীচে গোটা-দুই সুটকেস। একটা বড় ফ্লাক্স ও ছোট একটা বাস্কেট।

ওদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে মহিলাটি তাকালেনও না—কিন্তু পাশের ভদ্রলোকটি চোখ তুলে ওদের দিকে তাকালেন এবং হিন্দিতেই বললেন, আপলোগ এই কামরামে যা রহে হৈঁ?

সুব্রত বললে, জী!

আমার নাম রঞ্জিং কাপুর—কানপুর যাচ্ছি—আপনারা কতদূর? পুনরায় প্রশ্ন করলো।

কিরীটী এবারেও কোন কথা বললে না—পাশে একটা বই ছিল, সেটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণ।

সুব্রতই আবার বললে, জী দিল্লী—

রঞ্জিং কাপুর আবার বললেন, আমার কানপুরে ট্যানারীর বিজনেস আছে—তা আপনারা দিল্লীতে কি বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি?

সুব্রত বললে, হ্যাঁ।

রঞ্জিং কাপুর বললেন, কিন্তু এখন তো ওদিকে ভীষণ ঠাণ্ডা।

তা তো হবেই—

তা দিল্লীই যাবেন—না আরো দূরে?

দেখি—এখনো কিছু ঠিক নেই। বেড়াতে বের হয়েছি।

আর উনি? কিরীটীর দিকে ইঙ্গিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন রঞ্জিং কাপুর।

উনিও আমার সঙ্গে চলেছেন।

পার্শ্বে উপবিষ্ট মহিলা কিন্তু একবারও তাকালেন না ওদের দিকে। আপনমনে বই পড়েই চলেছেন, যেন ওদের কথাবার্তা তাঁর কানে প্রবেশই করছে না।

সুব্রতই আবার জিজ্ঞাসা করে, উনি?

উনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না—তবে আমার পরমাঞ্চায়া অর্থাৎ আমার স্তুর বহিন।

কিরীটী ঐ সময় সুব্রতের আলাপে বাধা দিয়ে মৃদুকষ্টে ডাকল, এই সু—

কি রে?

একটু চলে আয় না।

এই যে—

সুব্রত উঠে দাঢ়িয়ে উপরের বাক থেকে বাস্কেটটা নামিয়ে তার থেকে দুটো প্লাস, সোজার বোতল ও শুল্ক স্বাগলারের শিশিটা বের করল।

দুটো প্লাস হইক্ষি ঢেলে সোজা মিশিয়ে একটা প্লাস কিরীটীকে দিল, অন্যটা নিজে নিল। তারপর হঠাৎ কি ভেবে কাপুরের দিকে তাকিয়ে বললে, মিঃ কাপুর—লাইক টু

ହ୍ୟାଭ ସାମ ଡିକ୍ଷ !

ଅଫ କୋର୍ସ !

ସୁବ୍ରତ ଆର ଏକଟା ପ୍ଲାସ ବେର କରଛିଲ କିନ୍ତୁ ମିଃ କାପୁର ନିଜେଇ ତାର ବାକ୍ସେଟଟା ଟେନେ ଖୁଲେ ଏକଟା ପ୍ଲାସ ଓ ଭ୍ୟାଟ ୬୯-ଏର ବୋତଳ ବେର କରଲେନ, ତାରପର ପ୍ଲାସଟା ସୁବ୍ରତର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଦିଲେନ ।

ସୁବ୍ରତ କାପୁରେର ହାତ ଥେକେ ପ୍ଲାସଟା ନିଯେ ଛଇକି ଢାଲିତେ ଢାଲିତେ ପ୍ଲାସଟା କାପୁରେର ଦିକେ ତୁଲେ ଶୁଧାଲେ, ଦିସ୍ ମାଚ !

ଇଯେସ ।

ହାଉ ମାଚ ସୋଡା ?

ଏକଟୁ ବେଶୀ ଦେବେନ ।

ସୁବ୍ରତ ପ୍ଲାସେ ସୋଡା ମିଶିଯେ ପ୍ଲାସଟା ଏଗିଯେ କାପୁରେର ଦିକେ ।

॥ ଦୁଇ ॥

କାପୁର ବୁକପକେଟ ଥେକେ ଏକଟା ସିଗାରେଟ କେସ ବେର କରଲେନ, ତାରପର ନିଜେ ଏକଟା ସିଗାରେଟ ନିଯେ କେସଟା ସୁବ୍ରତର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଧରଲେନ, ସିଗ୍ରେଟ—

ନୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ।

ହୋୟାଟ ଆୟାବାୟଟ ଇଉ ? କାପୁର କେସଟା ଏବାରେ କିରୀଟିର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଧରଲେନ ।

ନୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ।

ଆପନାର ଚଲେ ନା ?

ଚଲେ, ତବେ ସିଗାର—ବଲେ କିରୀଟି ପକେଟ ଥେକେ ଏକଟା ଚାମଡ଼ାର ସିଗାର କେସ ବେର କରେ ତା ଥେକେ ଏକଟା ସିଗାର ନିଯେ ଅଗ୍ରିମଂଯୋଗ କରତେ ଉଦ୍ୟତ ହଲୋ । ତଥିନୋ ସେ ତାର ପ୍ଲାସେ ଓଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ କରନେଇ ।

ଭଦ୍ରମହିଳା କିନ୍ତୁ ଏକଇ ଭାବେ ତାର ହାତେର ମ୍ୟାଗ୍ଗାଜିନ୍ଟା ପଡ଼େ ଚଲେଇଲେନ । ଏତକ୍ଷଣ ଓଦେର ଦିକେ ତାକାନ୍ତିନି ।

ହଠାତ୍ କିରୀଟି ଭଦ୍ରମହିଳାର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲେ, ଆମରା ଆପନାର କୋନ୍ ଅସୁବିଧା କରାଇ ନା ତୋ ?

ଭଦ୍ରମହିଳା ଚୋଖ ତୁଲଲେନ—ଚୋଖେ-ମୁଖେ ଏକଟା ଚାପା ହାସିର ବିଦ୍ୟୁତ ଯେନ । ନା, ନା—କ୍ୟାରି ଅନ !

ପରିଷକାର ଶୁଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀ ଓ ବାଂଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ।

ବାଂଲା ଶୁନେଇ କିରୀଟିର ମନେ ହଲୋ ଭଦ୍ରମହିଳା ବାଙ୍ଗାଲୀ ।

ତାହାଡ଼ା ଓସବେ ଆମି ଖୁବଇ ଅଭ୍ୟନ୍ତ—ଆବାର ହାସଲେନ ଭଦ୍ରମହିଳା ।

ହଠାତ୍ ସୁବ୍ରତର କି ହଲୋ, ବଲଲେ, କିନ୍ତୁ କେମନ ଯେନ ବିକ୍ରି ଲାଗଛେ—

ନା, ନା ତାତେ କି ହେଁବେ ? ଆପନାଦେର କିନ୍ତୁ କୋନ ପ୍ରୋଜନ ନେଇ—ଆମାଦେର ଐ କାପୁର ସାହେବଟିର ଜନ୍ୟ ଆମରା ଓ-ବ୍ୟାପାରେ ରୀତିମତ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ହେଁ ଗିଯେଛି—ଖିତକଟେ କଥାଗୁଲୋ ବଲଲେନ ଭଦ୍ରମହିଳା; କିନ୍ତୁ ଚୋଖେ-ମୁଖେ ତୀର ମେଇ ଚାପା ହାସିର ବିଦ୍ୟୁତ ଖେଳଛି ।

ইয়েস—শকুন্তলা ইজ কোয়ায়েট হ্যাভিচুয়েটেড! কোন উন্নাসিকতা নেই—হাজার হলেও এ যুগের তরঙ্গী তো। হাসতে হাসতে বললেন মিঃ কাপুর।

একটু কটাক্ষ হেনে শকুন্তলা বললেন, এ যুগের তরঙ্গীদের যেন একেবারে সব আদি-অন্ত জেনে ফেলেছেন মশাই—

পরিষ্কার বাংলা—পরিষ্কার উচ্চারণ শকুন্তলার।

কিরীটী বললে সকৌতুকে, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন।

মানে! বাংলা বলবো না কেন? আমি তো বাঙালী—

হ্যাঁ মশাই—মিঃ কাপুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, একেবারে সেন্ট পারসেন্ট বাঙালী—আপনি—

হ্যাঁ, ওর ডগুটিও তাই—বাঙালী মেয়েই বিয়ে করেছি।

তাই বলুন! কিরীটী বলে।

কিরীটী মনুহেসে বলে, তাহলেও খারাপ লাগছে মিঃ কাপুর, আমরা ড্রিস্ক করছি আর উনি চুপচাপ বসে আছেন—মিস—

আমার নাম শকুন্তলা চ্যাটার্জী। শকুন্তলা বললেন, আমার ফ্লাঙ্কে গরম কফি আছে, আমি বরং কফি থাছি—বলতে বলতে শকুন্তলা ফ্লাঙ্কটা হাত বাঢ়িয়ে তুলে নিলেন।

ত্রুম্প চারজনের মধ্যে বেশ গুরু জমে ওঠে।

হঠাতে একসময় শকুন্তলা কথার মধ্যে বলে উঠলেন, আচ্ছা ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মিঃ রায়—আপনি কি এসময় সত্তি সত্তিই প্রেফ বেড়াতেই যাচ্ছেন দিল্লীতে?

কেন বলুন তো? একটু কৌতুকের দৃষ্টিতেই যেন তাকাল প্রশ্নটা করে কিরীটী শকুন্তলার মুখের দিকে।

কারণটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

কেন? বিশ্বাস করতে পারছেন না কেন?

আপনার মত লোক বিনা প্রয়োজনে এই প্রচণ্ড শীতে দিল্লীতে চলেছেন—

আমার মত লোক? আপনি আমাকে চেনেন নাকি? কিরীটী তাকাল কথাটা বলে শকুন্তলার মুখের দিকে। তার দু'চোখে শাণিত দৃষ্টি—

আপনাকে কে চেনে না বলুন—কিরীটী রায়কে চেনে না—তারপরই একটু থেমে মনু হেসে শকুন্তলা বললেন, দেখেই আপনাকে আমি চিনেছিলাম—

কিরীটী প্রত্যুষের নিঃশব্দে মৃদু হাসলো!

কিন্তু সত্তি বলুন না—কেন এসময় দিল্লী যাচ্ছেন?

অনুমান করুন না।

কেমন করে অনুমান করবো?

কেন, পারেন না?

হঠাতে যেন একটু থতমত খেয়েই শকুন্তলা কিরীটীর মুখের দিকে মুচুর্তের জন্য তাকালেন, তারপর মনু হেসে বললেন, পারছি না।

থট-রিডিং করুন।

ও বিদ্যে আমার জানা নেই, আপনার আছে নাকি? সকৌতুকে তাকালেন শকুন্তলা

କିରାଟିର ମୁଖେର ଦିକେ । ତୀର ଦୂଇ ଚୋଥେ ସେଇ ଚାପା ହାସିର ବିଦ୍ୟୁତ ଯେନ ଝିଲିକ ହାନଛେ । ବଲୁନ ତୋ ଆମି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କି ଭାବଛି? ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରଶ୍ନ କରେନ ।

ଆପନି ଭାବଛେନ—

ବଲୁନ! ବଲୁନ ନା? ଗଲାଯ ଶକୁନ୍ତଳାର ଆବଦାରେ ସୁର ଯେନ ଏକଟା ।

ସୁରତ ଓ ରଞ୍ଜିତ କାପୁର କିରାଟିର ମୁଖେର ଦିକେ ଚେଯେ ଆହେ ତାଦେର ଆଲୋଚନା ଭୁଲେ । କାପୁର ନା ବୁଝାତେ ପାରଲେଓ ସୁରତ ଯେନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିତେ ପାଯ କିରାଟିର ଦୁଃଚୋଥେର ତାରାୟ କେବଳ କୌତୁକଇ ନେଇ—ସେଇ କୌତୁକେର ପିଛନେ ଝିଲିକ ଦିଚ୍ଛେ ଆରୋ ଏକଟା କିଛୁ ।

ଆପନି ଠିକ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଭାବଛେନ—

ଇରେସ! ବଲୁନ!

ଯେ କାଜେର ଜନ୍ୟ ଆପନି ଚଲେଛେ ତା ଖୁବ ସହଜ ହବେ ନା—ତାଇ ନୟ କି?

ଖିଲାଖିଲ କରେ ହେସେ ଉଠିଲେନ ଶକୁନ୍ତଳା—କାମରାର ମଧ୍ୟେ ଯେନ ହାସିଟା ମିଷ୍ଟି ଜଳତରଙ୍ଗେର ମତ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲ । ଶକୁନ୍ତଳା ବଲଲେନ, ଭୁଲ—

ଭୁଲ!

ହଁ, କାରଣ କୋନ କାଜେର ଜନ୍ୟଇ ଆମି—

ତବେ ଏ ସମୟ ଆପନି ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲେଛେ କେମ?

ଦିଲ୍ଲୀ? କେ ବଲଲେ? ଆମି ତୋ କାନପୁର ଚଲେଛି ।

ଯାଛିଲେନ ଦିଲ୍ଲୀ, ତବେ ଆପାତତ ଭାବଛେନ କାନପୁରେଇ ବ୍ରେକ-ଜାନି କରବେନ ।

ବ୍ରେକ-ଜାନି କରବୋ କାନପୁରେ?

ହଁ ।

ଶକୁନ୍ତଳା ଆବାର ପୂର୍ବେର ମତ ହେସେ ଉଠିଲେନ । ବଲଲେନ, କାନପୁରେଇ ଯାଛି—ଆମାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାବାର ଆପାତତ କୋନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଇ ନେଇ ।

ମୋଟ ଡିପ୍ଲୋମୋଟିକ—

କି ବଲଲେନ?

କିଛୁ ନା—ତବେ ଏଟା ଜାନି—

କି ଜାନେନ?

ଦିଲ୍ଲୀତେ ଆବାର ଆମାଦେର ଦେଖା ହବେ ।

ତା ଯଦି ହୟ ମିଃ ରାୟ ସତିଇ ଖୁବ ଖୁଶି ହବୋ ।

ଆମିଓ । କିରାଟି ହାସତେ ହାସତେ ବଲଲେ ।

ଟ୍ରେନର ଗତି ବାଇରେ ମନ୍ଦୀଭୂତ ହୟେ ଆସଛିଲ ଇତିମଧ୍ୟେ ।

ସହସା କିରାଟି ପ୍ରସଙ୍ଗାତରେ ଚଲେ ଗେଲ । ବଲଲେ, ସୁରତ, ବୋଧ ହୟ ବର୍ଧମାନେ ଏସେ ଗେଲ ଗାଡ଼ି!

ସତ୍ୟ ବର୍ଧମାନ ।

ସେଟନ ଇସାର୍ଟର ଆଲୋ ଚଲମାନ ଗାଡ଼ିର ଜାନଳା-ପଥେ ସକଳେର ଚୋଥେ ପଡ଼େ । ଗାଡ଼ିର ଗତି ଆରୋ ମନ୍ଦୀଭୂତ ହୟେ ଆସଛେ ।

କିରାଟି ଉଠେ ଦାଢ଼ାଳ । ଚଲ୍ ସୁରତ—

କାପୁର ଜିଙ୍ଗେସ କରଲେନ, କୋଥାଯ ଚଲଲେନ ମିଃ ରାୟ?

ডাইনিং সেলুনে যাচ্ছি—যাবেন নাকি?

হ্যাঁ, যাবো বৈকি—আপনারা এগোন আমরা আসছি।

গাড়ি ধীরে ধীরে আলোকিত প্ল্যাটফরমে ইন করছে।

কিরীটী আর সুব্রত কামরা থেকে বের হয়ে গেল।

ডাইনিং সেলুনে বেজায় ভড়।

টেবিলে টেবিলে যাত্রীরা সব বসে কেউ খাচ্ছে, কারো খাওয়া শেষ, এবাবে উঠবে।
কাঁটা-চামচের ঠুঠাঁঠ শব্দ—বহু কঠেব মৃদু গুঞ্জন আৱ সিগারেটেৰ ধোঁয়া। অনেকেই
হাওড়া থেকে ডাইনিং সেলুনে উঠেছিল—তাৰা উঠে পড়ে।

কোণেৰ একটা টেবিলে দুজনে গিয়ে বসল।

বসতে বসতে সুব্রত বলে, কৃষণও টিফিন-ক্যারিয়াৱে প্ৰচুৱ খাবাৰ দিয়ে দিয়েছে।
তবে আবাৰ এখানে এলি কেন?

কিরীটী যেন কি ভাবছিল, সুব্রতৰ প্ৰশ্নেৰ কোন জবাব দেয় না।

খাবাৰগুলো—

নষ্ট হবে না, কাল খাওয়া যাবে। কিরীটী বললে।

বেয়াৰা এসে দাঁড়াল অৰ্ডাৰ নেবাৰ জন্য।

সুব্রত বললে, কি অৰ্ডাৰ দেবো বল?

যা খুশি দে না—

সুব্রতই তখন মেনু দেখে খানাৰ অৰ্ডাৰ দিল। বেয়াৰা চলে গেল। কিরীটী কাঁচেৰ
জানলাপথে বাইৱেৰ আলোকিত প্ল্যাটফর্মেৰ দিকে চেয়ে থাকে।

তুই যেন কিছু ভাবছিস মনে হচ্ছে কিরীটী।

তোকে একটা কাজ কৰতে হবে সুব্রত—

কি, বল।

কানপুৰে তোকে ব্ৰেক-জাৰ্নি কৰতে হবে।

সুব্রত চমকে যেন কিরীটীৰ মুখেৰ দিকে তাকাল।

ওৱা কোথায় যায়, কোথায় ওঠে তোকে জানতে হবে, তাৱপৰ আমাৰ অনুমান যদি
মিথ্যা না হয়—পৱেৱ ট্ৰেনেই হয়ত ওৱা দিজী যাবে—ওদেৱ তুই ফলো কৰিব।

কৰবো—কিন্তু—

দিল্লীতে গিয়েও তুই ওদেৱ ফলো কৰে ওৱা কোথায় ওঠে জানবি, তাৱপৰ—

তোৱ সঙ্গে কোথায় কনটাষ্ট কৰবো?

দেবেশেৰ ওখানে—ওকে আমি বলে রাখবো।

ঠিক আছে।

কিন্তু খুব সাবধান, মীনাঙ্কী অত্যন্ত ধূৰ্ত ও সজাগ।

মীনাঙ্কী!

ওৱ আসল নাম শকুন্তলা নয়, মীনাঙ্কী—

কি কৱে জানলি?

ওৱ হাতেৰ মীনা কৱা আঁটিটা বীঁ হাতেৰ অনামিকায় লক্ষ্য কৱলে দেখতে পেতিস।

সুব্রত কোন কথা বলে না।

কিরীটী একটু হেসে বলে, ও বুবতে পারেনি কিন্তু আমি ওকে গাড়ির কামরায় দেখেই চিনেছিলাম—আই মেট হার বিফোর।

কোথায় ?

দিল্লীতে !

দিল্লীতে !

হঁয়, মিঃ সিংহের সঙ্গে গতবার যখন দিল্লীতে যাই—আমেরিকান কনসুলেটে একটা ককচেইল পার্টিতে ওকে দেখেছি ?

সত্য ?

হঁয়, তাছাড়া—

কিন্তু কিরীটীর আর কথা বলা হলো না। বেয়ারা ঐ সময় খানা নিয়ে এলো।

ট্রেন ততক্ষণে আবার চলতে শুরু করেছে।

॥ তিন ॥

রাত প্রায় পৌনে দশটা।

ডাইনিং সেলুন প্রায় খালি হয়ে এসেছে তখন। কয়েকটা টেবিলে সামান্য কয়জন যাত্রী এদিক ওদিক ছড়িয়ে তাদের রাতের খানা শেষ করে কফির পেয়ালা নিয়ে বসেছে। কারো কারো সেই সঙ্গে চলেছে ধূমপান।

দ্রুত ধাবমান মেল ট্রেনের কাঁচের জানালা-পথে শীতের স্তুর রাত্রির চতুর্দশীর ঢাঁদের আলো যেন অলসভাবে গা এলিয়ে পড়ে আছে।

মধ্যে মধ্যে এক-একটা স্টেশন মেল গাড়িটা অতিক্রম করে চলেছে। স্টেশনের আলো চকিতে যেন দেখা দিয়ে আবার দৃষ্টিগুরুর আড়ালে চলে যাচ্ছে।

ওরা দুজনেও ইতিমধ্যে খানা শেষ করে কফি নিয়ে বসেছিল। বেয়ারারা একে একে টেবিল পরিষ্কার করে ডিশ-প্লেট, কঁটা-চামচ তুলে নিয়ে যাচ্ছে—কেবল তারই মৃদু শব্দ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়।

যে সময়ের কথা বলছি তখনো করিডোর ট্রেনের প্রচলন হয়নি।

কাজেই খানা শেষ হয়ে গেলেও গাড়ি আসানসোল না পৌঁছানো পর্যন্ত ওদের ডাইনিং-কারেই থাকতে হবে।

কিরীটী !

উ—

ঐ রঞ্জিত কাপুর লোকটা—ওকে দেখেছিস আগে ? মীনাক্ষীর ভগীপতি ?

না। তবে যে সম্পর্কটার কথা ওদের পরস্পরের বললে সেটাও আমার সত্য বলে মনে হয় না।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

কি? তোর ব্যাপারটা ওদের জানা?

নিঃসন্দেহে। যেভাবেই হোক, প্রতিপক্ষ টের পেয়েছে যে আমি দিল্লী কেন্দ্র্যাচ্ছি এবং কবে, কখন যাচ্ছি।

তোর অনুমান যদি সত্য হয় তো তাই দেখতে পাচ্ছি।

যে কারণে প্লেনে না গিয়ে ট্রেনে চলেছি, সেটা দেখছি মাঠেই মারা গেল।

আমার মনে হয় গতবার যথৰ তুই দিল্লী গিয়েছিলি তখনই ওরা জানতে পেয়েছিল কোনমতে—

কিরীটী কোন জবাব দিল না।

সে যেন কি ভাবছিল।

সুব্রত আবার বললে, ওদের অঙ্গাতে ব্যাপারটা থাকলে তুই হয়ত কাজের কিছুটা সুবিধা পেতিস।

কিরীটী মন্দু হেসে বললে, এখনো কোন অসুবিধা হবে না। যতটা সর্তক থাকতাম তার চাইতে বেশীই থাকব—কিন্তু গাড়ি বোধ হয় আসানসোল এলো—ইয়ার্ডের আলো দেখা যাচ্ছে।

একজন বেয়ারা কফির শৃন্য কাপগুলো তুলে নিতে এসেছিল, তাকেই সুব্রত জিজ্ঞাসা করে, আসানসোল আর কেতনা দূর?

আসানসোল গাড়ি আগয়ি সাব—

মিনিট দশকের মধ্যে সত্যিই গাড়ির গতি হ্রাস পায়—বাইরের আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

বিল মিটিয়ে দিয়ে ওরা উঠে পড়ল।

গাড়ি থামতেই ওরা ডাইনিং-কার থেকে নামল।

কনকনে শীত বাইরে।

তবু তারই মধ্যে দেখা যায় প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর ভিড়, ভেঙ্গাবদের চিংকার—গরম চায়—গরম পুরি—পান সিগ্রেট—

ওরা এসে যখন কামরায় চুকলো—কাপুর উপরের একটা বার্থে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। বোধ হয় ঘুমিয়েও পড়েছে। শকুন্তলা কিন্তু তখনো শোয়ানি, নীচের বার্থে একটা কালো রংয়ের গরম রাত্রিবাস গায়ে—বার্থের উপর বিস্তৃত শ্যায় বসে একটা কি বই পড়েছে।

ওদের চুকতে দেখে বললে, খাওয়া হলো রায় সাহেব!

হ্যাঁ। কাপুর সাহেব দেখছি শুয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ। ওর নেশাটা বোধ হয় একটু বেশীই হয়েছিল, খানা খেয়েই শুয়ে পড়েছে। ওর তো এতক্ষণে' মধ্যরাত্রি।

সুব্রত বললে, আপনি যে শোননি?

ট্রেনে চট করে আমার ঘুম আসে না।

সুব্রত তার সুটকেস খুলে রাত্রিবাসটা বের করে কামরা থেকে বের হয়ে গেল।

ল্যাভেটরিতে গিয়ে রাত্রিবাস গায়ে চাপিয়ে সুব্রত মিনিট পনেরো বাদে যখন কামরায়

ଫିରେ ଏଲୋ, କିରୀଟି ଉଠେ ଦୀଢ଼ାଳ ହାତେ ରାତ୍ରିବାସଟା ନିଯେ ।

କିରୀଟିର ରାତ୍ରେ ଜ୍ଞାନ କରା ଅଭ୍ୟାସ, ତା ସେ କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କି ଶିତ । ଜ୍ଞାନ ନା କରଲେ ରାତ୍ରେ ତାର ସୁମହିଁ ହ୍ୟ ନା ।

ଫିରେ ଏସେ ଦେଖିଲୋ କିରୀଟି, ସୁବ୍ରତ ଶୁଯେ ପଡ଼େଛେ ଆଗାଗୋଡ଼ା କଷଳଟା ମୁଡି ଦିଯେ ।
ଶକୁନ୍ତଳାଓ ଶୁଯେ ପଡ଼େଛେ ।

ରାତରେ ଅନେକ ହେଁଲେ ।

କିରୀଟି ବାର୍ଥେ ଉଠେ ଆଲୋଟା ନିଭିଯେ ଦିଯେ ଗାୟେ କଷଳଟା ଟେନେ ଦିଲ ।

ଚଲନ୍ତ ଟ୍ରେନେ କିରୀଟିରେ ତେମନ ବଡ଼ ଏକଟା ଭାଲ ସୁମ କୋନଦିନଇ ହ୍ୟ ନା । ତବୁ ସେ ଚୋଥ
ବୁଜେ ସୁମୋବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ।

ସୁମିଯେ ପଡ଼େଛିଲ କିରୀଟି ।

ସଥନ ସୁମ ଭାଙ୍ଗି ଚାରିଦିକେ ବେଶ ଆଲୋ ଫୁଟେ ଉଠେଛେ ।

କାମରାର ବନ୍ଧ କାଂଚେର ଶାର୍ସି ଭେଦ କରେ କାମରାର ମଧ୍ୟେ ଆଲୋ ଏସେ ପଡ଼େଛେ—ତବେ
ସେଟା ଖୁବ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଯ । ବାପସା ବାପସା ।

ବାଲିଶେର ଉପର ଥେକେ ମାଥାଟା ସାମାନ୍ୟ ତୁଲେ ନୀଚେର ଦିକେ ତାକାଲ । ଟ୍ରେନେର ଗତି ତଥନ
ତ୍ରମଶ ହ୍ୟାସ ହ୍ୟେ ଆସଛେ ।

ଟ୍ରେନ ବୋଧ କରି ମୋଗଲସରାଇ ଏଲୋ ।

ଗରମ ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନଟା ଗାୟେ ଜଡ଼ିଯେ କିରୀଟି ଉପରେର ବାର୍ଥ ଥେକେ ନୀଚେ ନାମଲ । ନୀଚେର
ଦୁଟୋ ବାର୍ଥେ ଶକୁନ୍ତଳା ଆର ସୁବ୍ରତ ସୁମୋଛେ ।

ଉପରେର ବାର୍ଥେ ସୁମୋଛେ କାପୁର ।

ସ୍ଟେଶନ ଇଯାର୍ଡେ ଅନେକ ଆଲୋ ଦେଖା ଯାଛେ ।

କିରୀଟି ଚାଯେର ପିପାସା ବୋଧ କରେ । ବାଥରମେ ଗିଯେ ହାତ-ମୁଖ ଧୂଯେ କାମରାର ମଧ୍ୟେ ସଥନ
କିରୀଟି ଫିରେ ଏଲୋ—ଦେଖିଲୋ କାମରାର ମଧ୍ୟେ ଏକମାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦୁଜନ ନେଇ ।

ମୋଗଲସରାଇ ସ୍ଟେଶନେ ଟ୍ରେନ ଥେମେଛେ ।

କିରୀଟି ବାହିରେ ଗିଯେ ଦୁଜନେର ମତୋ ଚାଯେର ଅର୍ତ୍ତାର ଦିଯେ ସଥନ କାମରାର ମଧ୍ୟେ ଫିରେ
ଏଲୋ—ଦେଖିଲୋ କାପୁର ଆର ଶକୁନ୍ତଳା ବସେ ଚା ପାନ କରଛେ ।

ସୁବ୍ରତ ତଥିଲୋ ସୁମୋଛେ ।

ଶକୁନ୍ତଳା ଆର ରଙ୍ଗିତ କାପୁର ଦୁଜନାଇ ବଲଲେ, ଗୁଡ଼ମର୍ମିଂ, ମିଃ ରାଯ ।

ଗୁଡ ମର୍ମିଂ ।

ଚା ଚଲିବେ ନାକି ? ଶକୁନ୍ତଳା ଶୁଧାୟ ।

ଆପନାରା ଥାନ—ଆମି ଚାଯେର କଥା ବଲେ ଏସେଛି ।

ସୁବ୍ରତ କଷଲେର ତଳା ଥେକେଇ କଥା ବଲେ ଓଠେ, ବଲେଛିସ ?

ହୁଁ । ତୋର ସୁମ ଭାଙ୍ଗ ? କିରୀଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

ସୁବ୍ରତ ବଲଲେ, ଅନେକକଷଣ ।

ବେଳା ଦୁଟୋ ନାଗାଦ ଟ୍ରେନ କାନପୁରେ ଏସେ ପୌଁଛାୟ ।

କଥା ଛିଲ ଶକୁନ୍ତଳା ଏକାଇ କାନପୁରେ ନେମେ ଯାବେ—କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗିତ କାପୁରଓ ନେମେ ଗେଲ ।

সুব্রত প্রস্তুত হয়েই ছিল। ওরা গাড়ি থেকে নামার কিছু পরেই সুব্রতও সুটকেস্টা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

কিরীটী একাই গাড়ির কামরায়—আর কোন যাত্রী ছিল না।

ট্রেন ছাড়ার পর কিছুক্ষণ কিরীটী চলস্ত গাড়ির জামালা-পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে—তারপর সকালে এলাহবাদে স্টেশনে কেনা সংবাদপত্রটা টেকে নেয় আবার—নতুন করে চোখ বুলাবার জন্য।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা ওল্টাতেই হঠাতে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের হয়ে পড়লো। একটু কৌতুহলের বশেই ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ধরতেই কিরীটী যেন একটা চমক অনুভব করে।

ভাঁজ করা কাগজ মাত্র নয়, একটা চিঠি।

সংক্ষিপ্ত ইংরাজীতে লেখা। বেশ পরিষ্কার করে গোটা গোটা ইংরাজীতে লেখা। লেখাগুলো সামান্য যেন কেঁপে কেঁপে গিয়েছে।

মিঃ রায়,

যাঁরা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁরা যেমন আলেয়ার পিছনে ছুটছেন—আপনাকেও ঠিক তেমনি ছুটে মরতে হবে। আপনার ক্ষমতা আছে আমরা জানি, কিন্তু ‘পেনিন্ট্রেশন’ করার চেষ্টা করলে বিপদকেই ডেকে আনা হবে জানবেন। আর তাছাড়া যে কাজের জন্য আপনি যাচ্ছেন সেটা এখন সকলেরই নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

—‘এক্স’

কিরীটী বার দু-তিন আগাগোড়া চিঠিটা পড়লো।

হাতের লেখা থেকে ঠিক স্পষ্ট বোঝা যায় না—হাতের লেখাটা মেয়ের না পুরুষের; খানিকটা মেয়েলী ধাঁচের লেখা বটে আবার পুরোপুরি মেয়েলীও নয়—পুরুষের হাতের লেখা হওয়াও আশ্চর্য নয়।

বেশ তাড়াতাড়ি লেখা হয়েছে।

কিন্তু লেখাটা কখন কাগজের মধ্যে এলো?

চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল কিরীটী।

এখন আরো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা সত্যই খুব সহজ নয়। দণ্ডর থেকে যে গোপনীয় দলিলটা চুরি গিয়েছে সেটার মূল্য বা গুরুত্ব সম্পর্কে এখনো বিশেষ কিছু জানে না কিরীটী। তবে দলিলটার যে বিশেষ একটা মূল্য আছে সেটা সে বুঝেছিল, নচেৎ অস্তত সে-ব্যাপারে দিল্লীতে তার ডাক পড়তো না এবং সংশ্লিষ্ট দণ্ডরও অত্থানি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো না।

বিশেষ কোন আলোচনারই সুযোগ পায়নি গতবারে কিরীটী।

এবং এটাও সে বুঝতে পারছে, দলিলটা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সরকার-পক্ষ যে তার সাহায্যের জন্য তাকে আহান জানিয়েছেন সেটা অস্তত প্রতিপক্ষের অজানা নেই আর।

অতএব তাকে এবার খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে।

সকালের দিকে কিরীটী দিল্লী স্টেশনে অবতরণ করল।

ତାକେ ନିଯେ ଯାବାର ଜନ୍ୟ ହୁଯତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଲୋକ ଏସେଛିଲ, କିନ୍ତୁ କିରୀଟୀ ମେ ସମ୍ପର୍କେ କୋନ ଖୋଜିଥିବରାଇ ନିଲ ନା—ଷେଟନ ଥେକେ ବେର ହୁୟେ ଏକଟା ଟ୍ୟାଙ୍କି ନିଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କିଓଯାଲାକେ ବଲଲ, ମୋଜା ରାଯସିନହା ରୋଡେ ଯେତେ ।

ମନେ ମନେ ହିଁର କରେଛିଲ ମେ, ମୋଜା ଗିଯେ ଆପାତତ ତାର ବଞ୍ଚୁ ଦେବେଶେର ଓଥାନେଇ ଉଠିବେ ।

ତାରପର ଅବଶ୍ଵା ବୁଝେ ବ୍ୟବଶ୍ଵା ।

॥ ଚାର ॥

କିରୀଟୀ ଯଥନ ଗିଯେ ଦେବେଶେର ଓଥାନେ ପୌଛାଳ ଦେବେଶ ତଥନୋ ଅଫିସେ ବେର ହୁଯନି । ନିଜେର ବାଂଲୋତେ ତାର ଅଫିସ-ଘରେ ବସେ କାଜ କରଛିଲ ।

ଗେଟେର ଭିତର ଦିଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଢୋକାର ଶବ୍ଦେ ଦେବେଶ ବେର ହୁଯେ ଆମେ ।

କିରୀଟୀକେ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଥେକେ ନାମତେ ଦେଖେ ଦେବେଶ ରୀତିମତ ବିଶ୍ଵିତାଇ ହୁୟ ।

କିରୀଟୀ ତୁଇ !

ଏଲାମ ବେଡ଼ାତେ, କଟା ଦିନେର ଜନ୍ୟ । ଚଲ୍ ଭିତରେ ଯାଓଯା ଯାକ ।

ବଲତେ ବଲତେ ଦୂଜନ ଏସେ ଦେବେଶେର ଅଫିସ-ଘରେ ଚୁକଲ ।

ତାରପର କି ବ୍ୟାପାର ? ଏହି ଶୀତେର ସମୟ ହଠାତ୍ ରାଜଧାନୀତେ !

ଚେଯାରେ ବସତେ ବସତେ କିରୀଟୀ ବଲଲେ, କେନ, ଶୀତେର ସମୟ ତୋଦେର ରାଜଧାନୀତେ ଆସା ବାରଣ ନାକି !

ତା ନ ନୟ—ତବେ—

କି ?

ସତି ବଲ୍ ତୋ ବ୍ୟାପାରଟା କି ? ତୁଇ ସତି ସତି ବେଡ଼ାତେ ଏସେଛିସ ?

ବିଶ୍ଵାସ କରତେ ପାରଛିସ ନା ?

ଠିକ ତାଇ ।

ଏସେଛି କେନ ନିଶ୍ଚଯାଇ ତୁଇ ଜାନବି—ତାର ଆଗେ ଏକଟୁ ଚାଯେର ବ୍ୟବଶ୍ଵା କର—ତୋର ଗିନ୍ଧି କୋଥାଯ ?

ମେ ତୋ ଏଥାନେ ନେଇ ।

ନେଇ !

ନା, ମାସଥାନେକେର ଜନ୍ୟ କଲକାତା ଗିଯେଛେ । ବଲତେ ବଲତେ ଦେବେଶ କଲିଂବେଲ ବାଜାଲ । ବୈଯାରା ରାମଲାଲ ଏସେ ଘରେ ଚୁକଲ ।

ରାମଲାଲ !

ଜୀ ସାବ—

ଚା ନିଯେ ଆଯ—

ରାମଲାଲ ଚଲେ ଗେଲ ।

ଦୁ-ଏକଦିନ ଥାକବି, ନା ଆଜଇ ଚଲେ ଯାବି ? ଦେବେଶ ଶୁଧ୍ୟ ।

ଦିନ ଦଶ-ବାରୋ ହୁଯତ ଥାକବୋ ।

সঙ্গে মালপত্র কিছু নেই?

একটা সুটকেস আর একটা হোলডল।

একটু পরে রামলাল চা নিয়ে এলো।

দুই বঙ্গুত্তে ঢা-পান করতে করতে আবার কথা কয়। এবং তখনি কিরীটী সংক্ষেপে
তার দিল্লী আগমনের কারণটা দেবেশকে খুলে বলে।

কিন্তু ব্যাপারটা টপ সিক্রেট—

ভয় নেই তোর, এখান থেকে তোর সিক্রেট বের হবে না। হাসতে হাসতে দেবেশ
বললে।

জানি। শোন্ তোকে একটা কাজ করতে হবে।

কি বল্?

প্রতাপ সিংকে তুই জানিস নিশ্চয়ই!

একজন প্রতাপ সিংকে জানি, প্রতিরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী—কিন্তু কেন্ব বল্ তো?
লোকটা কিন্তু বিশেষ সুবিধার নয়।

আর কোন প্রতাপ সিং কেউ কোন দপ্তরে সেক্রেটারী আছে নাকি!

আর একজন সিং আছে তবে সে প্রতাপ সিং নয়।

প্রতাপ সিং রামস্বামীর সেক্রেটারী তো?

হাঁ, তিনিই বটে।

তাকে একবার এখন ফোনে পাওয়া যাবে?

তা হয়ত যেতে পারে।

দেখ্ তো, কানেকশন পাস কিনা।

প্রতাপ সিংকে বাড়িতে নয়, তার দপ্তরেই পাওয়া গেল।

ফোনটা দেবেশ কিরীটীর হাতে তুলে দিল।

মিঃ সিং—গুড মর্নিং—আমি রায়!

মিঃ রায়? কখন এলেন—কোন্ ট্রিমে, না প্লেনে এলেন?

সকালের ট্রিনেই এসেছি।

আমার লোক আর গাড়ি ফিরে এলো—তারা বললে আপনাকে খুঁজে পেলো না।

ইচ্ছে করেই ধরা দিইনি।

বুঝেছি—তা এখন কোথা থেকে কথা বলছেন? কোথায় উঠেছেন?

সাক্ষাতে সব জানাব—আপনার সঙ্গে কখন কোথায় দেখা হতে পারে বলুন, মিঃ সিং।

বলেন তো এই মুহূর্তেই হতে প্যারে, গাড়ি পাঠাতে পারি—আপনি তো জানেন, হাউ
উই আর অ্যাঙ্গসাস টু মিট ইউ!

ঠিক আছে, এখন বেলা পৌনে দশটা; এগারোটায় আপনার অফিসে মিঃ গুলজার সিং
নামে একজন যাবে—

হ্যাঁ ইজ গুলজার সিং?

সাক্ষাতেই তার পরিচয় পাবেন। কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

ବେଳା ଠିକ ଏଗାରୋଟାଯ ମିଃ ସିଂ୍ହର ବେଯାରା ଏସେ ସେଲାମ ଦିଲ, ତାର ହାତେ ଏକଟା ଚିରକୁଟ—ଚିରକୁଟେ ଲେଖା ଇଂରେଜୀତେ ଗୁଲଜାର ସିଂ ।

ପ୍ରତାପ ସିଂ ସେକେଲେ ଏକଜନ ଦୁଁଦୁ ଆଇ. ସି. ଏସ. ଅଫିସାର—ବ୍ୟେସ ପଞ୍ଚଶିର କିଛୁ ଉଥେଇ ହବେ । ତବେ ଚେହାରା ଥେକେ ବ୍ୟେସଟା ଠିକ ଧରା ଯାଯ ନା ।

ବେଶ ହାଟପୁଟ୍ଟ ଚେହାରା—ଛୟ ଫୁଟେର କାହାକାହି ପ୍ରାୟ ଲମ୍ବା । ପାଞ୍ଜାବୀ ଶିଖ ହଲେଓ ଦାଡ଼ି-ଗୌଫ ନିର୍ଖୁତଭାବେ କାମାନୋ । ପରନେ ଦାମୀ ଗରମ ସୁଟ । ମାଥାର ଚାଲ ବ୍ୟାକ-ବ୍ୟାଶ କରା—ରଗେର ଦୁ'ପାଶେର ଚାଲେ ପାକ ଧରେଛେ ।

ପ୍ରତାପ ସିଂ ଟେବିଲେର ଉପର ଏକଟା ଫାଇଲ ଖୁଲେ କି ସବ ଦେଖିଲେନ, ବେଯାରାକେ ବଲଲେନ, ଗୁଲଜାର ସିଂକେ ଘରେ ପାଠିଯେ ଦିତେ ।

ମେ ଆଇ କାମ ଇନ ?

ଇଯେସ, କାମ ଇନ ।

କିରୀଟି ଏମେ ଘରେ ଚୁକଲ । ଡୋର-କ୍ଲୋଜାର ଲାଗାନୋ ଦରଜା ନିଃଶବ୍ଦେ ଆପନା ଥେକେଇ ବନ୍ଧ ହେୟ ଗେଲ । ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଏକ କୋଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହିଟାର ବସାନୋ ! ଘରେର ବାତାସ ବେଶ ଉଷ୍ଣ—ଆରାମପ୍ରଦ ।

କିରୀଟିର ପରନେ ଦାମୀ ସୁଟ । ମୁଖେ ଚାପଦାଡ଼ି, ମାଥାଯ ପାଗଡ଼ି, ଚୋଖେ କାଲୋ କାଁଚେର ଚଶମା ।

ପ୍ରତାପ ସିଂ କିନ୍ତୁ ଚିନତେ ପାରେନ ନା କିରୀଟିକେ, କାରଣ ଗତବାରେର ବେଶଭୂଷା ଛିଲ ଅନ୍ୟରକମ କିରୀଟିର ।

ବୈଠିଯେ ସାବ ।

କିରୀଟି ବସଲୋ ମୁଖୋମୁଖୀ ଏକଟି ଚୟାରେ ।

ଆପନି ମିଃ ରାଯେର କାହ ଥେକେ ଆସଛେନ ?

ହଁଁ, ମିଃ ସିଂ—

ଇଯେସ—

ଆମିଇ ରାଯ—

ଶୁଦ୍ଧ ହେବେନସ ।

ହାଶ ! ଆପ୍ଟେ—ଏଥାନେ ଯେ କଦିନ ଥାକବୋ ଏଇଟାଇ ହବେ ଆମାର ପରିଚୟ ।

ବାଟ ହୋଇଅଇ ?

ପ୍ରଯୋଜନ ଆଛେ—ଯାକ ଏଥନ କାଜେର କଥାଯ ଆସା ଯାକ—କେଉ ଏଥନ ଏଥାନେ ଆସବେ ନା ତୋ ?

ନା ।

ତାହଲେ କାଜେର କଥାତେଇ ଆସା ଯାକ । ମେ ଦଲିଲଟା ସମ୍ପର୍କେ ଆର କୋନ ସଂବାଦ ପାନନି ?

ଦଲିଲଟା ପାଓଯା ଗିଯେଛେ ।

ଗିଯେଛେ ? ହାଉ ? କୋଥାଯ ପେଲେନ ?

ଯେ ଆୟରନ ମେଫ ଥେକେ ଖୋଯା ଗିଯେଛିଲ ତାର ମଧ୍ୟେ ପାଓଯା ଗିଯେଛେ ।

ପେଲେନ କି ? କବେ ପେଲେନ ?

দিন দুই হলো।

কিন্তু আপনি তো আমাকে ফোনে সেকথা জানাননি।

না, জানাইনি—তার কারণ—

কি বলুন তো?

কারণ যারা সেটা চুরি করেছিল তারা সম্ভবত তার একটা ব্লু-প্রিন্ট করে নিয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, তবে—

তবে কি?

সেবারে আপনাকে বলেছিলাম সেটা হয়ত বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা ভাল করে সংবাদ পেয়েছি এখনো সেটা পাচার করতে পারেনি।

আর ইউ শিয়োর?

নচেৎ বলবো কেন?

মন্ত্রীমশাই আছেন এখন অফিসে?

আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁকে আপনার কথা জানিয়েছি।

তাহলে একবার চলুন তার ঘরে যাওয়া যাক।

এখুনি যাবেন?

হ্যাঁ, চলুন—

দুজনে অতঃপর সিংয়ের ঘর থেকে বের হয়ে একটা লম্বা করিডোর অতিক্রম করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দপ্তরের সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজার গায়ে লাল বাতি জুলছে : এনগেজড।

দরজার সামনে টুলের উপরে যে বেয়ারা বসেছিল সে সিংকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দেয়।

ঘরে কে আছে বিজ্ঞাথ?

সাহেবের পার্সোন্যাল স্টেনো—সাহেব কি সব যেন ডিকটেশন দিচ্ছেন।

আপনি একটু দাঁড়ান, আমি দেখি—প্রতাপ সিং দরজা ঠেলে ঘরে চুকে গেল। মিনিট দুয়েক বাদে একটি অতি-আধুনিকা তরঙ্গী হাতে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে বের হয়ে কিরীটীর পাশ দিয়ে।

কিরীটী যেন তরঙ্গীটিকে দেখেও দেখে না—সে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

প্রতাপ সিং দরজা খুলে কিরীটীকে ভিতরে আসতে আহ্বান জানাল।

কিরীটী ভেতরে প্রবেশ করল।

চমৎকার ভাবে সাজানো-গোছানো ঘরটি। ঘরটি কিরীটীর অপরিচিত নয়—ইতিপূর্বে দিল্লীতে এলে, শুই ঘরের মধ্যে মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল।

প্রতাপ সিং বোধ হয় আগেই কিরীটীর ব্যাপারটা রামস্বামীকে জানিয়ে দিয়েছিল : রামস্বামী তাকে সাদর আহ্বান জানালেন, বি সিটেড প্লিজ মিঃ রায়।

কিরীটী সামনের চেয়ারটায় বসে।

আচ্ছা মিঃ সিং, তুমি তাহলে সেই জরুরী ফাইলটা আজই যাতে আমাদের প্রধান

মন্ত্রীর দণ্ডের পেঁচায় তার ব্যবস্থা করো—আমি ততক্ষণে ওঁর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।
ও, কে—স্যার।

প্রতাপ সিং ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আপনি এসে গেছেন মিঃ রায়, আমি যেন বেঁচেছি। কি অসহ্য উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যে
দিনরাত কাটছে।

॥ পাঁচ ॥

আপনার সেক্রেটারীর মুখে শুনলাম আসল ডকুমেন্টটা পেয়ে গিয়েছেন—কিরীটী বললে।

তাতেই তো আরো আমার মাথা ঘুরতে শুরু করোছে, রামস্বামী বললেন।

ঠিক যেখানে ছিল আয়নার সেফ-এ, ঠিক সেখানেই পেয়েছেন কি ডকুমেন্টটা?

অ্যাঁ, হ্যাঁ তাই—একজান্টলি হোয়ার ইট ওয়াজ! আরো নুতন করে গোলমাল দেখা
দিয়েছে এই দলিলটা অবার ফিরে পাওয়াতেই।

কেন?

প্রধান মন্ত্রীর ধারণা—

কি?

বুঝতে পারছেন না, যদিও রাদার ফ্যান্টাস্টিক—তাহলেও তাঁর ধারণা, যারা হাত-
সাফাই করেছিল তারা নিশ্চয়ই তার একটা ব্লু-প্রিন্ট করে নিয়েছে।

কিরীটী মৃদুকষ্টে বললে, তাঁর ধারণা মিথ্যা নাও হতে পারে। হয়ত সত্যিই সেটার
একটা ব্লু-প্রিন্ট করে নিয়ে দলিলটা আবার যথাস্থানে রেখে গিয়েছে—কথাটা বলতে
বলতে হঠাতে যেন কিরীটী থেমে গেল।

মনে হলো তার মাথার মধ্যে হঠাতে যেন কোন একটা চিঞ্চা এসে উঠি দিয়েছে।

কি ভাবছেন মিঃ রায়?

কিছু না—আচ্ছা মিঃ রামস্বামী—

বলুন।

দলিলটা যে চুরি গিয়েছিল, ব্যাপারটা কে কে জেনেছিল বলুন তো?

ব্যাপারটা প্রথম থেকেই, বুঝতেই তো পারছেন, সিক্রেট ও কনফিডেনশিয়াল রাখা
হয়েছে—

তবু কে কে জানত?

প্রধানমন্ত্রী, আমি আর আমার চীফ সেক্রেটারী প্রতাপ সিং ছাড়া কেউ জানে না।

প্রতাপ সিংকে নিশ্চয়ই আপনি খুব বিশ্বাস করেন?

ওঁ, শিয়োর! হি ইজ অ্যাবড অল সাসপিসান।

হ্যাঁ। তা বলছিলাম—

বলুন।

দলিলটা যখন পেয়ে গিয়েছেন, তখন কি আর আমার কোন প্রয়োজন আছে?

কি বলছেন মিঃ রায়, দলিলের কপি যখন করে নিয়েছে—সেটা পাচার হবেই

আর একটা কথা—

বলুন!

আমি যাবো আপনার পাঠিতে কিন্তু আমার পরিচয়টা যেন যথাসাধ্য গোপন থাকে।

আপনি যেমন বলবেন মিঃ রায় তেমনই হবে—তারপরেই একটু থেমে মন্ত্রী মশাই বললেন, আপনার ব্যক্তিগত সিকিউরিটির জন্য যদি কোন প্রহরার প্রয়োজন বোধ করেন তো আমাকে জানাতে কোনরকম দ্বিধাবোধ করবেন না মিঃ রায়।

না, সেরকম কিছু আপাতত আমার প্রয়োজন নেই।

গাড়ি চাই না আপনার?

না।

কোথায় উঠেছেন।

রায়সিনহা রোডে।

আপনার থাকার তো আমি ভাল ব্যবস্থা করেছিলাম।

তার প্রয়োজন নেই।

ঠিক আছে, কিছু দরকার হলে সিংকে বলবেন।

জানাবো। এখন তাহলে আমি উঠবো—

কিরীটী মন্ত্রীমশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

বিকেলের দিকে সূর্যত এলো।

দেবেশ তখনো অফিস থেকে ফেরেনি। শীতের বেলা ইতিমধ্যেই মান হয়ে এসেছিল।

দেবেশের বসবার ঘরে চা-পান করতে করতে দুজনার মধ্যে কথাবার্তা হয়।

তারপর তোর কি খবর বল সুন্তুত?

খবর বিশেষ কিছু নেই—স্টেশন থেকে বেরনো পর্যন্ত ওদের আমি ফলো করেছিলাম।

তারপর?

কিন্তু স্টেশনের বাইরে একটা গাড়ি ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল—সে গাড়িতে চেপে হাওয়া হয়ে গেল।

ওদের অনুসরণ করতে পারলি না?

বিরাট সুপার লাকসারী কার—গাড়িটার নম্বর ছিল দিল্লীর।

হঁ। তাহলে তারা সোজা দিল্লীতেই এসেছে—কতকটা যেন আঘাত ভাবেই কথাটা বললে কিরীটী।

এই সময় বেয়ারা রামলাল এসে বললে, সাহেব অফিস থেকে ফোন করছেন।
কাকে?

রায় সাহেবকে ডাকছেন।

কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল।

কে, কিরীটী?

হ্যাঁ, কি ব্যাপার?

গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, চলে আয়।

কোথায় ?

আয় না ।

কিরীটীর মনে হলো দেবেশ যেন কোনমতে কথা ক'টা বলেই ফোনের কানেকশনটা কেটে দিল ।

॥ ছয় ॥

ঘরে ফিরে আসতে সুব্রত শুধায়, দেবেশবাবু ফোন করেছিলেন কেন ?

বুঝলাম না ঠিক । বললে গাড়ি পাঠাচ্ছে, কোথায় যেন যেতে হবে ।

কোথায় ?

তা তো কিছু বললো না ।

দেবেশবাবু জানেন কেন তুই এখানে এসেছিস ?

হঁা, বলেছি ।

কিরীটীর পরনে একটা গরম পায়জামা, পাঞ্জাবি ও গায়ে শাল ছিল; সে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে প্রস্তুত হয়ে নিল ।

একটু পরেই গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকছে হেড-লাইট জ্বালিয়ে দেখা গেল । গাড়ির আলোটা জানালার বন্ধ কাঁচের শার্সির উপর দিয়ে ঘুরে গেল ।

ও, গাড়ি বোধ হয় এসে গেল । চলি ।

একজন নেপালী ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল । কালো রঙের ঝকঝকে একটা নিউ মডেলের মাসিডিজ বেঞ্জ গাড়ি ।

কিরীটী গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল । গাড়িটা দেবেশের নয়, একবার মনেও হয়েছিল কথাটা; দেবেশ তার নিজের গাড়ি না পাঠিয়ে অন্য গাড়ি পাঠাল কেন ? এ কার গাড়ি ?

কিরীটী তখন অপরিচিত বাঁধানো মেটাল পথ ধরে নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে ।

কিরীটী মনে হয় একবার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় সে যাচ্ছে ? কিন্তু কি ভেবে কোন প্রশ্নই করল না ।

প্রায় মিনিট পনেরো-কুড়ি বাদে কুতুবের কাছাকাছি নতুন যে পল্লী গড়ে উঠেছে, এখানে ওখানে সব নতুন বাড়ি হচ্ছে, সেই পল্লীর মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়াল ।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা খুলে দিল ।

কিরীটী গাড়ি থেকে নামল ।

নীচের তলায় আলো জুলছে ।

এই কোঠি ?

জী সাব—অন্দর যাইয়ে—

কিরীটী দরজার দিকে এগিয়ে গেল । দরজার কাছাকাছি যেতেই দরজাটা খুলে গেল ।

খোলা দরজার সামনে দামী সুট পরিহিত চবিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবক দাঁড়িয়ে ।

যুবক তাকে অভ্যর্থনা জানাল : মিঃ রায় ?

হ্যাঁ।

আসুন ভিতরে।

ঘরের মধ্যে পা দিল কিরীটি। আলোকিত কক্ষ—মূল্যবান ইচ্চিসমত সোফা কাউচে ঘরটি চমৎকার করে সাজানো।

কোথা যায় কোন ধৰ্মীর গৃহ।

মিঃ দাশ কোথায় ?

উপরে চলুন।

কিরীটি যুবককে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে একটা ঘরের বদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল।

ভিতরে যান মিঃ রায়, মিঃ দাশ ভিতরেই আছেন।

একটু যেন কেমন ইতস্তত করে কিরীটি, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। কেন যেন মনে হয় কিরীটির, হঠাৎ এভাবে দেবেশের একটা ফোন কল পেয়ে সোজা না এলেই ভাল হতো। কিন্তু চিন্তা করবারও আর তখন সময় নেই। কিরীটি দরজা ঠেলে ভিতরে পা দিল।

আলোকিত ঘরটা।

মাঝারি সাইজের এবং সে ঘরের মধ্যেও সব মূল্যবান আসবাবপত্র। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করে কিরীটি কাউকে দেখতে পেল না।

ঘরটা খালি।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই কিরীটি ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে।

আসুন মিঃ রায়—গুড ইভিনিং।

ঘরের দক্ষিণ কোণ থেকে একটা ভারী পুরুষ-কঠ ভেসে এলো। এবং কিরীটির মনে হলো কঠস্বরটা যেন তার পরিচিত। কিন্তু বক্তাকে ঘরের মধ্যে কোথাও দেখতে পেল না।

কিরীটি এদিক ওদিক তাকায়।

দক্ষিণ কোণে কেবল একটা ভারী পর্দা ঝুলছে। সেই পর্দা ঠেলেই এবারে যে লোকটি কক্ষের মধ্যে আবির্ভূত হলো তাকে দেখেই কিরীটি চিনতে পারে।

ট্রেনের সেই পরিচিত রঙ্গিৎ কাপুর।

গুড ইভিনিং মিঃ রায়—চিনতে পারছেন ?

কিরীটি প্রথমটায়—একটু হকচকিয়ে গেলেও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে পরিস্থিতির সঙ্গে। মন্দ হেসে বললে, পারছি বৈকি!

নিশ্চয়ই, চিনতে পারবেন বৈকি। আপনি গুণী লোক। কিন্তু বসুন—দাঁড়িয়ে কেন ?
বসতে হবে না—

সে কি ! বসবেন না ?

না। যে জন্য এভাবে ধরে নিয়ে এলেন আমাকে সেটা বরং তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

বলবো বলেই তো ডেকেছি। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো আর কথাবার্তা হতে পারে না। আর সেটা শোভনও হবে না।

ইউ নীড নট ওরি, মিঃ কাপুর। আপনার কি বক্তব্য আছে বলে ফেলুন।

শুনবেন বৈকি এসেছেন যখন—আপনাকে কোশলে এখানে আমরা নিয়ে এসেছি
বলবার জন্যেই তো—যা আমাদের—

কথা বলে কি খুব কিছু একটা লাভ হবে মিঃ কাপুর, আপনাদের নেটওয়ার্কটা যখন
আমি জানতে পেরেছি!

জেনে ফেলেছেন?

জেনেছি বৈকি। তাই বলছিলাম আপনার মত একজন কাট আউট অর্থাৎ দ্বিতীয় বা
তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে কি আমার কিছু লাভ হবে। আপনি বরং আপনার বড়
কর্তা স্টেশন চীফকে ডাকুন।

স্টেশন চীফকে ডাকবো?

হ্যাঁ, তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি! যদি কিছু ডিল-এ আসতে হয় তা হলে স্বয়ং
খোদ কর্তা বা স্টেশন চীফের সঙ্গেই কথাবার্তা বলা ভাল। তার সামান্য একজন এজেন্ট
বা ইনফরমারের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ কি? আমারও সময়ের মূল্য আছে।

আপনি আমার সঙ্গেই কথা বলতে পারেন।

রঞ্জিৎ কাপুরের গলার স্বরটা বেশ যেন গভীর শোনাল।

বলতে পারি বলছেন?

হ্যাঁ।

বেশ, তবে বলুন আপনিই, আপনার কি বক্তব্য আছে?

আমার বক্তব্যটা তো আপনার অজানা নয়, মিঃ রায়।

আমাকে ভয় দেখিয়ে যে খুব একটা সুবিধা হবে না আশা করি সেটা অস্ত মিঃ কাপুর
বুঝতে পেরেছেন?

রঞ্জিৎ কাপুর স্থিরদৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে রইল কিরীটীর মুখের দিকে, তারপর
বললে, বেশ, তাহলে ডিলেই আসা যাক। কত টাকা পেলে আপনি এ রাস্তা থেকে সরে
দাঁড়াবেন?

আপনাদের অফারটা শুনি?

দশ হাজার।

মাত্র!

পনেরো হাজার।

পনেরো হাজার!

বেশ, পঁচিশ হাজার। কেমন, ডিল ক্লোজড়!

তার আগে আমি জানতে চাই, আমার বক্তু দেবেশ দাশ কোথায়?

যে গাড়িতে আপনি এসেছেন এখানে সেই গাড়িতেই তাঁকে তাঁর বাংলোতে পাঠিয়ে
দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে হয়ত তিনি বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন।

কেমন করে বিশ্বাস করবো আপনার কথা?

ঘরের কোণে ঐ যে ফোন আছে, ফোন করে দেখুন।

দ্যাট ইজ নট এ ব্যাড আইডিয়া! কিরীটী ফোনটার সামনে দাঁড়াল এবং দেবেশের
নাম্বারের ডায়েল করল।

হালো, কে।

দেবেশের বেয়ারা রামলালের গলা।

রামলাল, আমি কিরীটী—সাহেব বাড়িতে পৌছেছে?

এইমাত্র এলো একটা গাড়ি, দেখি বোধ হয় সাহেবেরই—

রঞ্জিং কাপুর ইতিমধ্যে যে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে কিরীটী তা বুঝতে পারেনি—সহসা রঞ্জিং কাপুর হাত দিয়ে টিপে ফোন কনেকশনটা অফ করে দিল এবং শাস্তগলায় বললে, উঁহ, নো মোর মিঃ রায়—বাজে কথা বাড়িতে ফিরে বলবেন। নাউ লেট আস ফিনিশ আওয়ার ডিল! টাকাটা আপনার একশত টাকার নোটে হলে চলবে তো?

টাকা তো আমি এখানে নেবো না মিঃ কাপুর—কিরীটী শাস্তগলায় বললে।

এখানে নেবেন না! তবে কোথায়?

বুঝতেই পারছেন অতগুলো নগদ টাকা—

তবে কিভাবে কোথায় পেমেন্টটা করতে হবে বলুন?

কলকাতায়।

কিন্তু তা তো সন্তুষ্ট নয়—সহসা ঘরের মধ্যে এক নারী-কঠুন্বর কিরীটীর কানে প্রবেশ করতেই কিরীটী ফিরে তাকাল—

একজন ভদ্রমহিলা।

বয়স চাঞ্চিপের নীচে নয়।

দামী জর্জেটের শাড়ি পরিধানে—চোখে-মুখে উগ্র প্রসাধনের চিহ্ন। হাতে একটা কালো রংয়ের অ্যাট্যাচি কেস।

মিসেস খানা?

রঞ্জিং কাপুরের প্রশ্নে মিসেস খানা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাপুর, ইফ হি ইজ এগিড টু আওয়ার টার্মস, এই কেসে টাকা আছে, ওকে গুনে নিতে বলো—আর কাল ভোরের প্লেনে ওর টিকিটও রেডি আছে কাশীরে যাবার—

কাশীর! কথাটা বললে কিরীটীই।

হ্যাঁ, কাশীরে এখন সোজা যাবেন। দশদিন পর সেখান থেকে ফিরবেন। হোটেলে আপনার ঘর ঠিক করা আছে।

নট ব্যাড! কিন্তু এই ঠাণ্ডায় কাশীর—অন্য কোথাও গেলে হতো না ম্যাডাম?

কিরীটীর ঐভাবে হঠাত ফোন-কল পেয়ে চলে যাওয়াটা সুব্রতের ঠিক তাল লাগেনি। কিন্তু কিরীটীকে সেকথা বললে সে শুনবে না তাই তাকে বাধা দেয়নি। কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে সেও বাইরে এসেছিল।

কিন্তু পোর্টিকোর আলোতে যখন দেখলো অপরিচিত ড্রাইভার ও অপরিচিত গাড়ি, সে কিরীটীকে বাধা দেবে ঠিক করেছিল কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে কিরীটী গাড়িতে উঠে বসে, ড্রাইভার গাড়িটা ছেড়ে দেয়।

সুব্রত মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগে—কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে—সে আর

କାଳବିଲଥ ନା କରେ ସରେ ତୁକେ ସୁଟକେସ ଥେକେ ଲୋଡେଡ ପିନ୍ଟଲଟା ପକେଟେ ପୁରେ ମୋଜା ଗେଟ
ଦିଯେ ବେର ହେଁ ପଡ଼େ ।

ଭାଗ୍ୟ ଭାଲ ବଲତେ ହବେ, ବେରତେଇ ଏକଟା ଖାଲି ଟ୍ୟାଙ୍କି ପେଯେ ଗେଲ ।

ସୁବତର ଟ୍ୟାଙ୍କିତେ ଉଠେ ସାମନେ ଦିକେ ଚାଲାତେ ବଲେ ଡ୍ରାଇଭାରକେ । କିରୀଟୀର ଗାଡ଼ିର
ନସ୍ବରଟା ଆଗେଇ ସେ ଦେଖେ ନିଯେଛିଲ ।

କିଛୁଦୂର ଯେତେଇ ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ିଟା ସୁବତର ନଜରେ ପଡ଼ିଲ ।

ଡ୍ରାଇଭାରକେ ସୁବତ ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ିଟାକେ ଫଳୋ କରତେ ବଲଲେ ।

॥ ସାତ ॥

ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ିଟା ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏକଟା ବାଡ଼ିର ସାମନେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଳ । ହାତ
ପନେରୋ-କୁଡ଼ିର ବ୍ୟବଧାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କିଟା ଦାଁଡ଼ କରିଯେ ସୁବତଓ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଥେକେ ନାମଲ ।

ଇଥାର ଠାରିଯେ, ଆଭି ହାମ ଆତେ ହେ—

ସୁବତ ଇତିମଧ୍ୟେ ଡ୍ରାଇଭାରକେ ବଲେଛିଲ ସେ ପୁଲିମେର ଏକଜନ ଅଫିସାର ।

ଡ୍ରାଇଭାର ସୁବତର ପ୍ରତାବେ କୋନ ଆପଣି ଜାନାଯ ନା ।

ଦୂର ଥେକେଇ ଦେଖତେ ପେଲ ସୁବତ—ବାଡ଼ିର ଦରଜା ଖୁଲେ ଗେଲ, ଏକଜନ ସୁଟପରା ଲୋକ
କିରୀଟୀକେ ଭିତରେ ଡେକେ ନିଲ, ଦରଜା ଆବାର ବନ୍ଧ ହେଁ ଗେଲ । ଗାଡ଼ିଟା ପିଛନେର ଦିକେ ଚଲେ
ଗେଲ ।

ସୁବତ ଆବାର ଏଗିଯେ ଯାଯ । ଦରଜାର ସାମନେ ଗିଯେ ଦାଁଡ଼ାଯ—କିନ୍ତୁ ଦରଜାର ଗାୟେ ଠେଲା
ଦିଯେ ବୁଝତେ ପାରେ ଭିତର ଥେକେ ଦରଜା ବନ୍ଧ ହେଁ ଗିଯେଛେ ।

ସେମନ କରେ ହୋକ ସୁବତକେ ବାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ଢକତେଇ ହବେ କିନ୍ତୁ କେମନ କରେ ତୁକବେ ବୁଝତେ
ପାରେ ନା । ବାଡ଼ିଟାର ଚାରପାଶେ ଏକବାର ଘୁରେ ଦେଖା ଯାକ—ଅନ୍ୟ କୋନ ପ୍ରବେଶପଥ ପାଓଯା
ଯାଯ କିନା । ସୁବତ ବାଡ଼ିର ପିଛନଦିକେ ଏଗୁଲୋ ।

ବାଡ଼ିଟା ବୋଧ ହୁଯ ମାତ୍ର କିଛୁଦିନ ହଲୋ ଶେଷ ହେଁବେ । ଚାରିଦିକେ ଏଥିନୋ ରାବିଶ, ଭାଙ୍ଗ
ଇଟେର ଟୁକରୋ, ଲୋହାର ରଡ, ସ୍ଟୋନ-ଚିପସ ଛଡ଼ାନୋ । ଅନ୍ଧକାର ରାତ, ଭାଲ କିଛୁ ଦେଖାଓ ଯାଯ
ନା ।

ସଞ୍ଚରଣେ ପା ଫେଲେ ଫେଲେ ଏଗୋଯ ସୁବତ ।

ହଠାତ୍ ଥମକେ ଦାଁଡ଼ାଳ ।

ହାତ-ଦଶେକ ଦୂରେ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆହେ—ଖୋଲା ଏକଟା ଦରଜା-ପଥେ ବାଇରେ
ଆଲୋ ଏସେ ପଡ଼ିଛେ ଖାନିକଟା ।

ଗାଡ଼ିର ସାମନେ ବୋଧ ହୁଯ ଡ୍ରାଇଭାରଟା ଦାଁଡ଼ିଯେ । କି ଏଥିନ କରା ଯାଯ ଭାବଛେ ସୁବତ, ଏମନ
ସମୟ ହଠାତ୍ ଓର ନଜରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଜନ ଲୋକ ଦୁ'ପାଶ ଥେକେ ଏକଜନ ସୁଟ ପରିହିତ
ଭାଲୋକକେ ଧରେ ଗାଡ଼ିର ସାମନେ ନିଯେ ଏଲୋ ।

ଲୋକଟି ମନେ ହୁଯ ଠିକ ସୁହୁ ନଯ, କେମନ ଯେଣ ଟଳିଛେ!

ପାଶେଇ ଗ୍ୟାରେଜ-ମତ ଏକଟା ଘର—ସୁବତ ଏଗିଯେ ଗେଲ—ନିଃଶ୍ଵେଷ ଗ୍ୟାରେଜେର ପିଛନେ ।

ଡ୍ରାଇଭାର ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଜନ ଲୋକ ସେଇ ଲୋକଟିକେ ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ତୁଳତେ ବ୍ୟାପ୍ତ—ଏହି

সুযোগে সুব্রত চকিতে এগিয়ে গিয়ে খোলা দরজা-পথে বাড়ির মধ্যে চুকে পড়ল। সামনে
সরু একটা প্যাসেজ-মত—তারপরই পাশাপাশি দুটো ঘর—দুটো ঘরের দরজাই বন্ধ।

আরো একটু এগিয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়িটা ওর নজরে পড়ল। সিঁড়ির নীচে
জমাট অঙ্ককার।

কাদের যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ওরা হয়ত ফিরে এলো। সুব্রত চট করে সিঁড়ির নীচে আঞ্চলিক করল।

দুজনের পায়ের শব্দ।

সুব্রত বুঝতে পারে কাজ শেষ করে ওরা ফিরে এলো। ত্রুমে পায়ের শব্দ সরু
প্যাসেজের অন্য প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

শব্দ মিলিয়ে যাবার পরও মিনিট পাঁচ-সাত সুব্রত সিঁড়ির নীচে অঙ্ককারের মধ্যে
নিঃখাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কোনদিকে কোন আর শব্দ নেই।

সুব্রত সিঁড়ির নীচ থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে উপরে উঠে যায়। শেষ
ধাপে সবে পা ফেলেছে—নজরে পড়ল ওর, একটা ঘরের ভেজানো দ্বারপথে ইষৎ
আলোর আভাস।

নিঃখাস বন্ধ করে সুব্রত এগিয়ে যায়।

কিরীটির গলা ওর কানে আসে—আপনাদের অফারটাই শুনি।

কে যেন বললে, দশ হাজার—

কিরীটির জবাব—মাত্র!

সুব্রতের বুঝতে আর বাকী থাকে না, কিরীটি শক্তর ফাঁদে পা দিয়েছে।

দরজার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায় সুব্রত—প্যাটের পকেটে হাত চুকিয়ে লোডেড
পিস্টলটার ট্রিগারটা চেপে ধরে। ভাগ্যে সে পিস্টলটা সঙ্গে এনেছিল!

কিরীটির গলার স্বরটা কানে আসে, নট ব্যাড, কিন্তু এই ঠাণ্ডায় কাশীরে, অন্য
কোথাও গেলে হতো না ম্যাডাম?

রঞ্জিং কাপুরের গলার স্বর, শুনুন মিঃ রায়, আপনার সঙ্গে জোক করবার মত প্রচুর
সময় আমাদের হাতে নেই। আমরা আমাদের অফার আপনাকে দিয়েছি—নাউ ইউ
ডিসাইড—

দড়াম করে ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গেল।

চকিতে সেই শব্দে রঞ্জিং কাপুর, সেই ভদ্রমহিলা ও কিরীটি ফিরে তাকাল দরজার
দিকে।

দরজার উপরে দাঁড়িয়ে সুব্রত—হাতে ধরা তার পিস্টল।

ডেন্ট ট্রাই টু মুভ মিঃ কাপুর—এটার ছটা চেম্বারই ভর্তি!

ঘটনার আকস্মিকতায় সেই মহিলা ও রঞ্জিং কাপুর দুজনাই বিমৃঢ় বিহুল—বোবা
য়েন।

কিরীটি ওদের বডি সার্চ করে দেখ, কোন আগ্রহাত্মক আছে কিনা।

রঞ্জিং কাপুরের পকেটে পিস্টল পাওয়া গেল।

ଆଗେ ମୁବ୍ରତ ବେର ହୟେ ଏଲୋ, ପଶ୍ଚାତେ କିରାଟୀ ଘର ଥେକେ ବେର ହୟେ ଚକିତେ ସରେର ଦରଜା ବାଇରେ ଥେକେ ଟେନେ ଲକ କରେ ଦେୟ—ଇଯେଲ ଲକ ସିସ୍ଟେମ, ଚାବିଟା ପକେଟେ ଫେଲେ ଦେୟ ଦରଜା ଥେକେ ଖୁଲେ ।

ତାରପର ଦୁଜନେ ଛୁଟେ ନୀଚେ ଏସେ ଟ୍ୟାଙ୍କିତେ ଚେପେ ବସତେ ପାଂଚ ମିନିଟ୍‌ଓ ଲାଗାଲୋ ନା ।

ରାଯସିନହା ରୋଡେ ସଥନ ଓରା ଫିରେ ଏଲୋ ରାତ ତଥନ ପୌଳେ ଏଗାରୋଟା ।

ଦେବେଶକେ ବାଇରେ ଘରେଇ ପାଓଯା ଗେଲ ।

ଏକଟା ସୋଫାର ଉପରେ ସେ ଶୁଯେ—ପାଶେ ଏକଜନ ଡାକ୍ତାର । ରାମଲାଲଙ୍କ ସେଥାନେ ଉପଥିତ ।

ଆପନାରା ? ଡାକ୍ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କରେନ ।

ରାମଲାଲ ବଲେ, ସାହେବେର ଦୋଷ—

ଆଇ ସୀ !

କି ବ୍ୟାପାର, ଡାକ୍ତାର ?

ମିଃ ଦାଶକେ କୋନ ଔଷଧ ଥାଓଯାନୋ ହୟେଛିଲ ବା ଇନଜେଷ୍ଟ କରା ହୟେଛିଲ—ରାମଲାଲେର ଟେଲିଫୋନ ପେଯେ ସଥନ ଏଲାମ ଦେଖି ହି ଓ୍ଯାଜ ଇନ ଏ ସେମିକନସାସ ସ୍ଟେଜ । ପାଲ୍‌ସ ଖୁବ ଫିବଲ ।

ଏଥନ କେମନ ଆଛେନ ?

ଏଥନ ଅନେକଟା ଭାଲ—ଆପାତତ ଏଖାନେଟ ଥାକୁନ, ଆରୋ କିଛୁକ୍ଷଣ ପରେ ନିଯେ ଗିଯେ ବେଡରମେ ଶୁଇୟେ ଦେବେନ । ଆର ଏକ କାପ ଗରମ ଦୂର ଦେବେନ ।

ପରେର ଦିନ ଦେବେଶେର ମୁଖ ଥେକେଇ ଓରା ସବ ଶୁନଲୋ ।

ଅଫିସ ଥେକେ ସୋରା ପାଂଚଟା ନାଗାଦ ସେ ବେରତେ ଯାବେ, ଏମନ ସର୍ବ ମିନିସ୍ଟାରେର ଜରୁରୀ ଫୋନ ଆସେ ତାର ବାଡ଼ି ଥେକେ ।

ତାରପର ?

ବାଇରେ ଥେକେ ଦେଖି ଆମାର ଗାଡ଼ିଟା ନେଇ । କି କରି, ଜରୁରୀ କଲ, ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଏକଟା ଟ୍ୟାଙ୍କି ଏବଂ ଦିକେ ଆସତେ ଦେଖି, ଆସତେ ଦେଖେ ତାତେଇ ଉଠେ ବସି ।

ଅୟାଟ ଇଉ ଅଯାର ଇନ ଦି ଟ୍ୟାପ ଦେବେଶ, କିରାଟୀ ବଲଲେ ।

ଏକଜାଟିଲି ! ଟ୍ୟାଙ୍କିତେ ଉଠିତେଇ ଏକଜନ ଅୟାଟ ଦି ପଯେନ୍ଟ ଅଫ ଏ ଗାନ ଆମାକେ ଚୁପଚାପ ଥାକତେ ବଲେ । ଏବଂ ଆମାକେ ନିଯେ ଏକଟା ବାଡ଼ିତେ ଗିଯେ ତୋଲେ । ସେଥାନେ ଆବାର ଦୁଜନ ଲୋକ ଛିଲ, ତାରା ଅୟାଟ ଦି ପଯେନ୍ଟ ଅଫ ଏ ଗାନ ଆମାକେ ଦିଯେ ତୋକେ ଫୋନ କରାଯ । କିନ୍ତୁ ତୁଇ ଗେଲେ ଯେ ସେଥାନେ ବିପଦେ ପଡ଼ିବି, କଥାଟା ବଲତେ ପାରଲାମ ନା—ବୁଝାତେଇ ପାରଛିସ ଆମାର ତଥନ କି ଅବସ୍ଥା ! ତୁଇ ଗିଯେଛିଲି ନିଶ୍ଚଯାଇ ?

ହଁ । ଭଦ୍ରଲୋକ ଓ ଭଦ୍ରମହିଳାର ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତାଓ ହୟେଛେ ।

ଭଦ୍ରମହିଳା !

ହଁ, ମ୍ୟାଡାମ—

ତାରପର ?

তারপর আর কি মোটা টাকার অফার—

বলিস কি?

ডকুমেন্টটা যে রীতিমত মূল্যবান ছিল, সেটা ভুলে যাস কেন? পাঁচশ পর্যন্ত উঠেছিল,
হয়ত পঞ্চাশেও রাজী হতো—তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।

কি?

ডকুমেন্টটার রুপ্রিম্টটা এখনো পাচার করতে পারেনি ওরা ভারতবর্ষ থেকে!
কি করে বুঝলি?

নচেৎ অত টাকা কি অফার করে, না আমাকেই ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতো?
কিরীটী?

কি?

আমার একটা কথা শুনবি?

কি কথা!

এ কেসটা ছেড়ে দে।

পাগল নাকি!

ওসব গ্যাঙ বড় সাংঘাতিক।

হতে পারে, তবে ওরাও জানে কিরীটীকে। ভয় নেই বন্ধু, চল আজ একবার তোর
গাড়ি নিয়ে গতরাত্রের পাড়াটা ঘুরে আস।

॥ আট ॥

দুপুরে কিরীটী, সুব্রত ও দেবেশ বের হলো গাড়ি নিয়ে—কিন্তু সেই পাড়ায় গিয়ে
গতরাত্রের বাড়িটা ওরা কিছুতেই স্পট-আউট করতে পারল না। অনেক বাড়ি হচ্ছে,
অনেকগুলো তৈরীও হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সবই প্রায় এক প্যাটার্নের যেন।

অনেকক্ষণ ধরে ঐ তল্লাটে গাড়িতে ঘুরে ঘুরে আবার ওরা ফিরে এলো।

সন্ধ্যায় মন্ত্রীর গৃহে ককটেল-পার্টি।

দুপুরে একবার কিরীটী বের হয়েছিল রামস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর অফিস
চেম্বারে বসেই অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো।

মন্ত্রীর ওখান থেকে ফিরতে কিরীটীর বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটে হয়ে গেল। দেবেশ
ঐদিন অফিস যায়নি।

ক্রমে দিনের আলো নিভে এলো। ছোট শীতের বেলা ফুরিয়ে এলো।

মন্ত্রী মশাই বলেছিলেন, তিনি তাঁর গাড়ি পাঠাবেন কিন্তু কিরীটী বলেছিল তার কোন
প্রয়োজন নেই।

কটায় আসছেন মিঃ রায়?

ঠিক সময়েই যাবো।

রাত নটা নাগাদ কিরীটী আর সুব্রত বের হলো বেশভূষা করে।

ଦୁଜନାରଇ ମୁଖେ ଚାପଦାଡ଼ି, ମାଥାଯ ପାଗଡ଼ି, ପରନେ ଦାମୀ ସୁଟ ।

ଗୁଲଜାର ସିଂ—ହରବଙ୍ଗ ସିଂ ।

ଦେବେଶେର ଗାଡ଼ିତେ କରେ ବେର ହୟେ ଗେଲ । କନ୍ଟ ପ୍ଲେସେ ଏସେ ଓରା ଗାଡ଼ି ଛେଡେ ଦିଲ ।
ଡ୍ରାଇଭାରକେ ବଲେ ଦିଲ, ରାତ ଦଶଟାର ପର ଯେନ ମେ ଗାଡ଼ି ନିଯେ ରାମଷ୍ଵାମୀର ଗୃହର ସାମନେ
ଗିଯେ ଓଦେର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ ।

ଓଥାନ ଥେକେ ଏକଟା ଟ୍ୟାକ୍ସି ନିଲ ଓରା ।

ମତ୍ତ୍ରୀ ମଶାଇୟେର ଗୃହର ସାମନେ ସଥନ ଓରା ଏସେ ପୌଛାଲ ରାତ ତଥନ ପ୍ରାୟ ସାଡ଼େ ନଟା ।

ବାଂଲୋର ସାମନେ ପ୍ରଚୁର ଗାଡ଼ି ଦାଁଭିଯେ ।

ଦୋତଳାର ହଳଘରେ ପାର୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୟେଛିଲ ।

ଓରା ସଥନ ଘରେ ଗିଯେ ଢୁକଳ, ମଦେର ତଥନ ଯେନ ଫୋଯାରା ବୟେ ଚଲେଛେ । ପ୍ରାୟ ଜନାତ୍ରିଶେକ
ନାନା ବୟସୀ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ।

ସବ ଦେଶେର ଡିପ୍ଲୋମ୍ୟାଟରାଇ ସେଥାମେ ଭିଡ଼ କରେଛେ । ଇଉ. କେ., ଆମେରିକା, ଫରାସୀ,
ଜାର୍ମାନୀ, ଯୁଗୋଝ୍ଲାଭିଯା, କାନାଡ଼ା, ଜାପାନ ସବ ଫରେନ ଅଫିସେର ଡିପ୍ଲୋମ୍ୟାଟରା ଏସେଛେ ଏବଂ
ସତ୍ରୀକ ।

ଗୁଣଗୁଣ ଏକଟା ଗୁଞ୍ଜନ ଚଲେଛେ ଘରେର ମଧ୍ୟେ ।

ମିଗାରେଟେର ଧୋଁଯାଯ ଯେନ ଏକଟା କୁଯାଶା ଜମେଛେ ।

ପୂର୍ବ-ପରିକଳନା ମତ କିରିଟି ଓ ସୁରତ ହଳଘରେ ମଧ୍ୟେ ଢୁକେ ଦୁଦିକେ ଛାଡ଼ିଯେ ଯାଯ ।
ରାମଷ୍ଵାମୀର ଦୃଷ୍ଟି ସଜାଗ ଛିଲ ।

କିରିଟିକେ ଦେଖତେ ପେଯେ ରାମଷ୍ଵାମୀ ଏଗିଯେ ଏଲେନ, ଗୁଡ ଇଭନିଂ ମିଃ ସିଂ ।

ଗୁଡ ଇଭନିଂ ।

ଏକଜନ ବେଯାରା ଟ୍ରେଟେ କରେ ହଇକି ନିଯେ ଏଲୋ ।

କିରିଟି ଏକଟା ପ୍ଲାସ ତୁଲେ ନିଲ ।

ଆମାର ଦିକେ ଆପନି ନଜର ଦେବେନ ନା ମିଃ ରାମଷ୍ଵାମୀ—ଇଉ ଲୁକ ଆଫଟାର ଇଯୋର
ଗେସ୍ଟ !

ରାମଷ୍ଵାମୀ ସରେ ଗେଲେନ ।

କିରିଟି ଚାରଦିକେ ତାକିଯେ ଦେଖତେ ଲାଗଲ । ଏବଂ ମେ ଚମକେ ଉଠିଲେ ଭିଡ଼ର ମଧ୍ୟେ
ଶକୁନ୍ତଳା ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନାକ୍ଷିକେ ଦେଖେ । ଶକୁନ୍ତଳାର ପରିଧାନେ ଆଜ ଦାମୀ ସିଫନ, ଚୋଖେ-ମୁଖେ ଉତ୍ତର
ପ୍ରସାଧନେର ପ୍ରଲେପ ।

ସାରା ଦେହେ ଯୌବନ ଯେନ ଉପରେ ପଡ଼ଛେ । ରଞ୍ଜିଂ କାପୁରକେ କିଷ୍ଟ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କୋଥାଓ
ଦେଖତେ ପେଲ ନା କିରିଟି ।

କିରିଟି ଶକୁନ୍ତଳାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖେ ।

ଏକ ହାତେ ମଦେର ପ୍ଲାସ, ଅନ୍ୟ ହାତେ ମିଗାରେଟ । ବେଶ ସତ୍ତ୍ଵଦେଇ ଯେନ ଧୂମପାନ କରାଛେ
ଶକୁନ୍ତଳା ।

ହଠାତ୍ ଶକୁନ୍ତଳାର ପାଶେ ଏସେ ଦାଁଡାଳ ରାମଷ୍ଵାମୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଃ ସିଂ ।

ଦୁଜନେ କଥା ବଲତେ ବଲତେ ଘରେର ଏକ କୋଣେ ଏଣ୍ଟାତେ ଥାକେ ।

କିରିଟି ଓଦେର କାଛାକାଛି ଥାକବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ।

হঠাতে কিরীটীর কানে এলো মিঃ সিং বলছেন শকুন্তলাকে, মিস খাতুন, কালই তাহলে
আপনি চললেন হংকং?

ও ইয়েস!

মিস খাতুন!

মিস খাতুন! তাহলে ভদ্রমহিলা হিন্দু নন—মুসলিম!

কিরীটী কান খাড়া করে রাখে।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ হলে এসে চুকলো রঞ্জিং কাপুর ও গতরাত্রের সেই মহিলা
অর্থাৎ ম্যাডাম।

রামস্বামীর সেক্রেটারী মিঃ সিং ওদের ঘরে চুকতে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ওদের
অভ্যর্থনা জানায়।

ভদ্রমহিলার এক হাতে একটা বড় ঘড়ি।

ঘড়িটা যেন সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একটু পরে কিরীটী দেখে সেই মহিলা ও শকুন্তলা ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে
পরস্পরের সঙ্গে ফিসফিস করে কি যেন কথা বলছে।

পার্টি ভাঙলো প্রায় রাত দুটো নাগাদ।

একে একে গেস্টরা বিদায় নিতে থাকে।

কিরীটী একসময় রামস্বামীর সামনে এসে ফিসফিস করে বললে, একবার পাশের
ঘরে চলুন মিঃ রামস্বামী, কয়েকটা কথা আছে।

রামস্বামী কিরীটীকে নিয়ে তাঁর বেডরুমে গিয়ে চুকলেন।

কি কথা বলুন তো?

মিস খাতুনকে আপনি চেনেন?

ঐ মীনাঙ্কী খাতুন! হ্যাঁ চিনি। কেন বলুন তো?

কতদিন থেকে ওঁকে চেনেন?

তা বছর দুই হবে।

কোথায় থাকেন উনি—কি করেন?

কি করেন ঠিক জানি না, তবে সব এম্ব্যাসিস্টেই ওঁর যাতায়াত আছে।

উনি কাল হংকং যাচ্ছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আপনাকে একটা সংবাদ নিতে হবে। কাল সকালে যেসব ইন্টারন্যাশনাল প্লেন
ছাড়ছে তার মধ্যে কোন্ট্রোল হংকং টাচ করবে!

ঠিক আছে।

যদি পারেন তো আজ রাত্রে সংবাদটা আমাকে জানাবেন।

জানাবো।

ভোর চারটে নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠলো।

কিরীটী জেগেই ছিল। উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলো।

ରାମଶ୍ଵାମୀ ଶିଖିଂ। ମିଃ ରାଯ়!

ହଁ ଆମିଇ—ବଲୁନ।

ଏକଟା ଥାଇ ପ୍ଲେନ କାଳ ସକାଳ ସାଡ଼େ ନଟାଯ ଛାଡ଼ିଛେ, ସେଟ ହଙ୍କଂ ଟାଚ କରବେ।

ଆର କୋନ ପ୍ଲେନ?

ନା।

ଠିକ ଆହେ। ଆପନାର ଇନ୍‌ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ରାକ୍ଷେର ଅଫିସାରକେ ବଲବେନ, ତିନି ଯେଣ ପ୍ରତ୍ଯତିହାସ ହେଁ ସକାଳ ସାଡ଼େ ଆଟଟା ନାଗାଦ ପାଲାମ ଏଯାରପୋଟ୍ ଉପର୍ଥିତ ଥାକେନ।

ଚତୁର୍ବେଦୀକେ ତୋ ଆପନି ଚେନେନ।

ହଁ।

ତାଙ୍କେଇ ବଲବୋ ଥାକତେ।

॥ ନୟ ॥

ପାଲାମ ଏଯାରପୋଟ୍।

ବେଳା ଆଟଟାର ଆଗେଇ କିରୀଟି ଏସେ ଏଯାରପୋଟ୍ ଉପର୍ଥିତ ହଲୋ ସୁବ୍ରତକେ ନିଯେ। ତାର ବେଶଭୂଷା ଆଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟରକମ।

ମରକୋ ଦେଶୀୟ ଏକ ସୁଲତାନେର ମତ । ଚୋଗା ଚାପକାନ, ମାଥାଯ ହ୍ୟାଟ, ତାର ଉପରେ କାଳୋ ମେଟା କର୍ଦ ପ୍ଯାଚାନୋ—ଚୋଖେ କାଳୋ ଚଶମା।

ଚତୁର୍ବେଦୀକେ ଦେଖା ଗେଲ ସେ ଇନ୍ଟାରନ୍ୟାଶାନାଲ କାଉଟାରେର କାହେଇ ରଯେଛେ।

ଆଟଟା ପଞ୍ଚିଶ।

ଦେଖା ଗେଲ ଶକୁନ୍ତଲାକେ ଏଯାରପୋଟ୍ ଏସେ ଏକଟା ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଥେକେ ନାମତେ । ତାର ହାତେ ଏକଟା ହାତ୍ବ୍ୟାଗ ।

ଟିକିଟ ଚେକିଂ୍ୟେର ପର ଶକୁନ୍ତଲାକେ ଦେଖା ଗେଲ ସନ ସନ ଏଦିକ ଓଦିକ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାକାଛେ । ହୁତୋ କାରୋ ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରଛେ ଶକୁନ୍ତଲା ।

କିରୀଟି ଦୂର ଥେକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖେ ।

ନଟା ବାଜତେ ମିନିଟ ଦଶକ ଆଗେ ଏକଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଏମବ୍ୟାସୀର ଗାଡ଼ି ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଲ ଏଯାରପୋଟ୍ରେର ସାମନେ । ମେହି ଗାଡ଼ି ଥେକେ ନାମଲ ଏକଜନ ମଧ୍ୟବୟାସୀ ଭଦ୍ରଲୋକ । ପରନେ ଦାମୀ ସୁଟ ।

ଭଦ୍ରଲୋକ ଲାଉଞ୍ଜେ ଏସେ ଚୁକତେଇ ଶକୁନ୍ତଲା ଏଗିଯେ ଗେଲ ତାର କାହେ ।

ଚତୁର୍ବେଦୀର ସମେ କିରୀଟିର ଚୋଖେ ଚୋଖେ କଥା ହୁଯ ଯାଏ । ଚତୁର୍ବେଦୀ ପ୍ଲେନ ଡ୍ରେସେଇ ଛିଲ । ଓଦେର କାଛାକାଛି ଏଗିଯେ ଯାଏ ।

ମିଃ ଆଲାମ, ଆମାର ଘଡ଼ିଟା ଏନେହେନ?

ହଁ, ଏଇ ଯେ—

ମିଃ ଆଲାମ ପକେଟ ଥେକେ ଏକଟା ହାତଘଡ଼ି ବେର କରେ ଦିଲ ଶକୁନ୍ତଲାକେ ।

ଥ୍ୟାଂକସ ।

ତାହଲେ ଆମି ଚଲି !

আসুন।

আলাম দু'পী এগিয়েছে, চতুর্বেদী এসে শকুন্তলার সামনে দাঁড়াল—কিরীটীও এগিয়ে আসে।

গুড় মর্নিং মিস খাতুন।

কে?

চমকে ফিরে তাকায় শকুন্তলা।

আমি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের লোক। আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আমাদের হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।

বাট হাউ দ্যাট ইজ পসিবল অফিসার, আমার প্লেন এখুনি ছাড়বে!

সে তো আমি জানি না—আমার ওপর যা অর্ডার আছে—

বাট হোয়াই? কেন?

এবারে কিরীটী এগিয়ে এলো, চোখের কালো চশমাটা খুলে ফেলল, চিনতে পারছেন আমাকে মিস মীনাক্ষী খাতুন?

কে আপনি?

সে কি! এত তাড়াতাড়ি ভুলে গোলেন—সারারাত ট্রেনে একসঙ্গে মাত্র দু'দিন আগে এলাম—

মিঃ রায়!

হঁয়া, কিরীটী রায়। বুবত্তেই পারছেন আপনি জানিয়ে লাভ হবে না—অফিসারের সঙ্গে ওদের হেডকোয়ার্টারে চলুন—ইফ ইউ ডোট লাইক টু ক্রিয়েট এ সিন হিয়ার, অ্যাট দিস এয়ারপোর্ট! ইয়োর গেম ইজ আপ!

কি বলছেন যা-তা পাগলের মত?

চলুন হেডকোয়ার্টারে, সেখানেই সব জানতে পারবেন—চলুন—

শকুন্তলা আর আপনি জানায় না।

মাইকে তখন অ্যানাউন্স শুরু হয়েছে—প্যাসেঞ্জার প্রসিডিং টুওয়ার্ডস হংকং ম্যানিলা আর রিকোয়েস্টেড—

ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের হেডকোয়ার্টারে মীনাক্ষী খাতুনকে নিয়ে ওরা এলো।

মীনাক্ষী বলে, নাউ টেল—অফিসার, এসবের মানে কি—আমাকে ধরে নিয়ে এলেন কেন এয়ারপোর্ট থেকে?

কথা বললে কিরীটাই, মিস খাতুন, এবারে ডকুমেন্টা বের করে দিন—

ডকুমেন্ট! কিসের ডকুমেন্ট? কি বলছেন পাগলের মত?

পাগল যে আমি নই, আপনি তা ভাল করেই জানেন। এখন বের করুন সেই ডকুমেন্ট—যেটা ভায়া হংকং একটি পররাষ্ট্রে পাচার করছিলেন—প্রতিরক্ষা দণ্ডের একটা জরুরী ডকুমেন্টের ব্লু-প্রিন্ট।

আমি একটা ইমপরটেটে ডকুমেন্টের ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে যাচ্ছিলাম পাচার করতে, কে বললে আপনাকে?

অঙ্গীকার করার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না মিস খাতুন।

বেশ তো, আমার হ্যান্ড-ব্যাগ সার্চ করে দেখুন। তারপর তির্যক দৃষ্টিতে কিরীটির দিকে তাকিয়ে বললে মীনাক্ষী, চান তো আমার বডিও সার্চ করতে পারেন।

চতুর্বেদী বললেন, একজন মহিলাকে ডাকবো স্যার? উর্ধ্বর্তন অফিসার কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন।

কিরীটি মুদু শাস্ত গলায় বললে, তার আর প্রয়োজন হবে না, মিস খাতুন, আপনার হাতঘড়িটা খুলে দিন।

হাতঘড়িটা! হেসে ফেললে মীনাক্ষী খাতুন, তাহলে এতক্ষণে আপনার ধারণা হলো মিঃ রায়, আপনাদের বহু মূল্যবান ব্লু-প্রিন্টটা আমার হাতঘড়ির মধ্যেই আছে।

ঘড়িটা খুলে দিন—

এবারে কিন্তু মিস খাতুনের মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

কি হলো, দিন।

দিছি—বলতে বলতে মিস খাতুন তাঁর হ্যান্ডব্যাগটা খুলে কি একটা বের করে চটকরে মুখে পুরে দিলো।

এবং ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে কিছু বুঝাবার আগেই মীনাক্ষী খাতুনের দেহটা সশব্দে মেরোতে পড়ে গেল।

কি হলো?

কিরীটি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে মীনাক্ষীর পালস দেখে, তারপর মাথা নেড়ে বলে, শি ইজ ডেড!

ডেড?

বিষয়-বিহুল কঠে কথাটা উচ্চারণ করেন চতুর্বেদী।

কিরীটি সে কথায় যেন কোন কান দিল না। মৃত মীনাক্ষীর হাত থেকে দামী রিস্টওয়াচটা খুলে নিল।

রিস্টওয়াচটা দেখতে দেখতে বললে, কারো কাছে একটা ছুরি হবে?

চতুর্বেদী একটা ছুরি এনে দিলেন।

সেই ছুরির সাহায্যেই ঘড়ির পিছনের ডালাটা খুলে ফেলতেই একটা মাইক্রো ফিল্ম রোল বের হলো।

হিয়ার ইউ আর মিঃ চতুর্বেদী—এই ফিল্মের মধ্যেই ব্লু-প্রিন্টের ফটো আছে।

কিরীটি বলতে বলতে ফিল্মটা চতুর্বেদীর হাতে তুলে দিল।

ম্যাগনিফাই প্রজেক্টরের সাহায্যে বোঝা গেল কিরীটির অনুমান ভুল নয়—ফিল্মের মধ্যেই ব্লু-প্রিন্ট রয়েছে।

এদিনই দুপুরের দিকে মন্ত্রীমণ্ডাইয়ের ঘরে।

রামস্বামী জিঙ্গাসা করেন, ধরলেন কি করে মিঃ রায়?

আপনাদের দলিলটা আবার যথাস্থানে ফিরে আসতেই বুঝেছিলাম, দলিলটার একটা ব্লু-প্রিন্ট ওরা সংগ্রহ করে নিয়েছে—এবং সেটাই পাচার করবে।

তারপর?

আসুন।

আলাম দু'পী এগিয়েছে, চতুবেদী এসে শকুন্তলার সামনে দাঁড়াল—কিরীটীও এগিয়ে আসে।

গুড় মর্নিং মিস খাতুন।

কে?

চমকে ফিরে তাকায় শকুন্তলা।

আমি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের লোক। আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আমাদের হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।

বাট হাউ দ্যাট ইজ পসিবল অফিসার, আমার প্লেন এখুনি ছাড়বে!

সে তো আমি জানি না—আমার ওপর যা অর্ডার আছে—

বাট হোয়াই? কেন?

এবারে কিরীটী এগিয়ে এলো, চোখের কালো চশমাটা খুলে ফেলল, চিনতে পারছেন আমাকে মিস মীনাক্ষী খাতুন?

কে আপনি?

সে কি! এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন—সারারাত ট্রেনে একসঙ্গে মাত্র দুদিন আগে এলাম—

মিঃ রায়!

হঁা, কিরীটী রায়। বুঝতেই পারছেন আপত্তি জানিয়ে লাভ হবে না—অফিসারের সঙ্গে ওদের হেডকোয়ার্টারে চলুন—ইফ ইউ ডোন্ট লাইক টু ক্রিয়েট এ সিন হিয়ার, অ্যাট দিস এয়ারপোর্ট! ইয়োর গেম ইজ আপ!

কি বলছেন যা-তা পাগলের মত?

চলুন হেডকোয়ার্টারে, সেখানেই সব জানতে পারবেন—চলুন—

শকুন্তলা আর আপত্তি জানায় না।

মাইকে তখন অ্যানাউন্স শুরু হয়েছে—প্যাসেঞ্জার প্রসিডিং টুওয়ার্ডস হংকং ম্যানিলা আর রিকোয়েস্টেড—

ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের হেডকোয়ার্টারে মীনাক্ষী খাতুনকে নিয়ে ওরা এলো।

মীনাক্ষী বলে, নাউ টেল—অফিসার, এসবের মানে কি—আমাকে ধরে নিয়ে এলেন কেন এয়ারপোর্ট থেকে?

কথা বললে কিরীটীই, মিস খাতুন, এবারে ডকুমেন্টা বের করে দিন—

ডকুমেন্ট? কিসের ডকুমেন্ট? কি বলছেন পাগলের মত?

পাগল যে আমি নই, আপনি তা ভাল করেই জানেন। এখন বের করুন সেই ডকুমেন্ট—যেটা ভায়া হংকং একটি পররাষ্ট্রে পাচার করছিলেন—প্রতিরক্ষা দণ্ডের একটা জরুরী ডকুমেন্টের ব্লু-প্রিন্ট।

আমি একটা ইমপরটেন্ট ডকুমেন্টের ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে যাচ্ছিলাম পাচার করতে, কে বললে আপনাকে?

অস্বীকার করার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না মিস খাতুন।

বেশ তো, আমার হ্যান্ড-ব্যাগ সার্চ করে দেখুন। তারপর তির্বক দৃষ্টিতে কিরীটির দিকে তাকিয়ে বললে মীনাক্ষী, চান তো আমার বডিও সার্চ করতে পারেন।

চতুর্বেদী বললেন, একজন মহিলাকে ডাকবো স্যার? উর্ধ্বতন অফিসার কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন।

কিরীটি মুদু শাস্ত গলায় বললে, তার আর প্রয়োজন হবে না, মিস খাতুন, আপনার হাতঘড়িটা খুলে দিন।

হাতঘড়িটা! হেসে ফেললে মীনাক্ষী খাতুন, তাহলে এতক্ষণে আপনার ধারণা হলো মিঃ রায়, আপনাদের বহু মূল্যবান ব্লু-প্রিন্টটা আমার হাতঘড়ির মধ্যেই আছে।

ঘড়িটা খুলে দিন—

এবারে কিন্তু মিস খাতুনের মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

কি হলো, দিন।

দিছি—বলতে বলতে মিস খাতুন তাঁর হ্যান্ডব্যাগটা খুলে কি একটা বের করে চট করে মুখে পুরে দিলো।

এবং ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে কিছু বুবৰার আগেই মীনাক্ষী খাতুনের দেহটা সশব্দে মেরোতে পড়ে গেল।

কি হলো?

কিরীটি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে মীনাক্ষীর পাল্স দেখে, তারপর মাথা নেড়ে বলে, শি ইজ ডেড!

ডেড?

বিস্ময়-বিহুল কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করেন চতুর্বেদী।

কিরীটি সে কথায় যেন কোন কান দিল না। মৃত মীনাক্ষীর হাত থেকে দায়ী রিস্টওয়াচটা খুলে নিল।

রিস্টওয়াচটা দেখতে দেখতে বললে, কারো কাছে একটা ছুরি হবে?

চতুর্বেদী একটা ছুরি এনে দিলেন।

সেই ছুরির সাহায্যেই ঘড়ির পিছনের ডালাটা খুলে ফেলতেই একটা মাইক্রো ফিল্ম রোল বের হলো।

হিয়ার ইউ আর মিঃ চতুর্বেদী—এই ফিল্মের মধ্যেই ব্লু-প্রিন্টের ফটো আছে।

কিরীটি বলতে বলতে ফিল্মটা চতুর্বেদীর হাতে তুলে দিল।

ম্যাগনিফাইং প্রজেক্টারের সাহায্যে বোঝা গেল কিরীটির অনুমান ভুল নয়—ফিল্মের মধ্যেই ব্লু-প্রিন্ট রয়েছে।

এদিনই দুপুরের দিকে মন্ত্রীমশাইয়ের ঘরে।

রামসামী জিজ্ঞাসা করেন, ধরলেন কি করে মিঃ রায়?

আপনাদের দলিলটা আবার যথাস্থানে ফিরে আসতেই বুঝেছিলাম, দলিলটার একটা ব্লু-প্রিন্ট ওরা সংগ্রহ করে নিয়েছে—এবং সেটাই পাচার করবে।

তারপর?

তারপর আমাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে টাকার অফার দিল, বুঝতে পারলাম
বু-প্রিন্টটা এখনো পাচার করতে পারেনি—এ দেশেই আছে!

কিন্তু একটা মাইক্রো ফিল্মের মধ্যে—

ভেবে দেখুন সেটাই সবচাইতে সেফ—তাই সেটার সন্তাবনার কথাই সর্বাগ্রে আমার
মনে হয়েছিল।

উঃ, আপনি আমার যে কি উপকার করলেন মিঃ রায়।

আমি তো বেশী কিছু করিনি মিঃ রামস্বামী। একজন নাগরিক হিসাবে আমার
জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যটুকুই করেছি মাত্র—তবে একটা কথা—

কি?

ওরা যে একটা মাইক্রো ফিল্মই তৈরী করেছিল তা নাও হতে পারে—সেফটির জন্য
হয়ত আরো কপি করেছিল—কটা দিন স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে একটু সাবধানে
থাকতে বলবেন—চারিদিকে নজর রাখতে বলবেন। আচ্ছা আজ আমি তাহলে উঠি।

প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন না?

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার তাঁকে জানাবেন—আজই সন্ধ্যার প্লেনে আমাকে ফিরে যেতে
হবে কলকাতা।

আজই যাবেন?

হ্যাঁ।

টিকিট পেয়েছেন?

পাওয়া গিয়েছে বোধ হয়। আচ্ছা উঠি, নমস্কার।

কিরীটী রামস্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।